প্রথম প্রকাশ :
২৯ শ্রাবণ ১৩৯৭

প্রচ্ছদ :
দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক :
শর্মিলা পাল
ভূর্জপত্র
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক :
শিবনাথ পাল
প্রিন্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

চল্লিশ টাকা

এরেন্দিরা

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট ১

পরিশিষ্ট ২

উত্তরভাষ

উৎসর্গ

মিত্রা ও প্রবোধ পারিখকে

গার্সিয়া মার্কেসের দিগ্বিজয়ের সঙ্গীদের

সরলা এরেন্দিরা
আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী

এরেন্দিরা যখন তার ঠাকুমাকে স্নান করাচ্ছিলো তখনই তার দুর্ভাগ্যের হাওয়া শোঁ-শোঁ ক'রে বইতে লাগলো। তার প্রথম হামলাটা হানা দিতেই মরুভূমির নিঃসঙ্গতার মধ্যে জ্যোৎস্নার কংক্রিটে গড়া বিশাল প্রাসাদটার ভিৎশুদ্ধ কেঁপে উঠতে লাগলো। কিন্তু এরেন্দিরা আর তার ঠাকুমা সেখানে তাঁদড় বন্য প্রকৃতির আচম্বিত ঝুঁকিগুলোতেই অভ্যস্ত ছিলো, সার-সার ময়ূর আর রোমক বাথটবের রঙিন কাচের ছেলেমানুষি ফালিতে সাজানো হামামটার মধ্যে দুজনের কেউই হাওয়ার কারদানিকে কোনো পাত্তাই দেয়নি।

মর্মরপাথরে তৈরি বাথটবটায় ন্যাংটো আর প্রকাণ্ড ঠাকুমাকে দেখাচ্ছিলো বিশাল এক অপরূপ শাদা তিমির মতো। এই সবে চোদ্দয় পড়েছে নাৎনি, কেমন যেন অবসাদে নেতিয়ে আছে সে, নিস্তেজ, তার অস্থিপঞ্জর এখনও নরম আর বয়সের তুলনায় সে ভারি ভদ্র আর বিনম্র। কেমন-একটা কুণ্ঠাকৃপণ ভঙ্গিতে, যার মধ্যে এক ধরনের ধর্মভীরু কঠোর সংযতভাব মেশানো, সে তার ঠাকুমাকে স্নান করাচ্ছে এমন জলে যা ফুটিয়ে নেয়া হয়েছে ওষধি আর সুগন্ধি লতাপাতায়, আর লতাপাতাগুলো লেপটে থাকছে ঠাকুমার শাঁসালো পিঠটায়, ধাতুরঙা খোলা এলো চুলে, আর তাঁর জমকালো কাঁধ দুটোয়, আর সেগুলো এমন ক্ষমাহীনভাবে উলকিদাগা যে খালাশিদেরও তা যেন লজ্জায় ফেলে দিতো।

'কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম যে আমি একটা চিঠির জন্যে হা ক'রে ব'সে আছি,' ঠাকুমা বললেন।

এরেন্দিরা—এড়িয়ে-যাওয়া নেহাৎই অসাধ্য না-হ'লে যে পারতপক্ষে কখনোই কথা বলে না—জিগেশ করলে :

'স্বপ্নের মধ্যে সেটা কী বার ছিলো?'

'বিষ্যুৎবার।'

'তাহ'লে খারাপ খবর ছিলো চিঠিটায়,' এরেন্দিরা বললে, 'তবে সেটা আর কোনোদিনই এসে পৌঁছুবে না।'

যখন সে তার ঠাকুমাকে স্নান করানো সারলে, এরেন্দিরা তাঁকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলো। ঠাকুমা মানুষটা এমনই বিপুলা যে হয় তাঁর নাৎনির কাঁধে ভর দিয়ে আর নয়তো বিশপের দোর্দণ্ডের মতো একটা লাঠির ওপর ভর রেখেই শুধু চলাফেরা করতে পারেন, তবে তাঁর যাবতীয় দুঃসাধ্য চেষ্টা চালাবার সময়েও তাঁর নড়াচড়ায় এক অতীব-প্রত্ন কোনো মহিমার শক্তি প্রকাশ পায়। শোবার ঘরে গিয়ে—ঘরটা, পুরো বাড়িটার মতোই, কেমন যেন মাথা-ঘুরিয়ে-দেবার-মতো রুচির বড্ড বেশি-বেশি আসবাব দিয়ে ঠাসা—তার ঠাকুমাকে সাজিয়ে তৈরি ক'রে দিতে এরেন্দিরার দরকার হ'লো আরো দু-ঘণ্টা ঘণ্টা। গুছির পর গুছি খুলে-খুলে সে জট ছাড়ালে চুলের, তারপর গন্ধ ছিটিয়ে তা আঁচড়ে দিলে, নিরক্ষীয় ফুল-ফুল কাটা এক পোশাক চাপালে গায়ে, মুখে বুলিয়ে দিলে ট্যালকাম পাউডার, ঠোঁটে মাখালে উজ্জ্বল-লাল ওষ্ঠরঞ্জনী, গালে বোলালে লালিমা, চোখের পাতায় কস্তুরী, নখের ওপর মুক্তোর প্রলেপ, আর যখন সে তাঁকে সাজিয়ে তুললো যেন জীবন্ত প্রাণীর চেয়েও অতিকায় কোনো পুতুল, সে তাঁকে নিয়ে এলো দমআটকানো সব ফুলে ভরা গন্ধেঝিমঝিম এক কৃত্রিম বিতানে, ফুলগুলো যেখানে তাঁর পোশাকের ফুলগুলোর মতোই নিরক্ষীয়; এনে তাঁকে বসালে মস্ত এক চেয়ারে যার ভিৎ আর বংশপরিচয় কোনো সিংহাসনের মতো, আর তাঁকে সে সেখানে রেখে এলো উৎকর্ণ, কান পেতে শুনছেন সব হারিয়ে-যাওয়া রেকর্ড এমন-এক ফোনোগ্রাফে বাজছে, যার স্পীকারটা ঠিক যেন মস্ত এক চোঙা, যেন একটা মেগাফোন।

...

দিদিমা যখন ভেসে চলেছেন অতীতের সব জলায়, এরেন্দিরা নিজেকে ব্যস্ত রাখলে বাড়িটা ঝাঁট দিতে; বাড়িটা অন্ধকার আর রংচঙে, উদ্ভট আর আজব সব আসবাব আর উদ্ভাবিত সব কায়েসারদের মূর্তিতে ঠাসা; ভেলস্ফটিকের দেবদূত আর অভ্রস্ফটিকের ঝাড়লণ্ঠন, সোনা-রং-করা এক পিয়ানো, আর অভাবনীয় সব আকার ও রূপের অগুনতি ঘড়ি। উঠোনে আছে মস্ত এক ঢাকা চৌবাচ্চা, জল জমিয়ে রাখবার জন্যে—দূর-দূর ঝরনা থেকে ইণ্ডিয়ানদের পিঠে-পিঠে অনেক বছর ধ'রে এসেছে এ-জল; আর চৌবাচ্চার দেয়ালের গায়ে একটা আংটায় বাঁধা এক ভাঙাচোরা উটপাখ—সে-ই একমাত্র পাখাওলা জীব যে এই অভিশপ্ত আবহাওয়ার বিভীষিকায় টিকে থাকতে পেরেছে। সবকিছু থেকেই অনেক, অনেক দূরে এই বাড়িটা, মরুভূমির ঠিক বুকের ওপর, এমন-একটা বসতির পাশে যার রাস্তাগুলো সব ভাঙি-চুর আর আতপজ্বলা যেখানে ছাগলেরা দল বেঁধে আত্মহত্যা করে যখন

দুর্ভাগ্যের হাওয়া বইতে থাকে শনশন, তোড়ে, আর ছাগলদের বেজায় মন খারাপ হ'য়ে যায়।

এই দুর্গের আশ্রয়টি গ'ড়ে ছিলেন ঠাকুমার স্বামী, এক চোরাচালানকারী যাকে নিয়ে রচিত হয়েছিলো অতিকথা আর কিংবদন্তি, যার নাম ছিলো আমাদিস; তাঁরই মারফৎ ঠাকুমার এক ছেলে হয়েছিলো যারও নাম ছিলো আমাদিস, যে ছিলো এরেন্দিরার বাবা। এই পরিবারের উৎসই বা কী আর অভিপ্রায়ই বা কী, তা কেউ জানতো না। ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় সবসেরা যে-সংস্করণটি পাওয়া যায় তা এই: পিতা আমাদিস নাকি আন্তিইয়ের এক গণিকালয় থেকেই তাঁর রূপসী স্ত্রীকে উদ্ধার ক'রে এনেছিলেন, সেখানে ছুরির চকমকিতে তিনি খুন করেছিলেন কাকে যেন, তারপর স্ত্রীকে এনে তিনি রোপণ করেছিলেন মরুভূমির ঝুঁকিবিরহিত শান্তির মাঝখানে। আমাদিসরা যখন ম'রে গেলো—একজন মরলো বিমর্ষ জ্বরে-তাপে আর অন্যজন একটি মেয়েকে নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়ে গুলিতে-গুলিতে ঝাঁঝরা হ'য়ে—ঠাকুমা তাদের মৃতদেহগুলো কবর দিয়েছিলেন উঠোনে, তাড়িয়ে দিয়েছিলেন চোদ্দজন খালি-পা তরুণী দাসী; আর সেই চোরা-উঁকি-মারা বাড়ির ছায়ায় জমকালো সব মহিমার স্বপ্নেই বিভোর হ'য়ে জাবর কাটতে লাগলেন তারপর, বেজন্মা নাৎনিটির যাবতীয় ত্যাগের সৌজন্যে—তাকে তিনি নিজেই জন্ম থেকে লালন করেছেন।

শুধু দম দিয়ে-দিয়ে ঘড়িগুলোর কাঁটা ঠিক সময়ে এনে বসাতে ছ-ঘণ্টা লাগতো এরেন্দিরার। তার দুর্ভাগ্য যেদিন শুরু হ'লো সেদিন তাকে তা করতে হয়নি কারণ পরদিন সকাল অব্দি চলবার মতো যথেষ্ট দম ছিলো ঘড়িগুলোর, কিন্তু, অন্যদিকে আবার, তাকে স্নান করাতে হয়েছিলো ঠাকুমাকে, বিস্তর পোশাক পরিয়ে সাজাতে হয়েছিলো, মুছতে হয়েছিলো মেঝে, পাকাতে হয়েছিলো দুপুরের খানা, ঘ'ষে-মেজে ঝকঝকে ক'রে দিতে হয়েছিলো স্ফটিকের বাসনকোশন। এগারোটা নাগাদ, যখন সে উটপাখির বাটিটার জল পালটে দিচ্ছে আর আমাদিসদের যুগল কবরের ওপর গজানো মরুভূমির কাঁটাঝোপে জল দিচ্ছে, তাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছিলো বাতাসের রোষের বিরুদ্ধে: ততক্ষণে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে হাওয়া, তবু সে তখনও ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে এ তারই দুর্ভাগ্যের হাওয়া শন-শন ক'রে বইছে। বেলা বারোটায় সে যখন শ্যামপেনের শেষ গেলাশগুলো মুছছে তখন তার নাকে এলো শুরুয়ার সুঘ্রাণ আর তাকে, পেছনে ভিনিসীয় কাচের ঝনঝনে ধ্বংসস্তূপ না-রেখেই, রান্নাঘরে ছুটে যাবার মতো অলৌকিক কীর্তিটা করতে হ'লো।

উথলে উপচে পড়ার আগেই ডেকচিটা কোনোক্রমে সে উনুন থেকে নামাতে পেরেছিলো। তারপর সে উনুনে চাপালে একটা স্টু যেটা সে আগেই তৈরি ক'রে রেখেছিলো আর এই ফাঁকে সে সুযোগ পেয়েছিলো রান্নাঘরের একটা চৌকির ওপর ব'সে একটু জিরিয়ে নেবার। দু-চোখ মুদেছিলো সে, আবার খুলে ফেলেছিলো, অবসাদের এক অভিব্যক্তি সমেত, তারপর শুরুয়া ঢালতে শুরু করেছিলো সুপের বড়ো ঢাকাওলা বাটিটায়। ঘুমোতে-ঘুমোতেই কাজ করছিলো এরেন্দিরা।

ভোজটেবিলের মাথাটায় ঠাকুমাই বসেছিলেন একা-একা, যদিও রুপোর শামাদানে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিলো বারোজন লোকের কথা ভেবে। তিনি তাঁর ছোট্ট ঘুন্টিটা বাজালেন আর প্রায় তক্ষুনি এরেন্দিরা এসে পৌঁছুলো ধোঁয়া-ওঠা সুপের বাটি নিয়ে। এরেন্দিরা যখন তাঁর বাটিতে সুপ ঢালছে ঠাকুমা তার ঘুমের ঘোরে কাজ করার ভঙ্গিটা খেয়াল করলেন আর নিজের হাতটা তার চোখের সামনে নড়ালেন যেন কোনো অদৃশ্য কাচের পাল্লা মুছছেন এমনভাবে। কিশোরী হাতটা দেখতেই পায়নি। ঠাকুমা চোখে-চোখেই তাকে অনুসরণ করলেন আর তারপর যখন এরেন্দিরা রান্নাঘরে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরেছে, তিনি তাকে উদ্দেশ ক'রে হাঁক পাড়লেন :

'এরেন্দিরা!'

আচমকা জেগে গিয়ে কিশোরী সুপের বাটিটা হাত থেকে মেঝের ফরাশের ওপর ফেলে দিলে।

'ও ঠিক আছে, বাছা,' মমতা প্রকাশ ক'রে ঠাকুমা তাকে বললেন। 'আবারও তুই হাঁটতে-হাঁটতে ঘুমিয়ে পড়েছিলি!'

'আমার শরীরটার ও-রকম একটা অভ্যেস আছে,' কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বললে এরেন্দিরা।

তখনও সবকিছু ঘুমে আবছা, এরেন্দিরা সুপের বাটি তুলে নিয়ে ফরাশ থেকে দাগটা সাফ করবার চেষ্টা করলে।

'ছেড়ে দে এখন,' ঠাকুমা তাকে বিরত হ'তে পরামর্শ দিলেন। 'বিকেলেই না-হয় এটা তুই ধুয়ে নিস।'

ফলে তার নিয়মিত বৈকালী কাজকর্মের সঙ্গে-সঙ্গে এরেন্দিরাকে খাবারঘরের ফরাশটাও ধুতে হ'লো, আর ধোবার গামলার কাছেই যখন এসে পড়েছে তখন সে সোমবারের ধোয়াধুয়ির কাজটাও সেরে নিলে, আর সারাক্ষণ হাওয়া বাড়িটাকে ঘিরে হা-হা হা-হা করলো, ভেতরে ঢোকবার একটা পথ হাৎড়ে। তাকে এত-

সমস্ত কাজ করতে হ'লো যে সে কিছু বুঝে-ওঠবার আগেই রাত্তির এসে চড়াও হ'লো, আর যখন সে খাবার ঘরের ফরাশটা আবার সবে পেতেছে, তখনই এসে হাজির শোবার সময়।

সারা বিকেল ধ'রে ঠাকুমা পিয়ানোয় ব'সে খেলা করছিলেন, ঝিনঝিনে নকল গলায় গাইছিলেন তাঁর আমলের সব গান, আর চোখের পাতায় লেগেছিলো অশ্রু আর কস্তুরীর দাগ। কিন্তু যখন তিনি মশলিনের রাতকাপড় প'রে তাঁর বিছানায় শুলেন সুখস্মৃতির তিক্ততারা সদলবলে ফিরে এলো।

'কালকে সুযোগ ক'রে বসার ঘরের ফরাশটাও ধুয়ে নিস,' তিনি বললেন এরেন্দিরাকে। 'শোরগোলের সব দিনগুলোর পর এটা একদিনও আর রোদের মুখ দ্যাখেনি।'

'সি, আবুয়েলা,' কিশোরী উত্তর দিলে।

তার অপ্রশম্য কর্ত্রীঠাকরুনকে হাওয়া করবার জন্যে সে একটা পালকের পাখা তুলে নিলে, আর তিনি ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে-যেতে আউড়ে গেলেন নৈশ হুকুমের ফর্দটা।

'শুতে যাবার আগে সব কাপড়চোপড় ইস্ত্রি ক'রে নিস, তাহ'লেই তুই বিবেকের তাড়না ছাড়াই ঘুমোতে পারবি।'

'সি, আবুয়েলা।'

'কাপড় রাখার চোরকুঠুরিগুলো ভালো ক'রে দেখে নিবি, কারণ পোকাগুলো ঝোড়ো হাওয়ার রাতেই খিদেয় হন্তে হ'য়ে যায়।'

'সি, আবুয়েলা।'

'তারপর হাতে যে-সময় থাকবে সেই ফাঁকে ফুলগুলো উঠোনে নিয়ে যাবি যাতে তারা টাটকা হাওয়ায় দম নিতে পারে।'

'সি, আবুয়েলা।'

'আর উটপাখিটাকে খাইয়ে দিবি।'

ঠাকুমা ঘুমিয়ে পড়েছেন কিন্তু তবু হুকুমগুলো দিয়েই চলেছেন পর-পর, কারণ তাঁর নাৎনি তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পেয়েছে ঘুমোতে-ঘুমোতে বেঁচে থাকার। এরেন্দিরা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, এক-এক ক'রে রাতের কাজ হাতের কাজ সারলো, তখনও সে ঘুমন্ত ঠাকুমার হুকুমগুলোর উত্তর দিয়ে চলেছে।

'কবরগুলোয় একটু জল দিবি।'

'সি, আবুয়েলা।'

'আর আমাদিসেরা যদি এসে হাজির হয়, ওদের ব'লে দিবি ভেতরে যেন না-ঢোকে,' ঠাকুমা বললেন, 'কারণ পোরফিরিও গালানের দলবল ওদের খুন করবার জন্তে ওৎ পেতে আছে।'

এরেন্দিরা তাঁকে আর-কোনো উত্তর দিলে না, কারণ সে বুঝে গিয়েছে তার ঠাকুমা এতক্ষণে তাঁর প্রলাপে-বিকারে হারিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সে তাঁর একটিও হুকুম অমান্ত করেনি। জানলায় খিলগুলো লাগানো আছে কি না এক-এক ক'রে দেখে নিয়ে, শেষ আলোগুলো পর-পর নিভিয়ে দেবার পর সে খাবার ঘর থেকে একটা মোমবাতি তুলে নিয়ে আলো ফেলে-ফেলে চ'লে এলো তার নিজের শোবার ঘরে ; হাওয়ার উৎপাত মাঝে-মাঝে যখন থামে তখন তার ঘুমন্ত ঠাকুমার শান্ত ও বিশাল নিশ্বাসের শব্দে বাড়িটা ভ'রে যায়।

তার নিজের ঘরটাও বিলাসবৈভবে ভরা, তবে ঠাকুমার ঘরটার মতো অত নয়, আর রাশি-রাশি ন্যাকড়ার পুতুল আর দম-দেয়া সব জীবজন্তুতে বোঝাই ঘরটা তার সদ্যসমাপ্ত শৈশবেরই স্মরণচিহ্ন। দিনের ফুরসৎহীন বর্বর খাটাখাটুনিতে বিধ্বস্ত, এরেন্দিরার সেই শক্তিটুকুও আর ছিলো না যে পোশাক খোলে কিংবা শামাদানটিকে রাখে রাতচৌকিতে : সে ধপ ক'রে প'ড়ে গেলো বিছানায়। একটু পরেই তার দুর্ভাগ্যের হাওয়া সশরীরে তার শোবার ঘরে এসে হাজির হ'লো একদল খ্যাপা ডালকুত্তোর মতো আর মোমবাতিটাকে উলটে দিলে পর্দার গায়ে।

...

ভোরবেলায় বাতাস যখন অবশেষে থামলো, কয়েকটা ভারি-ভারি বৃষ্টির ফোঁটা পড়লো এদিক-ওদিক, নিভিয়ে দিলো শেষ অঙ্গারগুলো, আর প্রাসাদটির ধূমায়িত ভস্মকে শক্ত ও জমাট ক'রে তুললো। গাঁয়ের লোকে—বেশির ভাগই তারা ইণ্ডিয়ান—চেষ্টা করেছিলো অগ্নিকাণ্ড থেকে যা বেঁচেছে উদ্ধার করতে : উটপাখির দগ্ধীভূত মৃতদেহ, সোনায় মোড়া পিয়ানোর কাঠামো, একটা কবন্ধ ও অঙ্গহীন পাথরমূর্তি। দুর্ভেদ্য এক মনখারাপের ঘোরে ঠাকুমা তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবছিলেন তাঁর এত ঐশ্বর্যের এখন কীই বা আর অবশিষ্ট আছে। এরেন্দিরা—দুই আমাদিসের কবরের মাঝখানে ব'সে—এতক্ষণে শেষ করেছে তার কান্না। ঠাকুমা যখন শেষ অব্দি বিশ্বাস করলেন যে এই তাণ্ডবের মধ্যে খুবই কম জিনিশ আছে আস্ত ও অবিকৃত, তিনি সত্যিকার দয়ায় ভ'রে গিয়ে তাঁর নাতনির দিকে তাকালেন।

'বেচারা,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ঠাকুমা। 'এই দুর্ঘটনায় গচ্চা যাওয়া সবকিছুর দাম ফিরিয়ে দেবার জন্তে তোর সারা জীবনটাও যথেষ্ট দীর্ঘ হবে না।'

সেদিন থেকেই এরেন্দিরা বকেয়া চুকিয়ে দিতে শুরু করলে ; শুরু করলে বৃষ্টির কোলাহলের তলায়, যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হ'লো গাঁয়ের মুদির দোকানটার মালিকের কাছে, সে এক শুঁটকো অপরিণত বিপত্নীক, কুমারীদের জন্যে ভালো দাম দেয় ব'লে মরুভূমিতে যার নাম সবাই জানে। বিস্ফারিত থাবড়ে না-গিয়ে ঠাকুমা যখন অপেক্ষা করছেন, বিপত্নীকটি বৈজ্ঞানিকের মতো নিরাসক্ত নিস্পৃহ কঠোর চোখে এরেন্দিরাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলে : সে-আন্দাজ ক'রে নিলে তার উরু দুটোর শক্তি, তার স্তনের আকার, তার নিতম্বের ব্যাস। তার দাম কী হবে সেটা মনে-মনে হিশেব না-ক'রে, সে একটাও কথা বললে না।

'এখনও বড্ড কচি আছে,' সে বললে তার পরে। 'চুঁচি দুটো তো ঠিক কুত্তির মতো।'

তারপর মুদিয়ালি এরেন্দিরার মাপজোক হিশেব-টিশেব প্রমাণ করবার জন্যে তাকে চড়ালে দাঁড়িপাল্লায়। এরেন্দিরার ওজন নব্বুই পাউণ্ড।

'বড়ো জোর একশো পেসো, তার চাইতে এর দাম মোটেও বেশি নয়,' বললে বিপত্নীকটি।

কেলেঙ্কারি দেখে আঁৎকে উঠলেন ঠাকুমা।

'একেবারে আনকোরা কোনো ছুঁড়ির জন্যে কুললে একশো পেসো!' প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন ঠাকুমা। 'না, সেনিওর, তাতে বোঝা যায় যৌন শুদ্ধতার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার অভাবটা শোচনীয় ও বিষম।'

'আমি দেড়শো পর্যন্ত উঠতে পারি,' বিপত্নীক বললে।

'এই মেয়ে আমার যা লোকশান করেছে তা দশ লক্ষ পেসোরও বেশি,' ঠাকুমা বললেন। 'এই হারে চললে আমার সব টাকা শুধে দিতে ওর দুশো বছর লাগবে।'

'আপনার বরাৎ ভালো যে ওর গুণ বলতে একটাই জিনিশ আছে—সে হ'লো ওর বয়েস,' বিপত্নীক বললে।

তুফান বাড়িটাকে উপড়ে ফেলবে ব'লেই ভয় দেখালে, আর ছাতে এতই ফুটোফোকর যে বাইরে যত ভেতরেও প্রায় ততটাই বৃষ্টি পড়ছে। ঠাকুমার মনে হ'লো সর্বনাশের এই জগতে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়েছেন।

'অন্তত তিনশো অব্দি বাড়ান,' ঠাকুমা বললেন।

'আড়াইশো।'

শেষটায় তাঁদের রফা হ'লো নগদ দুশো কুড়ি পেসোয় আর বাকি দাম

মেটানো হবে খাবারদাবারে। ঠাকুমা তখন এরেন্দিরাকে ইঙ্গিত করলেন বিপত্নীকের সঙ্গে যেতে, আর মুদিয়ালি তার হাত ধ'রে তাকে পেছনের ঘরে নিয়ে গেলো—যেন সে তাকে নিয়ে পাঠশালায় যাচ্ছে।

'আমি তোর জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবো,' ঠাকুমা বললেন।

'সি, আবুয়েলা,' বললে এরেন্দিরা।

পেছনের ঘর, অর্থাৎ একটা চালা ঘর, ইটের তৈরি চারটে থাম, পচা হাজা তালপাতার ছাউনি, তিন ফুট উঁচু একটা আদোবে [পোড়ামাটির] দেয়াল, যার ভেতর দিয়ে বাইরের যাবতীয় গণ্ডগোল দালানটার মধ্যে গিয়ে ঢোকে। আদোবে পাঁচিলের ওপরে নানারকম হাঁড়ি-পাতিলে ফণিমনসা আর অন্যান্য রুক্ষ-মাটির উদ্ভিদ বসানো। দুটো থামের মাঝখান থেকে ঝুলছে, কোনো হু-হু ভেসে-যাওয়া ডিঙির খোলা পালের মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে, একটা বিবর্ণ রংচটা দোলখাটিয়া। ঝড়ের শিস আর জলের ঝাপটা ছাপিয়ে কেউ শুনতে পেতো দূরের সব চীৎকার, কোথাও অনেক দূর থেকে গর্জন করছে বুনো জানোয়ার, কোথাও-বা উঠছে নৌকাডুবির আর্তনাদ।

এরেন্দিরা আর বিপত্নীকটি যখন চালাটার মধ্যে এসে ঢুকেছিলো তাদের আঁকড়ে ধরতে হয়েছিলো পরস্পরকে, বৃষ্টির দমকা যে-ঝাপটা তাদের সপসপে ভিজিয়ে চ'লে যাচ্ছে সেটা যাতে তাদের মাটিতে আছড়ে না-ফ্যালে। গলার স্বর শোনা যাচ্ছিলো না বটে কিন্তু তুফানের গরগর ছাপিয়ে স্পষ্ট শুনতে পারা যাচ্ছিলো তাদের নড়াচড়ার আওয়াজ। বিপত্নীকের প্রথম চেষ্টায় এরেন্দিরা কী-একটা চেঁচিয়ে উঠেছিলো অস্ফুট, চেষ্টা করেছিলো স'রে যেতে। বিপত্নীক তাকে উত্তর দিয়েছিলো কোনো কণ্ঠস্বর বিনাই, কব্জিটা ধ'রে মুচড়ে দিয়েছিলো হাত, হিঁচড়ে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো দোলখাটিয়ায়। এরেন্দিরা রীতিমতো যুঝেছিলো তার সঙ্গে, আঁচড়ে দিয়েছিলো তার মুখ। আবার চেঁচিয়ে উঠেছিলো থমথমাট স্তব্ধতায়, কিন্তু বিপত্নীক তাকে ঠাস ক'রে এমন-একটা চড় মেরেছিলো যে একচড়েই সে মাটি থেকে শূন্যে উঠে গিয়েছিলো, শূন্যেই সে ঝুলে ছিলো এক ঝলক, আর তার দীর্ঘ মেডুসা চুল উড়ছিলো শূন্যে। সে আবার মাটিতে নেমে আসার আগেই বিপত্নীক আঁকড়ে ধরেছিলো তার কোমর, পাশবিক এক ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছিলো দোলখাটিয়ায়, আর হাঁটু দিয়ে তাকে চেপে ধ'রে রেখেছিলো। এরেন্দিরা, আতঙ্কে, তলিয়ে গিয়েছিলো কোন্-এক বিভীষিকায়, হারিয়ে ফেলেছিলো তার সংজ্ঞা, আর তেমনিই থেকে গিয়েছিলো সারাক্ষণ যেন

হা ক'রে সম্মোহিত দেখছিলো একটা গাছের গা থেকে ক'রে-পড়া জ্যোৎস্না— যে-গাছটা উড়ে যাচ্ছে তুফানের হাওয়ায় ; আর সেই ফাঁকে বিপত্নীক নিরাবরণ ক'রে দিয়েছিলো তাকে, অত্যন্ত ব্যবহারপক থাবায় প্রায় হ্যাঁচকা টানেই ছিঁড়ে এনেছিলো তার পোশাক, যেন সে মাটি থেকে ঘাস ওপড়াচ্ছে চাপড়া-চাপড়া, আর তাদের সে ছড়িয়ে দিয়েছিলো চাপ-চাপ রঙের ভেলার মতো, যা ঢেউখেলানো রঙিন কাগজের মতো নেচে-নেচে উড়ে যাচ্ছিলো—হাওয়ার সঙ্গে যা শেষে উড়ে চ'লে গিয়েছিলো।

এরেন্দিরার প্রণয়ের জন্য দাম দিতে পারে, গাঁয়ে যখন এমন আর-কোনো পুরুষ বাকি রইলো না তার ঠাকুমা তাকে একটা ট্রাকে চাপালেন, যেখানে চোরাচালানকারীরা থাকে সেখানে যাবার জন্যে। তারা সফরটায় বেরুলো খোলা ট্রাকের পেছনটায় ; বস্তা-বস্তা চাল আর বালতি-বালতি তেল-ঘি, এবং আগুনের খিদে থেকে যা বাঁচানো গেছে সব সম্পত্তি নিয়ে : লাটসায়েবের বিছানার শিয়রের কাঠ, এক যুদ্ধরত অকুতোভয় দেবদূত, পোড়া সিংহাসন এবং আরো-সব অদরকারি বাতিল জঞ্জালের সঙ্গে। মোটা-মোটা তুলির টানে দুটি ক্রুশ-আঁকা একটা তোরঙ্গে তারা ব'য়ে নিয়ে গেলো আমাদিগদের হাড়গোড়।

একটা ছেঁড়া ছাতা মাথার ওপর মেলে দিয়ে ঠাকুমা নিজেকে বাঁচাতে চাচ্ছিলেন রোদ্দুর থেকে, ধুলো আর ঘামের অত্যাচারে অতিষ্ঠ তাঁর পক্ষে দম নেয়াটাই ভারি কঠিন হ'য়ে উঠেছিলো, কিন্তু এমন যা-দশাতেও তিনি তাঁর মেজাজ-মর্যাদার ওপর পুরো দখল রেখেছিলেন। স্তূপ-ক'রে-রাখা কৌটো আর চালের বস্তার আড়ালে এরেন্দিরাকে সফরের রাহাখরচ আর মালপত্তর নেবার মাশুল জোগাতে হ'লো ট্রাকের মাল ওঠানো-নামানোর যে-লোকটা তার সঙ্গে প্রতি দফা কুড়ি পেসো হারে প্রেম ক'রে। গোড়ায় এরেন্দিরার আত্মরক্ষার উপায় ছিলো বিপত্নীকের হামলাকে সে যেভাবে সামলাবার চেষ্টা করেছিলো সেই প্রতিরোধব্যবস্থাই, কিন্তু ট্রাকের খালাশির কায়দাটা ছিলো অন্যরকম, ধীরমন্থর ও প্রজ্ঞায় পণ্ডিত, আর শেষটায় সে তাকে পোষ মানালে মমতায় আর কোমলতায়। ফলে মারাত্মক সফরটার পরে তারা যখন গিয়ে প্রথম শহরটায় পৌঁছুলো, এরেন্দিরা আর ট্রাকের খালাশি তখন মালপত্তরের আড়ালে অতীব তৃপ্তিকর রতিক্রিয়ার পরে সুখে ও আয়েশে এলিয়ে প'ড়ে ছিলো। ট্রাকচালক চেঁচিয়ে ঠাকুমাকে বললে :

'এইখান থেকেই জগতের শুরু।'

ঠাকুমা অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন শহরটার হতশ্রী আর নির্জন

রাস্তাঘাট : আগের শহরের চাইতে এটা একটু বড়ো বটে, তবে যে-শহরটা ছেড়ে এসেছেন তারই মতো এটাও দুস্থ দুঃখী ও করুণ।

'দেখে তো আমার তা মনে হচ্ছে না,' ঠাকুমা বললেন।

'এটা চার্চের আশ্রয়ের পত্তনি,' ট্রাকচালক জানালে।

'দয়াদাক্ষিণ্য দানধ্যানে আমার আগ্রহ নেই, আমি চাই চোরাচালানকারীদের,' বললেন ঠাকুমা।

মালের বস্তাগুলোর আড়াল থেকে এই দ্বৈতালাপ শুনতে-শুনতে এরেন্দিরা অন্যমনস্কভাবে একটা বস্তাকে খুঁটছিলো—শেষটায় আঙুল দিয়ে সে একটা চালের বস্তা ফুটো ক'রে দিলে। হঠাৎ সে দেখতে পেলে ভেতর থেকে একটা সুতো বেরিয়ে আছে, সেটাকে ধ'রে টান দিতেই বেরিয়ে এলো খাঁটি মুক্তোর একটা হার। স্তম্ভিত হ'য়ে সে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো, হারটাকে সে আঙুলের ফাঁকে এমনভাবে ধ'রে আছে যেন সেটা একটা মরা সাপ; এদিকে ট্রাকচালক তখন ঠাকুমাকে বলছে :

'দিবাস্বপ্ন দেখবেন না, সেনিওরা। চোরাচালানকারী ব'লে কিছু নেই।'

'মোটেই না,' ঠাকুমা বললেন। 'তোমার নিজের জবানই আছে আমার।'

'দেখুন চেষ্টা ক'রে কাউকে পান কি না, তাহ'লেই টের পাবেন।' ট্রাকচালক একটু ইয়ার্কি করলে। 'সকলেই তাদের কথা বলে, কিন্তু কেউই নাকি চর্মচক্ষুতে কখনও কাউকে দ্যাখেনি।'

ট্রাকের খালাশিটি টের পেলে যে এরেন্দিরা হারটা টেনে বার ক'রে এনেছে; সে চট ক'রে সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবারও চালের বস্তায় ঢুকিয়ে রাখলে। শহরের এই দুঃস্থ দশা সত্ত্বেও, বিষম দারিদ্র্য সত্ত্বেও, ঠাকুমা স্থির করেছেন এখানেই থাকবেন; খালাশিকে ডেকে বললেন ট্রাক থেকে নামতে তাঁকে সাহায্য করতে। এরেন্দিরা খালাশিকে বিদায় জানালে চুমু খেয়ে, চুমুটা একটু তাড়া ক'রেই খেতে হ'লো, তবে সেটা ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত আর আন্তরিক।

ঠাকুমা, রাস্তার ওপরে তাঁর সিংহাসনে ব'সেই, অপেক্ষা ক'রে রইলেন কতক্ষণে তারা মালপত্তর নামানো শেষ করে। শেষ যেটা নামানো হ'লো সেটা আমাদিস-দের হাড়গোড়ে ভরা তোরঙ্গটা।

'এর ওজন তো দেখছি একটা লাশের মতো,' ট্রাকচালক রগড় ক'রে হেসে বললে।

'একটা নয়, দুটো,' ঠাকুমা বললেন, 'কাজেই যথাযোগ্য সম্মান কোরো ওদের।'

'বাজি ধ'রে বলতে পারি এরা সব বর্বরবৃত্তি,' ট্রাকচালক আবারও দাঁত বার করলে।

হাড়গোড়ওলা তোরঙটা সে তাজ্ঝিল্যোর সঙ্গে পুড়ে-যাওয়া আসবাবপত্রের মধ্যে নামিয়ে রেখে দিদিমার কাছে হাত পাতলে।

বললে, 'পকাশ পেসো।'

'তোমার গোলামটা এর মধ্যেই সব দক্ষিণ হস্তে পেয়ে গেছে।'

ট্রাকচালক অবাক হ'য়ে তার সহকারী খালাশিটির দিকে তাকাতেই সে সম্মতি-সূচক একটা ইঙ্গিত করলে। ট্রাকচালক তখন ফিরে চ'লে গেলো তার চালকের খোপে, যেখানে ব'সে ভ্রমণ করছিলো এক মেয়ে, শোকপোশাক গায়ে, কোলে একটা বাচ্চা—বাচ্চাটি গরমে অতিষ্ঠ হ'য়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। ট্রাকের খালাশি—নিজের সম্বন্ধে সে দিব্যি নিঃসংশয়—ঠাকুমাকে বললে :

'এরেন্দিরা আমার সঙ্গে আসছে—অবশ্য আপনার যদি কোনো আপত্তি না-থাকে।'

কিশোরী চমকে উঠে মাঝখানে প'ড়ে বললে :

'আমি কিন্তু কিছু বলিনি।'

'ভাবনাটা একেবারেই আমার, পুরোপুরি,' খালাশিটি বললে।

ঠাকুমা তার আগাপাছতলা নিরীক্ষণ করলেন, সেটা এজন্যে নয় যে ঐ চাউনির সামনে সে যেন কুঁকড়ে গুটিয়ে একরত্তি হ'য়ে যায়, বরং তার সাহসের পরিমাণটিই তিনি আন্দাজ করতে চাচ্ছিলেন।

'আমার কোনো আপত্তি নেই,' বললেন ঠাকুমা, 'যদি ওর অবহেলায় আমি যা-কিছু হারিয়েছি সব তুমি আমাকে পুষিয়ে দাও। সবশুদ্ধ আটশো বাহাত্তর হাজার তিনশো পেসো, তা থেকে বাদ যাবে চারশো বিশ, যা সে নিজেই এর মধ্যেই আমাকে শোধ ক'রে দিয়েছে। তাহ'লে দাঁড়ালো আটশো একাত্তর হাজার আটশো পঁচানব্বুই।'

ট্রাকের এনজিন জেগে উঠলো।

'বিশ্বাস করুন, আমার কাছে অত টাকা থাকলে সব আমি দিয়ে দিতুম,' খালাশি গম্ভীরভাবে বললে। 'মেয়েটি দামি।'

ছোকরার সিদ্ধান্ত শুনে দিদিমা বেশ খুশিই হলেন।

'বেশ, তাহ'লে, বাছা, তোমার যখন টাকা হবে ফিরে এসো,' সহানুভূতির স্বরে উত্তর দিলেন ঠাকুমা। 'তবে এখন তুমি বরং কেটে পড়ো, কারণ আবার

যদি হিসেব মেলাতে বসি তবে হয়তো দেখা যাবে তুমি আমার কাছে দশ পেসো ধারো।'

খালাশি লাফিয়ে উঠলো ট্রাকের পেছনটায় আর অমনি ট্রাকটা ছেড়ে দিলে। ট্রাকের ওপর থেকেই হাত নেড়ে সে বিদায় জানালে এরেন্দিরাকে, কিন্তু সে-বেচারা এতটাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো যে সে কোনোই সাড়া দেয়নি।

যে-ফাঁকা জায়গাটায় ট্রাক তাদের নামিয়ে দিয়েছিলো, এরেন্দিরা আর তার ঠাকুমা ঠিক সেখানেই দস্তার পাত আর প্রাচী-র কয়াশের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে কোনো-ক্রমে মাথা গোঁজবার একটা আশ্রয় উদ্ভাবন ক'রে নিলে। দুটো জাজিম পাতলে তারা মাটিতে আর প্রাসাদে থাকবার সময় যেমন ঘুমুতো তেমনি ভালো ঘুম হ'লো তাদের যতক্ষণ-না রোদ্দুর এসে ফুটো করলে ছাতে আর পুড়িয়ে দিলে তাদের মুখ-চোখ।

সাধারণত যেমন হয় এবার তার উলটোটাই হ'লো: এবার ঠাকুমাই এরেন্দিরাকে সাজাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। এরেন্দিরার মুখটি তিনি এমনভাবে সাজালেন যেন কোনো সুন্দরী এসেছে কারু অন্ত্যেষ্টিতে, শ্রাদ্ধবাসরে ; ঠাকুমার যৌবনে এমনিতর রূপেরই চলন ছিলো, তার আঙুলে পরিয়ে দিলেন নকল নখ, আর পাৎলা মসলিনের এক ফিতে এমনভাবে বেঁধে দিলেন মাথায় যে দেখে মনে হ'লো মাথায় যেন এক প্রজাপতি ব'সে আছে।

'বিশ্রী দেখাচ্ছে তোকে,' দিদিমা কবুল করলেন, 'তবে এভাবেই ভালো : মেয়েদের বেলায় পুরুষগুলো একেবারেই হাঁদা হ'য়ে যায়।'

চোখে দেখবার বেশ খানিকক্ষণ আগেই তাঁরা শনাক্ত করতে পারলেন মরুভূমির চকমকি পাথরের ওপর দুটি খচ্চরের চলার শব্দ। ঠাকুমার হুকুমে এরেন্দিরা এমন-ভাবে জাজিমের ওপর শুয়ে পড়লো যেন কোনো অপেশাদার অভিনেত্রী পর্দা ওঠবার ঠিক আগটায় শুয়ে আছে। যাজকের দোর্দণ্ডটার ওপর ভর দিয়ে ঠাকুমা বেরিয়ে এলেন আশ্রয় থেকে, এসে বসলেন তাঁর সিংহাসনে, খচ্চররা কখন এখান দিয়ে যায় তারই অপেক্ষায়।

আসছিলো ডাকহরকরা। তার বয়েস সবে কুড়ি পেরিয়েছে, কিন্তু তার জীবিকা তাকে এর মধ্যেই বুড়িয়ে ফেলেছে ; সে প'রে আছে খাকির উর্দি, পায়ে ফিতের মোজা, মাথায় শোলার টুপি, আর তার কার্তুজের কোমরবন্ধের সঙ্গে রয়েছে একটা সামরিক পিস্তল। ভালো একটা খচ্চরের ওপর চ'ড়ে চলেছে সে, অন্যটাকে লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—অন্য খচ্চরটা আরো-অনেক সময়জীর্ণ, তার ওপরেই স্তূপ ক'রে রাখা আছে ডাকের বস্তাগুলো।

ঠাকুমার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে একটা সেলাম ঠুকলো বটে, তবে থামলো না—চলতেই থাকলো; কিন্তু ঠাকুমা তাকে ইশারায় বললেন আশ্রয়ের মধ্যে ঢুকে দেখতে। লোকটা থামলো; দেখতে পেলে এরেন্দিরা তার মরণোত্তর প্রসাধনে সেজে জাজিমের ওপর শুয়ে আছে, গায়ে তার বেগনিলাল আঁচল দেয়া ঘাঘরা।

'কী? পছন্দ হয়?' ঠাকুমা জিগেশ করলেন।

প্রস্তাবটা যে সত্যি কী, এ-কথার আগে অব্দি ডাকহরকরা তা বুঝতেই পারেনি।

'কাউকে যদি নিছক রুগীর পথ্যি খেয়ে থাকতে হয়, তবে এ তার খারাপ লাগবে কেন?' ডাকহরকরা মুচকি হেসে বললে।

'পঞ্চাশ পেসো,' ঠাকুমা বললেন।

'বাব্বা, তুমি দেখছি আস্ত তোবাখানাই চাচ্ছো!' সে বললে, 'ও-টাকায় আমি সারা মাস পেট পুরে খেতে পারবো।'

'কঞ্জুশি কোরো না,' ঠাকুমা বললেন। 'হাওয়াই ডাক কোনো চার্চের পুরুতের চাইতে বেশি পয়সা দেয়।'

'আমি অন্তর্দেশীয় বিলি করি—দিশি ডাক,' লোকটা বললে, 'হাওয়াই ডাক যে বিলি করে সে ট্রাকে ক'রে যায়।'

'সে যা-ই হোক, প্রেমও খাওয়ার মতোই জরুরি কাজ,' ঠাকুমা বললেন।

'হ্যাঁ, তবে সে তো আর তোমার পেট ভরায় না।'

ঠাকুমা সমঝে গেলেন অন্য লোকেরা যার অপেক্ষায় হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকে তা যে বিলি ক'রে বেড়ায় তার হাতে দরদস্তুর করার জন্যে অঢেল সময় আছে।

'কত আছে তবে তোমার কাছে?' ঠাকুমা তাকে জিগেশ করলেন।

ডাকহরকরা খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে পকেট থেকে কিছু দোমড়ানো নোট বার ক'রে নিয়ে এসে ঠাকুমাকে তা দেখালে। ঠাকুমা সবগুলো নোট এমনভাবে দ্রুত হাতে ছিনিয়ে নিলেন যেন তাঁর হাত ছুটো একটা বল ছাড়া আর-কিছুই নয়।

'আমি তোমার জন্যে দাম কমাবো,' তিনি বললেন, 'তবে একটা শর্তে: কথাটা তোমায় চারপাশে চাউর ক'রে দিতে হবে।'

'জগতের একেবারে অন্তপ্রান্ত অব্দি,' ডাকহরকরা বললে, 'আমি তো সেই-জন্যেই আছি।'

এরেন্দিরা এতক্ষণ চোখের পাতা ফেলতেই পারছিলো না, এবার সে নকল চোখের পাতা খুলে নিলে, আর দৈবাৎ-পাওয়া ছেলেবন্ধুর জন্যে জাজিমের এক-

পাশে স'রে গেলো। যেই লোকটা আঁধারের মধ্যে দিয়ে ঢুকেছে, গড়ানে পর্দার একটা জোরালো হ্যাঁচকা টান মেরে ঠাকুমা দরজার মুখটা আটকে দিলেন।

চুক্তিটা কাজেরই হয়েছিলো। ডাকহরকরার কথায় ভুলে গিয়ে দূর-দূর থেকে লোক এলো এরেন্দিরার নতুনত্বের স্বাদ নেবার জন্যে। লোকদের পেছন-পেছন এলো জুয়োর টেবিল আর খাবারের দোকান, আর তাদের সবার পেছনে এলো, বাইসাইকেলে ক'রে, এক ছবিওলা যে শিবিরের দরজাটার উলটোদিকে একটা তেপায়ার ওপর বসালে তার শোকের আস্তিনওলা ক্যামেরাটা, পেছনে টাঙালে একটা পর্দা, তাতে ঝিলের ওপর চাঞ্চল্যহীন সব রাজহাঁস আঁকা।

তাঁর সিংহাসনে ব'সে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে-করতে ঠাকুমাকে দেখাচ্ছিলো যেন নিজের বাজারেরই অচেনা। একমাত্র যাতে তাঁর আগ্রহ ছিলো, সে হ'লো মক্কেলদের কাতারের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখা: তারা সবাই যে-যার নিজের পালা আসবার জন্যে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর এরেন্দিরার কাছে যাবার আগে পুরো টাকাটা তাদের দিতে হ'তো আগাম—আর ঠাকুমার আগ্রহ ছিলো সেই টাকা গুনতেই। গোড়ায় তিনি এতটাই কড়া খবরদারি করেছিলেন যে ভালো একজন মক্কেলকেও তিনি ভেতরে যেতে দেননি—তার কাছে পাঁচ পেসো কম ছিলো। তবে ক্রমে যখন মাসের পর মাস কেটে গেলো, ঠাকুমা বাস্তব দশার কাছ থেকে পাঠগুলো গিলে নিয়ে শেষটায় তেমন লোককেও ঢুকতে দিতেন যারা তাদের মাশুল জোগাতো ধর্মের পদক, পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন, বিয়ের আংটি কিংবা যা খুশি তাই, যা চকচক না-করলেও দাঁতে কেটে তিনি বুঝতে পারতেন জিনিশটা হ'লো খাঁটি সোনা।

প্রথম শহরে অনেকদিন কাটাবার পর, ঠাকুমার কাছে একটা মাল-বওয়া গাধা কেনবার মতো যথেষ্ট টাকা হ'লো, আর তিনি আরো-সব নতুন-নতুন জায়গার খোঁজে মরুভূমিতে বেরিয়ে পড়লেন—যে-সব জায়গা এরেন্দিরার দেনা শোধবার পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল ছিলো। তিনি ভ্রমণ করতেন একটা খাটুলিতে, গাধার পিঠে সেটা চাপানো হ'তো, আর নিশ্চল সূর্যের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এরেন্দিরা তাঁর মাথার ওপর ধ'রে রাখতো আধাশিকওলা এক ছাতা। তাদের পেছন-পেছন আসতো চারজন ইন্ডিয়ান কুলি যারা ব'য়ে নিয়ে আসতো শিবিরের বাকি যা-কিছু: জাজিম, মেরামত ক'রে সারানো সিংহাসন, স্ফটিকে গড়া দেবদূত, আর আমাদিসদের দেহাবশেষে ভরা তোরঙ্গগুলো। বহরটার পেছন-পেছন বাইসাইকেলে চেপে আসতো ছবিওলা, কিন্তু কখনও নাগাল ধ'রে নয়, ভঙ্গিটা, যেন সে অন্যকোনো মেলায় যাচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডের পর যখন ছ-মাস কেটে গিয়েছে ঠাকুমা তখন ব্যাবসাটার একটা পুরো ছবি পেলেন।

'এভাবেই যদি চলতে থাকে,' এরেন্দিরাকে বললেন, 'তুই আমাকে আট বছর সাত মাস এগারো দিনের মধ্যেই সব ধার শোধ ক'রে দিতে পারবি।'

চোখ বুদে আবার তিনি হিশেবটা খতিয়ে দেখলেন, দড়ির একটা থলে থেকে সূর্যমুখির বিচি বার করতে-করতে—সেখানে তিনি টাকাও রাখেন—তারপর তিনি ভুলটা শোধরালেন:

'সে অবশ্য ইণ্ডিয়ানদের থাকা-খাওয়ার খরচ আর অন্য-সব টুকিটাকি খরচ হিসেবে না-ধ'রেই।'

এরেন্দিরা গাধার সঙ্গে তাল রেখে-রেখে চলছিলো, ধুলোয় আর গরমে সে একেবারে কাহিল হ'য়ে নুয়ে পড়েছে। সে ঐ হিশেবের জন্যে ঠাকুমাকে কোনো তিরস্কার করলে না বটে, তবে অনেক কষ্ট ক'রেই তাকে চোখের জল চেপে রাখতে হ'লো।

'আমার হাড়গোড়ের মধ্যে শুধু কাচের গুঁড়োই আছে।'

'ঘুমোবার চেষ্টা কর।'

'সি, আবুয়েলা।'

সে তার চোখ বুজলো, গভীর শ্বাস টেনে নিলে তপ্ত হাওয়া, আর ঘুমের ঘোরেই সে পা ফেলে-ফেলে চলতে লাগলো।

...

দিগন্তের ধুলোর ঝড়ে ছাগলদের ভয় পাইয়ে দিয়ে খাঁচায় ভর্তি একটা ছোটো ট্রাক দেখা দিলে আর সান্ মিগেল দেল দেসিয়ের্তোর রবিবাসরীয় আলস্য ও জড়তায় পাখির কাকলি ছিলো যেন ঠাণ্ডা জলের একটা ঝাপটা। চালকের আসনে ব'সে ছিলেন এক হৃষ্টপুষ্ট ওলন্দাজ র‍্যানচমালিক, ঘরের বাইরে কাটিয়ে-কাটিয়ে তাঁর গায়ের চামড়া ফেটে গিয়েছে, কাঠবেড়ালির গায়ের রঙের মতো তাঁর গোঁফ-জোড়া যেটা তিনি উত্তরাধিকার পেয়েছেন কোনো বৃদ্ধ প্রপিতামহর কাছ থেকে। তাঁর ছেলে উলিসেস, সে বসেছিলো পাশের আসনে, ছিলো সোনায় মোড়া এক কিশোর, তার ছিলো নিঃসঙ্গ নাবিক চোখ আর তার চেহারাটা ছিলো কোনো চোরাগোপ্তা দেবদূতের মতো। ওলন্দাজ র‍্যানচমালিক দেখতে পেলেন একটা তাঁবুর সামনে স্থানীয় কেল্লার সব সৈন্য সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে নিজেদের পালা আসার অপেক্ষায়। তারা ব'সে আছে মাটিতে, একই বোতল থেকে চকচক ক'রে

মদ ঢালছে গলায়, বোতলটা চলেছে মুখ থেকে মুখে, মাথায় তাদের কাগজি-বাদামের ডালপালা যেন তারা হাড্ডাহাড্ডি হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হ'য়ে ছদ্মবেশ ধ'রে আছে। ওলন্দাজ তাঁর নিজের ভাষায় জিগেস করলেন :

'কোন শয়তানি জিনিশ ওরা বিক্রি করছে ওখানে?'

'একটি মেয়ে,' খুব স্বাভাবিকভাবেই বললে তার ছেলে। 'তার নাম এরেন্দিরা।'

'তুই জানলি কী ক'রে?'

'মরুভূমিতে সকলেই তার কথা জানে,' উত্তরে বললে উলিসেস।

ওলন্দাজ শহরের ছোটো সরাইটার সামনে ট্রাক থামিয়ে নেমে পড়লেন। উলিসেস ট্রাকেই থেকে গেলো। ক্ষিপ্র হাতে সে ব্রীফকেস খুলে ফেললে, তার বাবা যেটা আসনে ফেলে রেখে গিয়েছেন; একতাড়া নোট বার ক'রে নিয়ে কয়েক গোছা নোট রাখলে নিজের পকেটে, আর তারপর সব যেমন ছিলো তেমনি রেখে দিলে। সে-রাতে, যখন তার বাবা ঘুমুচ্ছেন, সে সরাইয়ের জানলা বেয়ে নেমে চ'লে গেলো এরেন্দিরার তাঁবুতে, কাতারের মধ্যে দাঁড়াবে ব'লে।

উৎসবের হুল্লোড় তখন চরমে। মাতাল রংরুটরা একা-একাই নাচছে যাতে বিনি পয়সায় পাওয়া গান হেলায় নষ্ট না-হয়, আর ছবিওলা রাতের ছবি তুলছে ম্যাগনেশিয়াম কাগজে। ব্যাবসার ওপর নজর রাখতে-রাখতে ঠাকুমা তাঁর কোলের ওপর ব্যাঙ্কনোটগুলো গুনছেন, ভাগ ক'রে রাখছেন সমান-সমান স্তূপে, তারপর সাজিয়ে রাখছেন সেগুলো একটা ঝুড়িতে। সে-সময়ে সারের মধ্যে মোটে বারোজন সৈন্য ছিলো, কিন্তু সন্ধের পর থেকে সারিটা ভ'রে উঠেছে বেসামরিক খদ্দেরে। সারির সব শেষে দাঁড়িয়ে আছে উলিসেস।

এবার পালা এলো বিমর্ষ, মুখগোমড়া এক সৈন্যের। ঠাকুমা শুধু যে তার পথই আটকালেন তা নয়, তার টাকার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়িও বাঁচালেন।

'না, বাছা,' তাকে বললেন তিনি। 'পৃথিবীর সব সোনা এনে দিলেও তুমি ভেতরে যেতে পারবে না। তুমি দুর্ভাগ্য নিয়ে আসো।'

সৈন্যটি—সে এখানকার নয়—হতভম্ব হ'য়ে গেলো।

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?'

'তুমি অলুক্ষুণে সব ছায়াকে টেনে নিয়ে আসো,' বললেন ঠাকুমা। 'শুধু তোমার মুখটা দেখলেই যে-কেউ বুঝতে পারবে।'

তিনি হাত নেড়ে তাকে চ'লে যেতে বললেন, তবে তাকে না-ছুঁয়েই; ইঙ্গিত করলেন পরের সৈন্যের জন্যে যেন সে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।

'ওহে সুপুরুষ, ভেতরে যাও,' তাকে তিনি বললেন সহৃদয়ভাবে, 'তবে বেশি সময় নিয়ো না, তোমার দেশ তোমাকে চায়।'

সৈন্যটি ভেতরে গিয়ে পরক্ষণেই ফিরে এলো, কারণ এরেন্দিরা তার ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলো। ঠাকুমা হাতের ভ্যানায় টাকার ঝুড়ি ঝুলিয়ে ভেতরে গেলেন, ভেতরে অবশ্য জায়গা তেমন নেই, তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পেছনটায়, সামরিক বাহিনীর একটা খাটুলিতে, এরেন্দিরা কিছুতেই তার শরীরের কাঁপুনি থামাতে পারছে না, ভারি করুণ তার দশা, সৈন্যদের ঘামে তার সারা শরীরটা থিনথিন করছে।

'আবুয়েলা,' হেঁচকি তুলে কাঁদলো সে, 'আমি ম'রে যাচ্ছি।'

ঠাকুমা কপালে হাত দিয়ে যখন দেখলেন জ্বর নেই, তখন তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

'আর মাত্র দশজন সৈন্য বাকি আছে,' ঠাকুমা বললেন।

জন্তুরা ভয় পেলে যে-রকম হাউ-মাউ করে, তেমনিভাবে এরেন্দিরা কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। ঠাকুমা বুঝতে পারলেন যে সে সত্যি বিভীষিকার সীমা পেরিয়ে গেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে চাপড়ে-চাপড়ে তিনি তাকে শান্ত করলেন।

'মুশকিল হ'লো তুই ভারি দুবলা,' তিনি তাকে বললেন, 'বাস, বাস, আর কাঁদে না, বরং ওষধি মাখানো জলে স্নান ক'রে নে, তাহ'লেই রক্ত ফের শান্ত হবে।'

এরেন্দিরা আরেকটু শান্ত হ'লে তিনি তাঁবু থেকে বেরুলেন আর অপেক্ষা-ক'রে-থাকা সৈন্যটিকে তার টাকা ফিরিয়ে দিলেন। 'আজকের মতো এই অব্দি,' তিনি তাকে বললেন। 'কাল এসো, আমি তোমাকে একেবারে সারির সামনে আসতে দেবো।' তারপর তিনি সার দিয়ে দাঁড়ানো অন্যদের দিকে তাকিয়ে হেঁকে বললেন:

'বাচ্চে লোক, আজ এই অব্দিই। আবার কাল সকাল ন-টায়।'

সৈন্য ও বেসামরিক খদ্দেররা চেঁচিয়ে প্রতিবাদ ক'রে সার থেকে বেরিয়ে এলো। ঠাকুমা তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, মেজাজ তাঁর শরীফ, কিন্তু ঐ সর্বনেশে দোর্দণ্ড তিনি হেই-হেই ক'রে ঘোরাচ্ছেন।

'তোমরা সবাই যে শুধু আস্ত একেকটা গাড়ল তা-ই নয়, তোমাদের কোনো দয়ামায়াও নেই। অন্যদের কথা তোমরা ভুলেও ভাবো না।' ঠাকুমা চেঁচিয়ে বললেন, 'মেয়েটা কীসে তৈরি ব'লে তোমাদের মনে হয়? লোহায়? ওর জায়গায়

তোমরা হ'লে কী করতে দেখতে পারলে ভালো হ'তো। ইতর! বদমায়েশ! গু-খোর বজ্জাত!'

লোকেরা উত্তরে তাকে আরো বাছা-বাছা খিস্তি করলে—কিন্তু এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদ ঠাকুমা ভালোই সামাল দিলেন—আর ঐ দোর্দণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন পাহারায়; শেষটায় লোকে খাবার-টেবিল তুলে নিয়ে গেলো, ভেঙে তছনছ ক'রে দিলে জুয়োর আখড়াগুলো। ঠাকুমা যেই তাঁবুর ভেতরে ঢুকতে যাবেন হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো উলিসেসের ওপর, জীবনের মতোই বড়ো, একা-একা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার ফাঁকায় যেখানে আগে অত লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলো। কেমন-একটা অলীক আভা ঘিরে আছে তাকে, অন্ধকারেও তাকে যে দেখা যায় তা বুঝি তার রূপের অমন জেল্লার জন্যেই।

'তুমি,' ঠাকুমা তাকে জিগেস করলেন, 'তোমার ডানার কী হ'লো?'

'যাঁর ডানা 'ছলো তিনি ছিলেন আমার ঠাকুর্দা,' উলিসেস তার স্বাভাবিক ধরনেই উত্তর দিলে, 'তবে কেউই সে-কথা বিশ্বাস করেনি।'

কী-রকম মোহিত হ'য়ে ঠাকুমা আবার তাকে নিরীক্ষণ করলেন। 'হুম, আমি বিশ্বাস করি,' বললেন তিনি। 'আচ্ছা, কালকে ডানা দুটি প'রে চ'লে এসো।' তিনি তাঁবুর মধ্যে চ'লে গেলেন, উলিসেসকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে গেলেন, যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই, জলন্ত।

স্নান ক'রে নেবার পর এরেন্দিরার অনেক ভালো লাগলো। আঁচলে ঝালর লাগানো একটা খাটো শেমিজ পরেছে সে, শুতে যাবার আগে চুল শুকোচ্ছে, কিন্তু এখনও তাকে চোখের জলের ঢল আটকে রাখবার জন্যে চেষ্টা করতে হচ্ছে। তার ঠাকুমা ঘুমোচ্ছেন।

এরেন্দিরার বিছানার পেছন থেকে, খুব আস্তে-আস্তে, আবির্ভূত হ'লো উলিসেসের মাথা। শঙ্কাতুর স্বচ্ছ টলটলে ডাগর চোখ দুটি দেখতে পেলে এরেন্দিরা, কিন্তু কিছু বলবার আগে সে তোয়ালে দিয়ে জোরে-জোরে মাথা ঘষলো এটাই প্রমাণ করতে যে এ তার চোখের দেখার ভুল নয়। যখন উলিসেস প্রথমবার চোখের পাতা ফেললে, এরেন্দিরা খুব নিচু গলায় তাকে জিগেস করলে:

'কে তুমি?'

উলিসেস তাকে নিজের কাঁধ অবধি দেখালে। বললে, 'আমার নাম উলিসেস।' এরেন্দিরাকে সে দেখালে যে-নোটগুলো সে চুরি করেছে, আর জুড়ে দিলে:

'আমার কাছে টাকা আছে।'

এরেন্দিরা তার হাত রাখলে বিছানায়, নিজের মুখটা উলিসেসের একেবারে কাছে নিয়ে এলো, তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগলো যেন এটা কিণ্ডারগার্টেনের বাচ্চাদের একটা খেলা।

'তোমার তো সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার কথা,' সে তাকে বললে।

উলিসেস বললে, 'আমি সারা রাত দাঁড়িয়ে থেকেছি।'

'বেশ, কিন্তু এখন আমার এমন লাগছে যে মনে হচ্ছে কেউ যেন বুকটায় এতক্ষণ ধ'রে মুগুর দিয়ে পিটিয়েছে।'

ঠিক তক্ষুনি ঠাকুমা ঘুমের ঘোরে তাঁর প্রলাপ শুরু করলেন।

'শেষ বৃষ্টি পড়ার পর কুড়ি বছর কেটে গিয়েছে,' ঠাকুমা বললেন। 'সে ছিলো এমনি ভয়াবহ তুফান যে বৃষ্টি মিশে গিয়েছিলো সমুদ্রের জলের সঙ্গে, আর পরের দিন সকালে বাড়িটা ভ'রে গিয়েছিলো শামুকে গুগলিতে আর তোর ঠাকুর্দা আমাদিস—আহা, তার আত্মা শান্তিতে থাকুক—দেখতে পেয়েছিলো জলজলে একটা বিদ্যুৎরশ্মির চাদর ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়।'

উলিসেস আবার বিছানার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। এরেন্দিরা মজা পেয়ে মুচকি একটা হাসি দেখালে তাকে।

'ভয় পেয়ো না,' সে তাকে বললে। 'ঘুমের ঘোরে ঠাকুমা সবসময়েই কেমন পাগলামি করে, কিন্তু কোনো ভূমিকম্পও তাকে আর জাগাতে পারবে না।'

উলিসেস পুনরাবির্ভূত হ'লো। এরেন্দিরা তার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে মুচকি হাসলে যাতে একটু দুষ্টুমি মেশানো—অবশ্য একটু স্নেহও মেশানো তাতে। আর জাজিম থেকে নোংরা চাদরটা সে তুলে নিলে।

'এসো,' সে বললে, 'চাদরটা পালটাতে আমায় সাহায্য করো।'

তখন উলিসেস বিছানার পেছন থেকে বেরিয়ে এলো, এসে চাদরের একটা কোনা ধরলো। চাদরটা যেহেতু জাজিমটার চাইতে বড়ো, ওদের সেটাকে কয়েক দফা ভাঁজ করতে হ'লো। প্রতিবার ভাঁজ করার সঙ্গে-সঙ্গে উলিসেস এরেন্দিরার কাছে আরো-কাছে এসে পৌঁছুলো।

'তোমাকে একবার চোখে দেখবার জন্যে আমি একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছিলাম,' হঠাৎ উলিসেস বললে। 'সকলেই বলে তুমি খুবই সুন্দরী, আর তারা ঠিকই বলে।'

'কিন্তু আমি ম'রে যাচ্ছি,' বললে এরেন্দিরা।

'আমার মা বলেন মরুভূমিতে যারা মারা যায় তারা আকাশে স্বর্গে যায় না, সমুদ্রে যায়,' বললে উলিসেস।

এরেন্দিরা নোংরা চাদরটা সরিয়ে আরেকটা চাদর পাতলো আবিরে—এ-চাদরটা ধবধবে পরিষ্কার, ইস্ত্রি-করা।

'আমি কোনোদিন সমুদ্র দেখিনি,' এরেন্দিরা বললে।

'সে প্রায় মরুভূমির মতোই, তবে বালির বদলে শুধু জল,' বললে উলিসেস।

'তাহ'লে তো তার ওপর দিয়ে হাঁটতে পারবে না তুমি।'

'আমার বাবা একজনকে জানতেন যিনি জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারতেন,' বললে উলিসেস, 'তবে সে অনেকদিন আগে।'

এরেন্দিরা মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তবু সে ঘুমুতেই চাচ্ছিলো এখন।

'যদি তুমি কাল খুব সকাল-সকাল আসো তবে সারির একেবারে প্রথমে থাকতে পারবে,' সে বললে।

উলিসেস বললে, 'আমি ভোরবেলাতেই বাবার সঙ্গে চ'লে যাচ্ছি।'

'এ-পথ দিয়ে তুমি আর ফিরবে না নাকি।'

'তা কে বলতে পারে?' উলিসেস বললে। 'আমরা শুধু দৈবাৎ এখানে এসে পড়েছি, কারণ সীমান্তে যাবার পথটা আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

এরেন্দিরা চিন্তিতভাবে তার ঘুমন্ত ঠাকুমার দিকে তাকালে।

'আচ্ছা,' সে মন স্থির ক'রে ফেললে। 'টাকাটা দাও আমায়।'

উলিসেস নোটের গোছাটা তাকে দিয়ে দিলে। এরেন্দিরা বিছানায় শুয়ে পড়লো, কিন্তু উলিসেস যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে কি-রকম কাঁপতে লাগলো, সেই চরম মুহূর্তে তার প্রতিজ্ঞা কেমন যেন দুর্বল হ'য়ে গিয়েছে। এরেন্দিরা তার হাত ধ'রে তাকে তাড়া লাগালে, আর শুধু তখনই সে উলিসেসের দুর্দশাটা বুঝতে পারলে। এই ভয়টার সঙ্গে এরেন্দিরার চেনা আছে।

'এই বুঝি তোমার প্রথমবার?' এরেন্দিরা তাকে জিগেস করলে।

উলিসেস কোনো জবাব দিলে না, বরং শুকনো একটু হাসলো। এরেন্দিরা একেবারে অন্য মানুষ হ'য়ে গেলো।

'আস্তে শ্বাস নাও,' সে তাকে বললে। 'প্রথমবারে সবসময়েই এমন হয়। পরে তুমি আর এ-সব খেয়ালও করবে না।'

এরেন্দিরা তাকে তার পাশে শোয়ালে আর যখন সে তার জামা-কাপড় খুললো তখন সে তাকে ঠিক মায়ের মতো শান্ত করলে।

'তোমার নাম কী?'

'উলিসেস।'

'এ মা, এ যে প্রিয়ো মাছ,' বললে এরেন্দিরা।

'না-না, এটা নাবিকের মাছ।'

এরেন্দিরা তার বুকের জামা খুলে দিলে, কতগুলো অনাথ চুমু খেলে তাকে, ঘ্রাণে নিলে তার গায়ের গন্ধ।

'তোমাকে দেখে মনে হয় আগাগোড়া সোনায় বানানো,' সে বললে, 'অথচ তোমার গায়ে ফুলের গন্ধ।'

'এ নিশ্চয়ই নারঙের গন্ধ,' বললে উলিসেস।

আগের চাইতে অনেকটা শান্ত, সে একটা যোগসাজশের ভঙ্গিতে মৃদু হাসলে।

'লোককে ভুল বোঝাবার জন্যে আমরা অনেক পাখি নিয়ে ঘুরে বেড়াই,' আরো জানালে সে, 'কিন্তু আসলে আমরা সীমান্ত পেরিয়ে গাদা-গাদা নারঙ পাচার ক'রে দিচ্ছি।'

'নারঙ তো বেআইনি কিছু নয়,' বললে এরেন্দিরা।

'এগুলো কিন্তু বেআইনি,' বললে উলিসেস। 'একেকটার দাম পঞ্চাশ হাজার পেসো।'

অনেকদিন পরে এরেন্দিরা একটু প্রাণ খুলে হাসলো।

'জানো, তোমার কী আমার ভালো লাগে?' সে বললে, 'কি-রকম গম্ভীর-গম্ভীর মুখ ক'রে তুমি কত-কী আজগুবি কথা বানিয়ে বলো।'

এরেন্দিরা আবার স্বতঃস্ফূর্ত আর মুখর হ'য়ে উঠেছে, যেন উলিসেসের সরলতা তার নিষ্পাপ ভাবভঙ্গি শুধু তার মেজাজটাই পালটে দেয়নি, যেন তার চরিত্রটাও পালটে দিয়েছে। ঠাকুমা—দুর্ভাগ্য এত অল্প দূরে—এখনও তাঁর ঘুমের ঘোরে প্রলাপ ব'কে চলেছেন।

'তখনকার দিনে, মার্চমাসের গোড়ায়, তারা তোকে বাড়ি নিয়ে এসেছিলো,' ঠাকুমা বলছেন, 'তোকে দেখাচ্ছিলো তুলোয় মোড়া একটা গিরগিটির মতো। আমাদিস—তোর বাবা—তার তখন কচি বয়েস, সুপুরুষ, সেদিন বিকেলে এত খুশি হ'য়ে উঠেছিলো যে কুড়িটা গাড়ি বোঝাই ক'রে ফুল আনতে পাঠিয়েছিলো, আর সে রাস্তা দিয়ে ফুল ছড়াতে-ছড়াতে এসেছিলো, শেষটায় সারা গাঁটাই সমুদ্রের মতো ফুলে-ফুলে সোনারং হ'য়ে উঠলো।'

বিশাল সব চীৎকার ক'রে, গোঁয়ারভাবে, তিনি কয়েক ঘণ্টা ধ'রে হৈ-হৈ ক'রে কথা ব'লেই চললেন। কিন্তু উলিসেস তাঁর কোনো কথাই শুনতে পায়নি, কারণ এরেন্দিরা তাকে এত ভালোবেসেছে, এত খাঁটি নিখাদ সেই ভালোবাসা

যে সে তাকে আবার ভালোবেসেছে আদ্দেক দামে, যখন তার ঠাকুমা উল্লাদের মতোই ব'লেই চললেন কী-সব, আর শেষটায় এরেন্দিরা তাকে তোর হওয়া অব্দি বিনি দামেই ভালোবেসে চললো।

...

একদল আশ্রমিক তাদের ক্রুশকলকগুলো ব'য়ে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো। দুর্ভাগ্যের হাওয়ার মতোই এক খ্যাপা হাওয়া তাদের রুক্ষ মোটা কেম্বিস কাপড়ের আলখিল্লা আর তাদের রুক্ষ কর্কশ দাড়িগুলো সব ঝাঁকাচ্ছে, তারা কোনোমতে অনেক চেষ্টা ক'রে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে। তাদের পেছনে আছে গির্জের আশ্রম, এক ঔপনিবেশিক শিলাময় স্তূপ, রূঢ় কর্কশ চুনকাম-করা দেয়ালের ঠিক ওপরটায় আছে খুদে এক ঘণ্টাঘর।

সবচেয়ে তরুণ যে আশ্রমিক তারই ওপর দলটার দায়িত্ব, আঙুল দিয়ে দেখালে চকচকে কাদামাটিতে কেমন-একটা স্বাভাবিক ফাটল ধরেছে।

চেঁচিয়ে বললে, 'এই দাগটা পেরিয়ে তোমরা আসবে না।'

যে-চারজন ইণ্ডিয়ান ঠাকুমাকে তাঁর তক্তা লাগানো খাটুলিতে ক'রে ব'য়ে আনছিলো, ঐ ধমকটা শোনবামাত্র তারা থমকে দাঁড়ালে। যদিও খাটুলির কাঠগুলোর ওপর বেশ স্বচ্ছন্দেই ব'সে ছিলেন ঠাকুমা আর তাঁর মনমেজাজ যদিও মরুভূমির ধুলোয় আর ঘামে কেমন ভোঁতা হ'য়ে এসেছিলো, ঠাকুমা তবু তাঁর উদ্ধত বদমেজাজটা আদ্যোপান্ত বজায় রাখলেন। এরেন্দিরা আসছিলো পায়ে হেঁটে। খাটুলিটার পেছন-পেছন মালপত্র ব'য়ে আসছিলো আটজন ইণ্ডিয়ানের এক সার আর সব শেষে তার বাইসাইকেলে চেপে আসছিলো ছবিওলা।

'মরুভূমি কারু বাপের জমি নয়,' বললেন ঠাকুমা।

'মরুভূমি ঈশ্বরের,' আশ্রমিক বললে, 'আর তোমরা তোমাদের ঐ ঘিনঘিনে ব্যাবসায় তাঁর সব পবিত্র বিধি লঙ্ঘন করেছো।'

ঠাকুমা তক্ষুণে শনাক্ত করেছেন আশ্রমিকের উপদ্বীপের ভাষা, কথ্য বুলির বিশেষ ব্যবহার ; মুখোমুখি সংঘর্ষটা তিনি এড়িয়ে গেলেন : তার অনড় আপোষহীন মতামতের দেয়ালে মাথা ঠুকে তিনি মাথা ভাঙতে চান না। তিনি পরক্ষণেই তাঁর আপন মূর্তি ধরলেন।

'আমি, বাপু, তোমার এইসব রহস্য বুঝি না।'

আশ্রমিক আঙুল তুলে এরেন্দিরাকে দেখালে।

'ঐ বালিকা নিতান্তই অপ্রাপ্তবয়স্ক।'

'কিন্তু সে আমার নাৎনি।'

'তাহ'লে তো আরো খারাপ,' আশ্রমিক উত্তর দিলে। 'স্বেচ্ছায় একে আমাদের তত্ত্বাবধানে রেখে যাও, নতুবা আমরা অন্য উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবো।'

তারা যে অ্যাদ্দুর যাবে, এটা ঠাকুমা আশা করেননি।

'তাই যদি হয় তো ঠিক আছে।' তিনি আতঙ্কিত হ'য়ে আত্মসমর্পণ করলেন। 'কিন্তু আগেই হোক পরেই হোক, আমি এখান নিয়ে যাবোই।'

আশ্রমিকদের সঙ্গে সংঘাতের তিনদিন পরে, ঠাকুমা আর এরেন্দিরা গির্জের আশ্রমের কাছেই একটা গ্রামে ঘুমুচ্ছিলো, এমন সময় একদল সন্তর্পণ নিঃশব্দ লোক, পদাতিক বাহিনীর টহলের মতো পা টিপে-টিপে এসে, লুকিয়ে, তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লো। এরা সবশুদ্ধ ছ-জন, ইণ্ডিয়ান নবীশ, বলিষ্ঠ আর কচিবয়েস, তাদের রুক্ষ কাপড়ের আলখাল্লা যেন জ্যোৎস্নায় জলজল করছিলো। টুঁ শব্দটি না-ক'রে তারা এরেন্দিরাকে একটা মশারির জালে জড়ালো, তারপর তাকে না-জাগিয়েই তাকে তারা তুলে নিলে, তাকে যখন তারা ব'য়ে নিয়ে গেলো মনে হ'লো মস্ত একটা ক্ষীণজীবী নশ্বর মাছ যেন চাঁদিম জালে ধরা প'ড়ে গিয়েছে।

তাঁর নাৎনিকে আশ্রমিকদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে উদ্ধার করতে কোনো উপায়ই বাদ দিলেন না ঠাকুমা। যখন সব চেষ্টাই—তা সে সরলসোজাই হোক বা অতীব ঘোরপ্যাঁচওলাই হোক—বিফল হ'লো, শুধু তখনই তিনি পুর কর্তৃপক্ষের শরণ নিলেন, যে-বেসামরিক পৌর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো একজন সামরিক কর্মচারীর ওপর। তাঁকে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর বাড়ির উঠোনে, বুক খোলা, সামরিক বাহিনীর একটা রাইফেল তাগ ক'রে জলন্ত আকাশে একটা কালো নিঃসঙ্গ মেঘের দিকে গুলি ছুঁড়ছেন। মেঘটাকে গুলিতে ঝাঁঝরা ক'রে তিনি বৃষ্টি নামাতে চাচ্ছিলেন, আর তাঁর গুলিগুলো হচ্ছিলো ক্ষিপ্ত আর নিষ্ফল, তবে তিনি ঠাকুমার কাহনটা শোনবার মতো জরুরি সময়টা দিলেন।

'আমি তো কিছু করতে পারবো না,' ঠাকুমার সব কথা শোনবার পর তাঁকে তিনি ব্যাখ্যানা ক'রে বোঝালেন। 'পোপের সঙ্গে শাসকদের যে-চুক্তি হয়েছে সেই অনুযায়ী পুরুৎরা প্রাপ্তবয়স্ক না-হওয়া অব্দি যে-কাউকে আটকে রাখতে পারে। কিংবা তার বিয়ে-হওয়া অব্দি।'

'আপনাকেই-বা তাহ'লে এখানে মেয়র হিশেবে রেখেছে কেন ওরা?' ঠাকুমা জিগেশ করলেন।

'বৃষ্টি নামাবার জন্যে,' মেয়রের সাফ জবাব।

তারপর যখন দেখলেন মেঘটা পাড়ার বাইরে চ'লে গিয়েছে, সেনর তাঁর সরকারি দায়িত্ব মুলতুবি রেখে ঠাকুমাকেই পুরোপুরি মনোযোগ দিলেন।

'আসলে আপনার এমন-একজনকে চাই যার যথেষ্ট ওজন আছে, যে আপনার হ'য়ে জামিন থাকবে,' সেনর বললেন ঠাকুমাকে। 'এমন-কেউ যে হলফ ক'রে আপনার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র দেবে, নাম সই ক'রে চিঠি লিখে যে আপনার যাবতীয় সদ্‌গুণ সম্বন্ধে জবান দেবে। আপনি সেনাদোর [সাংসদ] ওনেসিমো সান্‌চেসকে চেনেন ?'

মরু সূর্যের তলায় তাঁর বিপুল ও নশ্বর পাঞ্চভৌতিক বিস্তারের তুলনায় বড্ড ছোটো একটা চৌকির ওপর ব'সে ঠাকুমা বেজায় রেগে গিয়ে উত্তর দিলেন :

'মরুভূমির এই বিশালের মধ্যে আমি তো নিতান্তই এক নগণ্য স্ত্রীলোক।'

সেনর, তাঁর ডান চোখটা গরমে কুঁচকে গিয়েছে, তাঁর দিকে করুণার ভঙ্গিতে তাকালেন।

'তাহ'লে, সেনিওরা, মিছেমিছি সময় নষ্ট করবেন না,' সেনর বললেন, 'আপনাকে তাহ'লে জাহান্নামেই ভাজা-ভাজা হ'তে হবে।'

ঠাকুমা, অবশ্য, ভাজা-ভাজা হলেন না। আশ্রমটার ঠিক মুখোমুখি তিনি তাঁর তাঁবু গাড়লেন, তারপর ভাবতে বসলেন, যেমন ক'রে কোনো যোদ্ধা একা-একাই সুরক্ষিত কোনো নগরী দখল ক'রে নেবার কথা ভাবে। ভ্রাম্যমাণ ছবিওলা, যে তাঁকে খুবই ভালো চিনে ফেলেছিলো, তার সব মালপত্র তার সাইকেলে চাপিয়ে একা-একাই কেটে পড়বার উদ্‌যোগ করছিলো, বিশেষত যখন সে লক্ষ করলে যে ঠা-ঠা রোদ্দুরের মধ্যে ঠাকুমা আশ্রমের দিকে ঠায় নজর রেখে ব'সে আছেন।

'দেখাই যাক, কে আগে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে,' ঠাকুমা বললেন, 'ওরা না আমি!'

'ওরা এখানে আছে তিন-তিনশো বছর—আর এখনও ওরা সব সহ্য করতে পারছে,' ছবিওলা বললে, 'আমি চললাম।'

শুধু তখনই ঠাকুমা দেখতে পেলেন যে সাইকেলে তার সব জিনিশপত্তর চাপানো।

'তুমি আবার কোথায় চললে ?'

'হাওয়া যেখানে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়,' বললে ছবিওলা, আর সত্যি চ'লেও গেলো। 'পৃথিবী তো বিপুলা।'

ঠাকুমা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'ওহে অকৃতজ্ঞ, তুমি যত বড়ো ব'লে ভাবছো পৃথিবী তত বড়ো নয় মোটেই।'

বিষম রাগ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু তাঁর মাথা নড়ালেন না, তাহ'লে যে ঐ আশ্রয় থেকে নজর সরাতে হয়। ঐ খনিজ উত্তাপের অনেক অনেক দিন কিংবা খ্যাপা হাওয়ার অনেক অনেক রাত তিনি আর ওখান থেকে নড়লেন না, কারণ সারাক্ষণই তিনি মগ্ন হ'য়ে ছিলেন ভাবনায়, তাছাড়া আশ্রয় থেকেও এর মধ্যে কেউ বেরোয়নি। তাঁবুর পাশেই ইণ্ডিয়ানরা তালপাতা দিয়ে একটা আটচালা বানিয়ে তাদের দোলখাটিয়াগুলো সেখানেই টাঙিয়ে দিয়েছিলো, ঠাকুমা কিন্তু তাঁর সিংহাসনে ব'সে মাথা নেড়ে-নেড়ে অনেক রাত অব্দি নজর রেখেই চলতেন আর তাঁর বটুয়া থেকে না-রাঁধা দানাশস্য গালে ফেলে চিবুতেন—যেন অপরাহ্নের অলস বিশ্রামে কোনো বলীবর্দ।

এক রাত্তিরে ঠাকুমার একেবারে গা ঘেঁষে গেলো ত্রেরপল-ঢাকা ট্রাকের একটা বহর, আর সে-সব ট্রাকে একমাত্র যে-আলো জ্বলছিলো তা একটা রঙিন বাল্‌বের মালা, দেখে মনে হচ্ছিলো যেন ঘুমের ঘোরে চলেছে কতগুলো বেদি। ঠাকুমা তাদের তক্ষুনি চিনে ফেললেন, কারণ এগুলো ঠিক আমাদিগদের ট্রাকের মতো দেখতে। বহরের শেষ ট্রাকটা গতি মন্থর ক'রে শেষটায় পুরোপুরি থেমেই পড়লো আর চালকের খোপ থেকে একটা লোক নেমে এসে পেছনে কী যেন সারাতে চেষ্টা করলে। তাকে দেখে মনে হয় ঠিক যেন আমাদিগদেরই হুবহু, অবিকল, সংস্করণ, মাথায় কানা-তোলা টুপি, পায়ে উঁচু বুটজুতো, বুকে কাটাকুটি ক'রে গেছে দু-সার কার্তুজের বন্ধনী, একটা ফৌজি রাইফেল আর দুটো পিস্তল। অপ্রতিরোধ্য প্রলোভনে প'ড়ে ঠাকুমা লোকটাকে ডাকলেন।

'চিনতে পারছো না আমি কে?' তাকে তিনি জিগেশ করলেন।

লোকটা একটা বিজলি মশাল জ্বেলে নির্দয়ভাবে তাঁকে আলো ক'রে দিলে। কড়া নজর রেখে অবসন্ন মুখটিকে সে নিরীক্ষণ করলে এক ঝলক: চোখ দুটি অবসাদে মিইয়ে এসেছে, চুল শুকিয়ে জটপাকানো, তবু স্ত্রীলোকটি, এই বয়েসেও, এমন দুরবস্থাতেও, মুখের ওপর অমন রূঢ় আলো সত্ত্বেও, লোকটা বলতে পারতো, তবু এই রমণীই ছিলো জগতের সবচেয়ে সেরা রূপসী। যখন সে তাঁকে নিরীক্ষণ ক'রে নিশ্চিত হ'লো যে তাঁকে সে এর আগে কখনোই দ্যাখেনি, সে আলো নিভিয়ে দিলে।

'একটা জিনিশ আমি ঠিক জানি যে আপনি চিররহস্যের করুণাময়ী কুমারী নন।'

'ঠিক তার উলটো,' ঠাকুমা অতীব মধুর স্বরে বললেন। 'আমিই সেই মহিলা।'

নিছক সহজাত শক্তির বলেই লোকটা তার পিস্তলের বাঁটে হাত রাখলে।

'কোন মহিলা? কী মহিলা?'

'বড়ো আমাদিগের।'

'আপনি তাহ'লে এই জগতেরই নন,' সে কী-রকম টান-টান হ'য়ে গিয়ে বললে। 'কী চাই আপনার?'

'আমার নাৎনিকে—বড়ো আমাদিগের নাৎনিকে—উদ্ধার করবার জন্যে তোমার সাহায্য চাই। আমাদের ছেলে আমাদিগের মেয়ে গির্জের এই আশ্রমে বন্দী হ'য়ে আছে।'

লোকটা তার ভয়কে জয় করলে।

'ভুল দরজায় কড়া নেড়েছেন আপনি,' সে বললে। 'আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমরা ভগবানের কাজে-কারবারে জড়িয়ে পড়বো, তাহ'লে বোঝা যায় আপনি নিজের যে-পরিচয় দিলেন সেটা ঠিক নয়—আপনি তাহ'লে মোটেই আপনি নন, আমাদিগদের আপনি কস্মিন কালেও জানতেন না এবং চোরাচালানের কারবারটা যে কী সে-সম্বন্ধে আপনার কোনো বোধ-ধারণাও নেই।'

সেদিন ভোরবেলায় ঠাকুমা অন্যদিনের চেয়েও কম ঘুমুলেন। শুয়ে-শুয়ে জেগে রইলেন তিনি, গভীর ভাবলেন নানা বিষয়ে, গায়ে চাপানো এক পশমিনার চাদর, আর ভোর হবার আগে তাঁর স্মৃতি জট পাকিয়ে গেলো, আর চাপা-পড়া সেই ক্ষিপ্ত প্রলাপ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলো তাঁর ভেতর থেকে যদিও তিনি তখন জেগেই আছেন, আর তাঁকে আঁটো ক'রে বাঁধতে হ'লো বুক, হাত চাপা দিতে হ'লো বুকে, যাতে সমুদ্রের ধারের সেই বাড়ি তার সব মস্ত লাল-লাল ফুল যেখানে তিনি সুখী ছিলেন এককালে তার সেই বাড়ির স্মৃতি যেন এখন তাঁর দম আটকে না-দেয়। এইভাবেই প'ড়ে রইলেন তিনি, যতক্ষণ-না আশ্রমের ঘন্টা বাজলো আর দিনের প্রথম আলো পড়লো জানলায়-জানলায় আর মরুভূমিতে—আর গির্জের প্রভাতী উপাসনায় গরম-গরম রুটির গন্ধে মরুভূমি উপচে পড়লো। শুধু তখনই তিনি ঝেড়ে ফেললেন তাঁর অবসাদ, তাঁর ক্লান্তি, কেমন-একটা বিভ্রম তাঁকে যেন প্রতারণা করলে: যেন এরেন্দিরা উঠে প'ড়ে মরীয়া হ'য়ে পালাবার একটা উপায় খুঁজছে, এসে পড়তে চাচ্ছে তাঁর কাছে।

তারা তাকে জোর ক'রে আশ্রমে ধ'রে নিয়ে যাবার পর থেকে এরেন্দিরা অবশ্য এক রাত্তির জন্যেও তার ঘুম হারায়নি। তারা ঝোপ-ছাঁটার কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলেছে তার চুল যতক্ষণ-না তার মাথা দেখায় কোনো বুরুশের মতো, তার গায়ে

চাপিয়েছে কোনো সন্ন্যাসীর রুক্ষ আলখিল্লা, তাকে দিয়েছে একটা বাক্স আর চুন-গোলা বালতি যাতে সে প্রতিবার সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে বা নেমে গেলে সিঁড়িটায় সে চুনকাম ক'রে দিতে পারে। খচ্চরের কাজ এটা, কারণ অনবরত অবিশ্রাম কাদামাখা জুতো প'রে আশ্রমিকরা আর নবীশ বাহকরা আসছে যাচ্ছে, কিন্তু তবু এরেন্দিরার মনে হচ্ছিলো প্রতিদিনই এখন যেন রোববার—কয়েদির সেই বোড়ো নৌকোর মতো বিছানায় পর ছুটির দিনটায় যখন সে শুয়ে থাকতো। তাছাড়া রাত্তিরে শুধু সে একাই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তো না, কারণ এই আশ্রম নিজেকে উৎসর্গ করেছিলো—না, শয়তানকে ঠেকাবার জন্যে নয়, বরং মরুভূমির বিরুদ্ধেই এক অন্তহীন লড়াইতে। এরেন্দিরা নিজের চোখে দেখেছে ইণ্ডিয়ান নবীশেরা গোরুদের দুধ দুইবার জন্যে ডালকুত্তোর মতো হন্তে হ'য়ে যায়, তক্তার ওপর লাফঝাঁপ দেয় দিনের পর দিন পনীরকে চেপটে খাটো ক'রে বানাবার জন্যে, বা কোনো ছাগীকে কীভাবে তারা সাহায্য করে যখন কঠিন হ'য়ে ওঠে তার প্রসবচেষ্টা। সে তাদের দেখেছে চামড়াপাকানো ভক্তশ্রমিকদের মতো ঘেমে-নেয়ে অস্থির, জলাধার থেকে জল আনবার সময়; হাতে-হাতে জল ছিটোচ্ছে কোনো দুঃসাহসী বাগানে অন্য নবীশেরা যাকে নিড়ানি দিয়ে সাফ করছে, চকমকিপাথরের মতো কঠিন সেই মরুভূমিতে সব্জি ফলাবার জন্যে। নিজের চোখেই সে দেখেছে পার্থিব নরককুণ্ডুগুলো রুটি যেখানে সেঁকা হয় আর সেই ঘরগুলোও দেখেছে যেখানে জামাকাপড় ইস্ত্রি করা হয়। সে দেখেছে এক সন্ন্যেসিনি উঠোনে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে এক শুওরকে, পলাতক জন্তুটির কান পাকড়ে ধ'রে কীভাবে তার টানে আছড়ে প'ড়ে হিঁচড়ে গেছে আর কিছুতেই তাকে ছেড়ে না-দিয়ে গড়াগড়ি খেয়েছে কাদায়, আর চামড়ার ওপর-জামা পরা দুই নবীশ এসেছে শুওরটাকে বাগে আনবার জন্যে তাকে সাহায্য করতে আর একজন একটা কশাইয়ের ছুরি দিয়ে কেটেছে শুওরটার গলা আর সবাই মিলে কেমন ক'রে রক্তে-কাদায় মাখামাখি হ'য়ে গেছে। রুগীদের অন্তরণমহলে সে দেখেছে ক্ষয়রোগে-ভোগা সন্ন্যেসিনিদের—রাতকাপড়ের কাফনে মোড়া—যেন অপেক্ষা ক'রে আছে ঈশ্বরের শেষ অনুজ্ঞাটির জন্যে, আর তারা যখন অলিন্দে ব'সে কনের সাজ বোনে পুরুষরা ধর্মপ্রচার ক'রে বেড়ায় ধু-ধু মরুভূমিতে। এরেন্দিরা এতদিন যেন তার নিজেরই ছায়ায় বেঁচে ছিলো, এখন সে একে-একে আবিষ্কার করছে সুন্দর আর আতঙ্কের অতসব রূপ যা সে কখনও কল্পনাও করেনি তার ঐ সংকীর্ণ শয্যার জগতে; কিন্তু তাকে আশ্রমে ধ'রে নিয়ে যাবার পর থেকে সবচেয়ে ভোঁতা স্থূল অথবা সবচেয়ে মনোহর নবীশও

তার মুখ থেকে একটা কথাও বার করতে পারেনি। একদিন সকালে, সে যখন তার বালতিতে শাদা রং গুলছে, সে শুনতে পেলে তাদের ঘরে বাজানো সুর যেটা এমনই হালকা আলোর মতো যা মরুভূমির সব আলোর চাইতেও অনেক বেশি স্বচ্ছ, টলটলে। এই অলৌকিকে সম্মোহিত হ'য়ে, সে উঁকি মেরে ছাখে এক বিশাল শূন্য আপ্যায়ন ঘর, দেয়ালগুলো ফাঁকা আর বড়ো-বড়ো জানলার মধ্য দিয়ে চোখধাঁধানো জুনের আলো ঝ'রে পড়ছে আর যেন থমকে আছে স্থির; আর ঘরের ঠিক মাঝখানে সে দেখতে পেলে এক পরমাসুন্দরী সন্ন্যেসিনিকে যাকে সে এর আগে কখনোই চোখে ছাখেনি, সন্ন্যেসিনি ক্ল্যাভিক্যাডে ঈস্টারপরবের এক অরেটোরিও বাজাচ্ছে। চোখের পাতা একবারও না-ফেলে এরেন্দিরা শুনতে লাগলো সুর, তার বুকটা যেন সুতোর ডগায় ঝুলছে, আর সে শুনেই চললো স্বর যতক্ষণ-না মধ্যাহ্নভোজের ঘণ্টা বাজলো। খাবার পর, যখন সে তার খাগড়ার বুরুশ দিয়ে সিঁড়িতে শাদা রঙের পোঁচ বোলাচ্ছে, সে অপেক্ষা ক'রেই রইলো যতক্ষণ-না সব নবীশেরা সিঁড়ি বেয়ে আসা-যাওয়া ওঠা-নামা থামালে, তারপর যখন সে একেবারেই একা, কেউ যখন তাকে শোনবার নেই, শুধু তখনই আশ্রমে আসবার পর এই প্রথম সে কথা বললে।

বললে, 'আমি সুখী।'

ঠাকুমার মনে যে-আশা ছিলো যে এরেন্দিরা নিজেই পালিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে, এই কথা, কাজেই, তাতেই ইতি টেনে দিলে; তবে ঈস্টারের সাত সপ্তাহ পরে পেন্টেকস্টের পরবের আগে পর্যন্ত সে বজায় রেখে গেলো তার গ্র্যানাইট মৌনতা। সেই সময়ে আশ্রমিকেরা মরুভূমিতে চিরুনি চালিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো গর্ভবতী যত উপপত্নীকে, যাতে তাদের বিয়ে দিয়ে দিতে পারে। একটা লড়্ঝড় ট্রাকে ক'রে চার-চারজন অতিসশস্ত্র সৈন্য আর সস্তা কাপড়ে বোঝাই সিন্দুক নিয়ে তারা সবচেয়ে দূর-দূর বসতিগুলোতে গিয়েও হানা দিচ্ছিলো। সেই ইণ্ডিয়ান মৃগয়ার সবচেয়ে কঠিন অংশ ছিলো মেয়েদের বিশ্বাস করানো: মেয়েরা ঐশ্বরিক শ্রী বা আশীর্বাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করছিলো এই সত্যি যুক্তিটা দেখিয়ে যে মরদরা, যারা দু-ঠ্যাং ছড়িয়ে সারাক্ষণ দোলখাটিয়ায় ঘুমোয়, মনে করে উপপত্নী-দের চাইতে বৈধ পত্নীদের কাছ থেকেই তারা আরো হাড়ভাঙা খাটুনি দাবি করতে পারে। তাদের মন ভোলাবার জন্যে জরুরি হ'য়ে পড়লো ছলকৌশল: তাদের নিজেদের ভাষায় ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে চিনির পানায় গুলে দেয়া জরুরি হ'লো যাতে কথাগুলো খুব রুক্ষ না-শোনায়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে

ধবধকাটা চুলচাতুরীবাজ সে শুদ্ধ বিয়ের বিশ্বাস ক'রে বসলো একজোড়া ঝকঝকে কানের দুল দেখেই। বরদলের, অন্তদিকে, একবার যখন মেয়েদের সম্মতি আদায় করা হ'য়ে গেলো, রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে এক-এক ক'রে তোলা হ'লো তাদের দোলখাটিয়া থেকে, বাঁধা হ'লো তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে, চাপানো হ'লো ট্রাকের পেছনে যাতে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে তাদের বিয়ে দেয়া যায়।

কয়েকদিন ধ'রেই ঠাকুমা দেখছিলেন ছোট্ট ট্রাকটা বোঝাই ক'রে গর্ভবতী ইণ্ডিয়ান মেয়েদের আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু সুযোগটা তিনি গোড়ায় ধরতেই পারেননি। ধরতে পারলেন শুধু পেন্টেকস্টের রবিবারটায়, যখন তিনি দেখলেন বাজি ফাটছে হাউই উড়ছে ঘণ্টা বাজছে আর দেখতে পেলেন দুর্দশা আর হল্লোড়ে ভরা একটা ভিড় যেটা পাঁই-পাঁই ক'রে উৎসবের দিকে ছুটেছে, আর তিনি দেখতে পেলেন মুখে ঝালর লাগানো ওড়না আর মাথায় নববধূর টোপর প'রে ভিড়ের মধ্যে রয়েছে একদল গর্ভবতী মেয়ে, ধ'রে আছে তাদের সাময়িক পুরুষ সঙ্গীর বাহু, যাদের সঙ্গে তারা বৃন্দ বিবাহ মারফৎ বৈধ সম্পর্ক পাতাবে।

মিছিলটার সব শেষে যাচ্ছিলো এক কিশোর, অপাপবিদ্ধ হৃদয়, লাউয়ের খোলের মতো ক'রে কাটা ইণ্ডিয়ান চুল তার, গায়ে ছেঁড়া কাপড়, হাতে রেশমি ফিতে লাগানো ঈস্টারের এক মোমবাতি। ঠাকুমা তাকে ডাক দিলেন।

'বাছা, আমাকে শুধু এই কথাটা বলো,' তাঁর সবচেয়ে মসৃণ স্বরে শুধোলেন ঠাকুমা, 'এ-ব্যাপারটায় তোমার ভূমিকাটা ঠিক কী।'

মোমবাতিটাই ছেলেটিকে কেমন ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলো, আর তার গাধার মতো দাঁতের জন্যে তার পক্ষে মুখ বোজাও সম্ভব হচ্ছিলো না।

'পুরুৎরা আমাকে প্রথম খ্রিষ্টীয় ভোজ দেবে,' সে বললে।

'কত টাকা দিয়েছে ওরা?'

'পাঁচ পেসো।'

ঠাকুমা তাঁর বটুয়া থেকে একতাড়া নোট বার করলেন। ছেলেটি অবাক হ'য়ে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো।

'আমি দেবো কুড়ি পেসো,' বললেন ঠাকুমা, 'তোমার ঐ প্রথম খ্রিষ্টীয় প্রার্থনা-ভোজের জন্যে নয়, তোমাকে টাকা দেবো বিয়ে করার জন্যে।'

'কাকে?'

'আমার নাৎনিকে।'

এইভাবেই আশ্রমের উঠোনে সন্ন্যেসিনির ঢোলা আলখিল্লা আর একটা

রেশমি শাল প'রে—এটা তাকে দিয়েছিলো নবীশরা—এরেন্দিরার বিয়ে হ'লো, ঠাকুমা তার জন্যে যে-বর কিনেছেন তার নামটা অবধি না-জেনেই। নিশ্চল জলন্ত সূর্যের তলায় হ'লো গর্ভবতী নববধূর গায়ের ছাগীগন্ধের মধ্যে টালমাটাল আশায় সে সোরার জমির ওপর নতজানু হ'য়ে বসায় যন্ত্রণাটা সহ্য করলে। লাতিনে হাতুড়ি-পেটা ক'রে শোনানো হ'লো সান পাবলোর চিঠির শাস্তিতালিকা, কারণ আশ্রমিকেরা খুঁজেই পায়নি এই অদৃষ্টপূর্ব বিয়ের ছলনাজালকে ঠেকাবে কী ক'রে। তবে শেষ চেষ্টা হিশেবে তারা তাকে আশ্রমে রেখে দেবার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলো। সেই সামরিক পুরপিতা যে মেষকে তাগ ক'রে গুলি ছোঁড়ে, ধর্মপ্রচারের প্রধান অধ্যক্ষ, তার আনকোরা স্বামী আর তার ভাবলেশহীন ঠাকুমা—এদের উপস্থিতিতে এরেন্দিরার বিয়ে হ'য়ে গেলো; আবার এরেন্দিরা নিজেকে আবিষ্কার করলে সেই মায়াপাশে বন্দিনী যা তাকে আজন্ম চালিয়ে নিয়ে আসছে। যখন তারা তাকে জিগেস করলে তার স্বাধীন, সুনিশ্চিত, সত্যিকার অভিপ্রায়টা কী, সে একফোঁটাও দ্বিধা দেখালে না।

'আমি চ'লে যেতে চাই,' সে বললে। আর সে আঙুল তুলে তার স্বামীকে দেখিয়ে ব্যাপারটা আরো প্রাঞ্জল ক'রে তুললো। 'তবে এর সঙ্গে নয়—আমার ঠাকুমার সঙ্গে।'

...

তার বাবার নারঙ্গ বন থেকে একটা কমলালেবু চুরি করার চেষ্টায় উলিসেস একটা আস্ত বিকেলই নষ্ট ক'রে ফেললে। কারণ যখন তার অসুখে-ভোগা গাছগুলো ছাঁটছিলো তার বাবা তার ওপর থেকে একবারও নজর সরাননি, তাছাড়া বাড়ির ভেতর থেকে সারাক্ষণ সজাগ তাকিয়েছিলেন তার মা। তাই সে তার মৎলবটাই ছেঁটে ফেললে, অন্তত সেদিনকার মতো; আর ভেতরে-ভেতরে গজগজ করতে-করতেই বাবাকে সাহায্য ক'রে গেলো সে, যতক্ষণ-না তারা শেষ নারঙ্গগাছটার পাতা-টাতা ছেঁটে ফেললে। নারঙ্গকুঞ্জটা বিশাল, লুকোনো, চুপচাপ; আর কাঠের বাড়ি, টিনের চাল, জানলায় তামার জাফরি আর খুঁটির ওপর উঁচু ক'রে দাঁড় করানো মস্ত একটা পাতিও; আদিম সব উদ্ভিদ লতাপাতায় যেখানে প্রখর তীব্র সব ফুল ফুটে আছে। উলিসেসের মা পাতিওর একটা ভিয়েনায়-তৈরি দোল-কেদারায় হেলান দিয়ে ব'সে ছিলেন, মাথাধরা সারাবার জন্যে কপালে ধূমায়িত সব লতাপাতা, আর তাঁর সতেজ ইণ্ডিয়ান চাউনি কোনো অদৃশ্য আলোর রশ্মির মতো ছেলেকে অনুসরণ ক'রে বেড়াচ্ছিলো কমলাবনটার দূরতম কোণটা পর্যন্ত।

উলিসেসের মা বেশ সুন্দরী, স্বামীর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোটো, আর তিনি যে এখনও তাঁর উপজাতীয় পোশাক পরেন তা-ই নয়, তিনি তাঁর রক্তের সবচেয়ে প্রাচীন কুহেলিগুলোও জানেন।

গাছ-ছাঁটার কাঁচি-টাচি নিয়ে উলিসেস যখন বাড়ি ফিরলো, তার মা তাকে তাঁর বেলা চারটের ওষুধ এনে দিতে বললেন—কাছেই একটা টেবিলে ছিলো সে-ওষুধ। যেই সে তাদের ছুঁলো, গেলাশ আর শিশি তাদের রং পালটে ফেললো। তারপর, শুধু খেলার ছলেই, সে টেবিলের ওপর কতগুলো কাচের বাটির পাশেই যে কাচের কুঁজোটা ছিলো সেটা ছুঁলো আর অমনি তারও রং নীল হ'য়ে গেলো। মা ওষুধ খেতে-খেতে ছেলেকে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করলেন, তারপর যখন বুঝলেন যে এ তাঁর কোনো বিকারের ঘোর নয়, তখন তাকে তিনি গুয়াহিরা ইণ্ডিয়ান ভাষায় জিগেশ করলেন :

'কতদিন ধ'রে তোর এ-রকম হচ্ছে?'

'সেই যখন আমরা মরুভূমি থেকে ফিরে এলাম তখন থেকেই,' উলিসেস বললে, তেমনি গুয়াহিরা ভাষায়। 'এ শুধু হয় কাচের জিনিশ ছুঁলেই।'

দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার জন্যে সে টেবিলের ওপর যত বাটি-গেলাশ ছিলো সব এক-এক ক'রে ছুঁলো আর তারা সব নানান রঙে ঝলমল ক'রে উঠলো।

'ও-রকম হয় শুধু প্রেমে পড়লেই,' তার মা বললেন। 'কে সে?'

উলিসেস কোনো উত্তর দিলে না। তার বাবা—তিনি আবার গুয়াহিরা ভাষা বোঝেন না—তখন একরাশ কমলা নিয়ে পাতিওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

'কী বলছিস তোরা দুজনে?' তিনি জিগেশ করলেন উলিসেসকে, ওলন্দাজ ভাষায়।

'বিশেষ কিছুই না,' উলিসেস উত্তর দিলে।

বাবা যখন বাড়ির ভেতরে চ'লে গেলেন তখন তিনি ক্ষণিকের জন্যে উলিসেসের চোখের আড়াল হ'য়ে গিয়েছিলেন, তবে সে তাঁকে একটু পরেই আপিশঘরের মধ্যে দেখতে পেলে, একটা জানলা দিয়ে। যতক্ষণ-না ছেলের সঙ্গে একা হলেন মা অপেক্ষা ক'রে ছিলেন, তারপর আবার জিগেশ করলেন :

'কে সে, বল আমায়।'

'ও কেউ-না,' উলিসেস বললে।

উলিসেস উত্তর দিয়েছিলো একেবারেই আনমনাভাবে, কারণ বাবা আপিশ-ঘরে কী করেন না-করেন প্রভিতি খুঁটিনাটি নড়াচড়া সে অধীরভাবে লক্ষ করছিলো।

যখন তিনি বয়ার ঘুরিয়ে সিন্দুকের তালা খুললেন তার আগে কয়লাগুলো তিনি সিন্দুকের ওপর রেখেছিলেন। কিন্তু সে যখন অপলকে তার বাবার ওপর নজর রাখছে তার মা তখন একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েছিলেন।

'অনেকদিন তুই কোনো রুটি খাসনি,' মন্তব্য করলেন তার মা।

'রুটি আবার ভাল্লাগে না।'

সচরাচর যা হয় না, তা-ই হ'লো : মা-র মুখ হঠাৎ কেমন সজীব হ'য়ে উঠলো। 'মিছে কথা,' তিনি বললেন। 'রুটি তুই খাস না কারণ তুই প্রেমে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিস—আর যারা প্রেমরোগে ভোগে তারা রুটি খেতে পারে না।' তাঁর গলার স্বরও, তাঁর চোখের মতোই, অনুনয় থেকে ভয় দেখাবার মতো সতেজ হ'য়ে উঠলো।

'সে কে, আমাকে যদি বলতিস, তাহ'লে ভালো হ'তো,' তিনি বললেন, 'না-হ'লে আমি তোকে মন্ত্রপড়া জলে স্নান করাবো—যাতে তোর এই দশা কেটে যায়।'

আপিশঘরে ওলন্দাজ সিন্দুক খুললেন, কয়লাগুলো রাখলেন ভেতরে, তারপর আবার সাঁজোয়া ডালাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। উলিসেস তখন জানলা থেকে স'রে এসে অধীর গলায় তার মাকে উত্তর দিলে :

'তোমায় তো বলেইছি ও কেউ-না,' সে বললে। 'যদি তোমার বিশ্বাস না-হয়, বাবাকে জিগেশ কোরো।'

ওলন্দাজ তাঁর আপিশঘরের দরজায় তাঁর খালাশির পাইপটা জ্বালতে-জ্বালতে আবির্ভূত হলেন, তাঁর বগলে জরাজীর্ণ এক বাইবেল। তাঁর স্ত্রী তাঁকে এস্পানিওলে জিগেশ করলেন :

'মরুভূমিতে তোমাদের সঙ্গে কার দেখা হয়েছিলো ?'

'কারু সঙ্গে না,' তাঁর স্বামী উত্তর দিলেন, কিছুটা যেন মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। 'আমাকে যদি বিশ্বাস না-হয়, উলিসেসকে জিগেশ কোরো।'

যতক্ষণ-না সব তামাক পুড়ে গেলো পাইপটা চুষতে-চুষতে তিনি হলঘরটার শেষপ্রান্তে ব'সে রইলেন। তারপর তিনি এলোপাথারি খুললেন তাঁর বাইবেল, আর দু-ঘণ্টা ধ'রে প্রবহমান কমবয়ে ওলন্দাজ ভাষায় দাগ-দেয়া অংশগুলো প'ড়ে গেলেন।

মাঝরাতেও উলিসেস এমন তীব্রভাবে চিন্তা করছিলো যে সে ঘুমুতেই পারছিলো না। আরো একঘণ্টা সে তার দোলখাটিয়ায় ছটফট ক'রে এপাশ-ওপাশ করলো : স্মৃতির বেদনাকে জয় ক'রে নেবার চেষ্টা করছে সে ; কিন্তু শেষটায় এই

যেন্দাই তাকে এমন শক্তি দিলে যে সে তার মন স্থির ক'রে ফেললে। তারপর সে প'রে নিলে তার পাউচো পাৎলুন, পশমি ফিতে জামা, আর তার ঘোড়ায় চড়ার বুটজুতো, তারপর লাফিয়ে নামলে জানলা দিয়ে, পাখি বোঝাই ট্রাকটা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলো। নারঙ্গবনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সে তিনটে টসটসে পাকা কমলা তুলে নিলে—বিকেলবেলায় সে এগুলো চুরি করতে পারেনি।

বাকি রাতটা সে ছুটলো মরুভূমির মধ্য দিয়ে, আর ভোরবেলায় শহর ও গ্রামগুলোয় জিগেশ করতে শুরু করলে এরেন্দিরার তত্ত্বতল্লাস, কিন্তু কেউই তাকে কোনো খবর দিতে পারলে না। শেষটায় কারা যেন তাকে পাত্তা দিলে যে সেনাদোর ওনেসিমো সান্‌চেসের নির্বাচনী অভিযানের দলটার সঙ্গে সে ভ্রমণ করছে, আজ হয়তো সেনাদোর সান্‌চেস আছেন ন্যুয়েভা কাস্তিইয়ায়। উলিসেস কিন্তু তাঁকে সেখানে পেলে না, পেলে বরং তার পরের শহরে, এবং এরেন্দিরা এখন আর তাঁদের সঙ্গে নেই, কারণ ঠাকুমা শেষ অব্দি সেনাদোরকে তাঁর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে নিজের হাতে চিঠি লিখতে রাজি করিয়েছেন, আর সেই চিঠিটা দেখিয়ে তিনি এখন মরুভূমির সবচেয়ে শক্ত খিল-হুড়কো লাগানো দরজা উদ্ঘাটন করতে চলেছেন। তৃতীয়দিনে উলিসেসের দেখা হ'লো ডাকহরকরার, সেই যে-ছোকরা অন্তর্দেশীয় চিঠিপত্র বিলি ক'রে বেড়ায়, আর ডাকহরকরাই তাকে বললে কোন দিকে যেতে হবে।

'ওরা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে,' ডাকহরকরা বললে, 'আর তুমি বরং একটু তাড়াই কোরো, কারণ যমেরও অরুচি ঐ বুড়ি মৎলব এঁটেছে সমুদ্র পেরিয়ে আরুবা দ্বীপে যাবে।'

সেই দিকনির্দেশ অনুসরণ ক'রে, আধেকটা দিন পথ চলবার পর, উলিসেস দেখতে পেলে চওড়া দাগে-ভরা তাঁবুটা ঠাকুমা যেটা দেউলে-হ'য়ে-যাওয়া একটা সার্কাসের দলের কাছ থেকে কিনেছেন। ভবঘুরে সেই ছবিওলা আবার তাঁর কাছে ফিরে এসেছে, এখন সে পুরোপুরি মেনে নিয়েছে যে জগৎ সত্যিই অতটা বড়ো নয় যেমন সে একদিন ভেবেছিলো, আর সে জমিয়ে বসিয়েছে তার রাখালিয়া দৃশ্যপট তাঁবুর খুব কাছেই। পেতলের শিঙা ফুঁকে বাজনদারদের একটা দল এরেন্দিরার খদ্দেরদের মুগ্ধ ক'রে রেখেছে, প্রায় মৌন একটা ভাল্‌জ্ বাজিয়ে।

উলিসেস, ভেতরে যাবার জন্যে, অপেক্ষা করলে কখন তার পালা আসে; আর প্রথম যে-জিনিশটা তার নজরে এলো সেটা হ'লো তাঁবুর ভেতরের শৃঙ্খলা: সব পরিপাটি গোছানো, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ঠাকুমার খাটুলি আবার ফিরে

পেয়েছে তার লাটসাহেবি জাঁকজমক ও মহিমা, দেবদূতের মূর্তিটা যথাস্থানে বসানো—আমাদিসদের হাড়গোড়ে-ভরা তোরঙ্গ দুটির পাশে, অবিকল আছে রাং ঝালাই করা একটা স্নানের টব, সিংহের পায়ের ওপর সেটা দাঁড় করানো। তার আনকোরা চাঁদোয়া খাটানো বিছানায়, এরেন্দিরা শুয়ে আছে ন্যাংটো আর শান্ত স্থির, তাঁবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে যে-আলো চুঁইয়ে পড়ছে তাতে তাকে দেখাচ্ছে সে যেন শিশুদের মতো লাবণ্য বিকিরণ করছে। চোখ খুলেই সে ঘুমুচ্ছে। উলিসেস তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে, হাতে তার নারঙ্গগুলো, আর সে দেখতে পেলে যে এরেন্দিরা তাকে দেখছে না অথচ তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তখন সে তার চোখের ওপর তার হাতের পাতা নাড়ালে, ডাকলে তাকে সেই নামে যে-নামটা সে বানিয়ে নিয়েছে যখনই তার ইচ্ছে হয় এরেন্দিরার কথা ভাবতে :

'আন্দিরেএ!'

এরেন্দিরা জেগে উঠলো। উলিসেসের সামনে নিজেকে কেমন নগ্ন লাগলো তার, একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে সে একটা চাদর দিয়ে গলা অব্দি ঢেকে ফেললে।

'তাকিয়ো না আমার দিকে,' এরেন্দিরা বললে, 'আমি বীভৎস।'

'তোমার সারা গায়ে নারঙ্গের রং,' বললে উলিসেস। সে তার চোখের সামনে কমলাগুলো তুলে ধরলে যাতে এরেন্দিরা নিজেই তুলনা ক'রে নিতে পারে। 'এই ভাখো।'

এরেন্দিরা চোখের থেকে হাত সরালে, দেখতে পেলে যে সত্যি তার গায়ের রং কমলার মতোই।

'আমি চাই না যে তুমি এখন থাকো,' সে বললে।

'আমি শুধু তোমাকে এটা দেখাতেই এসেছি,' বললে উলিসেস। 'চেয়ে ভাখো, এখানে।'

সে তার নখ দিয়ে একটা নারঙ্গের খোসা ছাড়ালে, তারপর হাতের চাপে সেটা ভেঙে দু-আধখানা করলে, আর ভেতরে কী আছে সেটা দেখালে এরেন্দিরাকে : নারঙ্গটার ঠিক মাঝখানে একটা মস্ত খাঁটি হিরে।

'এই নারঙ্গগুলোই আমরা সীমান্ত পেরিয়ে নিয়ে যাই,' সে বললে।

'কিন্তু এরা তো সত্যিকার নারঙ্গ—গাছে-হওয়া!' এরেন্দিরা, চমকে গিয়ে, বললে।

'নিশ্চয়ই!' উলিসেস মুচকি হাসলে। 'এগুলো আমার বাবা ফলান।'

এরেন্দিরা তা বিশ্বাসই করতে পারছিলো না। সে তার চোখের ঢাকা সরিয়ে হিরেটা আঙুলে ধ'রে অবাক হ'য়ে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'এ-রকম তিনটে হ'লেই আমরা সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবো,' বললে উলিসেস।

হতাশ তাকিয়ে এরেন্দিরা তাকে হিরেটা ফিরিয়ে দিলে। উলিসেস ব'লেই চললো:

'তাছাড়া আমার সঙ্গে একটা মাল-বওয়া ট্রাক আছে,' জানালে সে। 'আর তাছাড়া…ছাখো!'

জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে বার ক'রে আনলে একটা সাবেক আমলের পিস্তল।

'দশ বছরের আগে আমি কোথাও যেতে পারবো না,' বললে এরেন্দিরা।

'তুমি যাবে,' বললে উলিসেস। 'আজ রাতে, যখন ঐ সাদা তিমি ঘুমিয়ে পড়বে, আমি বাইরে থাকবো, প্যাঁচার মতো ডাক দেবো।'

সে এমন চমৎকার নকল ক'রে প্যাঁচার ডাক শোনালে যে ঠিক মনে হয় যেন সত্যি প্যাঁচার ডাক, আর তা শুনে এই প্রথম এরেন্দিরার চোখ দুটি মৃদু হাসলো।

'উনি আমার ঠাকুমা,' সে বললে।

'কে? প্যাঁচা?'

'না। তিমি।'

ভুলটায় দুজনেই হেসে উঠলো, কিন্তু এরেন্দিরা পরক্ষণেই কথার জের তুলে নিলে।

'তার ঠাকুমার অনুমতি বিনা কেউ কোথাও—কোনোখানেই—যেতে পারে না।'

'সে-কথাটা ওঁকে বলবার কোনো কারণ নেই।'

'সে উনি যে-ক'রেই হোক জেনে যাবেন,' বললে এরেন্দিরা। 'উনি সবকিছুই স্বপ্নে দেখতে পান।'

'যখন উনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন তুমি চ'লে যাচ্ছো, ততক্ষণে আমরা সীমান্ত পেরিয়ে যাবো। আমরা সীমান্ত পেরুবো চোরাচালানিদের মতো।'

সিনেমার ভুখোড় বন্দুকবাজদের মতো আত্মবিশ্বাস নিয়ে, পিস্তলটা বাগিয়ে, সে নকল ক'রে শোনালে গুলির আওয়াজ টিশুম-টিশুম, যাতে তার বেপরোয়া ভাব দেখে এরেন্দিরা তেতে ওঠে। এরেন্দিরা হ্যাঁও বললে না, নাও বললে না, তবে তার চোখ দুটো যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে একটা চুমু খেয়ে উলিসেসকে বাইরে পাঠিয়ে দিলে। উলিসেস, একেবারে গ'লে গিয়ে, ফিশফিশ ক'রে বললে:

'কাল আমরা দেখতে পাবো জাহাজগুলো কেমন ক'রে জল কেটে চ'লে যায়।'

সে-রাত্তিরে, সন্ধে সাতটার একটু পরে, এমেলিয়া তার ঠাকুমার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলো, যখন আবার তার দুর্ভাগ্যের হাওয়া শন-শন বইতে শুরু ক'রে দিলে। তাঁবুর আশ্রয়ে ছিলো ইণ্ডিয়ান বেহারারা আর সেই পেতলের বাজনাদার দলের সর্দার : মাইনের জন্যে অপেক্ষা করছিলো তারা। ঠাকুমা হাতের কাছে যে-বাক্সটা ছিলো তা থেকে নোটগুলো তুলে নিয়ে গোনা শেষ করলেন, তারপর হিশেবের জাবদা খাতাটা দেখে তিনি সবচেয়ে বুড়ো ইণ্ডিয়ানের পাওনা চুকিয়ে দিলেন।

'এই-যে, তোমার টাকা,' তিনি তাকে বললেন। 'কুড়ি পেসো হপ্তা—তা থেকে আট বাদ যাবে খোরাকি, তিন বাদ যাবে জলের জন্যে, পঞ্চাশ সেন্ট কাটা যাবে নতুন জামার জন্যে, তার মানে সাড়ে-আট। নাও, গুনে নাও।'

বুড়ো ইণ্ডিয়ান টাকা গুনে নেবার পর তারা সবাই সেলাম ঠুকে বাইরে চ'লে গেলো।

'ধন্যবাদ, শাদা মেমসাব।'

তারপর এলো বাজনদারদের সর্দার। ঠাকুমা হিশেবের খাতা দেখলেন, ছবিওলার দিকে তাকালেন—সে তখন তার ক্যামেরার হাপর সারাবার চেষ্টা করছে দলা-দলা গাটাপার্চা দিয়ে।

'এই ব্যাপারটা কী হবে?' ঠাকুমা তাকে জিগেশ করলেন। 'বাজনার জন্যে তুমি সিকিভাগ দেবে, কি দেবে না?'

'ছবির মধ্যে তো কোনো গান আসে না।'

'কিন্তু গান বাজে ব'লেই লোকের ছবি তোলাতে ইচ্ছে করে,' ঠাকুমা উত্তর দিলেন।

'বরং উল্টো হয়,' ছবিওলা বললে। 'গান তাদের মনে করিয়ে দেয় যারা মারা গেছে, আর তারপর তারা ছবিতে ফুটে ওঠে চোখ বোজা।'

বাজনদারদের সর্দার বাধা দিলে।

'তারা যে চোখ বোজে সে কিন্তু গানের জন্যে নয়,' সে বললে। 'রাত্তিরে ছবি তোলবার সময় তুমি যে বিজলির ঝিলিক বানাও তাতেই তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়।'

ছবিওলা তবু জোর দিয়ে বললে : 'উঁহু, সে হয় গানের জন্যে।'

ঠাকুমা এই ঝগড়ার নিষ্পত্তি করলেন। 'মক্ষিচুষ হোয়ো না,' তিনি বললেন ছবিওলাকে, 'ভাখো, সেনাদোর ওনোফিয়ো সান্চেসের জন্যে কী ভালোই না

চলেছে সবকিছু—চুটিয়ে ছবি তুলছো তুমি—আর সে তো তাঁর সঙ্গে বাজনদারের দল আছে ব'লেই।' তারপর, রুক্ষ সুরে, তিনি শেষ করলেন:

'কাজেই যা তোমার দেয়া উচিত, মিটিয়ে দাও, আর নয়তো তোমার কপাল তোমারই—নিজের পথ নিজেই দেখে নাও। ঐ বাচ্চা মেয়েটা পুরো খাই-খরচার বোঝা শুধু একা নিজের কাঁধে তুলে নেবে, এ ঠিক নয়।'

'আমার কপাল আমিই বুঝবো,' ছবিওলা বললে। 'আমি তো আসলে একজন শিল্পী কিনা।'

ঠাকুমা অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাজনদারদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিলেন। একতাড়া নোট তার হাতে তুলে দিয়ে তিনি তাঁর হিশেবের খাতার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন।

'দুশো চুয়াত্তরটা গানের সুর,' তিনি তাকে বললেন। 'সুর পিছু পঞ্চাশ সেণ্ট ক'রে, তার সঙ্গে যোগ হবে রোববারে বত্রিশ আর ছুটির দিনে সুর পিছু ষাট সেণ্ট—একুনে একশো ছাপ্পান্ন পেসো কুড়ি সেণ্ট।'

বাজনদার কিছুতেই সে-টাকা নেবে না।

বললে, 'সব শুদ্ধ একশো বিরাশি পেসো চল্লিশ সেণ্ট হবে। ভাল্‌জের দাম আরো বেশি।'

'তা কেন হবে?'

'কারণ তাদের সুর আরো করুণ,' বাজনদার বললে।

ঠাকুমা তাকে টাকাটা নিতে বাধ্য করলেন।

'বেশ, এ-হপ্তায় তাহ'লে প্রতি ভাল্‌জের সঙ্গে দুটো ক'রে আহ্লাদের সুর বাজাবে—তাহ'লেই আমাদের শোধবোধ হ'য়ে যাবে।'

ঠাকুমার যুক্তি বাজনদারের মাথায় কিছুই ঢুকলো না, তবে মনে-মনে জটটা খোলবার চেষ্টা করতে-করতে সে অঙ্কটা মেনে নিলে। ঠিক সেই মুহূর্তে উত্তাল বাতাস তাঁবুটাকেই উপড়ে নেবার ভয় দেখালো, আর বাতাস তার পেছনে যে-স্তব্ধতা রেখে গেলো, তার মধ্যে বাইরে স্পষ্ট, করুণ, একটা প্যাঁচার ডাক শোনা গেলো।

সে যে ঘাবড়ে গেছে, এটা লুকোবার জন্যে এরেন্দিরা যে কী করবে তা ভেবেই পেলে না। সে টাকার বাক্সের ডালা বন্ধ ক'রে সেটা খাটুলির তলায় ঢুকিয়ে দিলে, কিন্তু তার হাতে চাবির গোছা তুলে দেবার সময় ঠাকুমা তার হাতের ভয়ের ভাবা ঠিক প'ড়ে ফেলেছিলেন। 'ভয় পাসনে,' তাকে তিনি বললেন। 'ঝড়ের রাতে প্যাঁচা ডাকে, সবসময়।' তবু সে যে আশ্বস্ত হয়েছে এমন কিন্তু বোঝা

গেলো না, বিশেষত সে যখন দেখলে যে ছবিওলা তার পিঠে ক্যাম্বো চাপিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'ইচ্ছে করলে তুমি কাল অব্দি সবুর করতে পারো,' ঠাকুমা বললেন ছবিওলাকে। 'আজ রাত্তিরে মরণ ছাড়া পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ছবিওলাও প্যাঁচার ডাক শুনেছিলো, কিন্তু তার জন্যে সে তার সিদ্ধান্ত পাল্‌টালে না।

'থেকে যাও, বাছা।' ঠাকুমা চাপ দিলেন। 'তোমাকে যে আমি পছন্দ ক'রে ফেলেছি, অন্তত তার খাতিরেও থেকে যাও।'

'আমি কিন্তু গানের জন্যে কানাকড়িও দেবো না,' ছবিওলা বললে।

'উঁহু, না,' ঠাকুমা বললেন। 'সে চলবে না।'

'তবেই ভাখো,' ছবিওলা বললে, 'কারু জন্যেই তোমার প্রাণে মায়া-দয়া নেই।'

রাগে ঠাকুমা কেমন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলেন।

'তাহ'লে, যা, ভাগ।' চ'টে উঠলেন ঠাকুমা। 'ভাগ, নিচুমন।'

এতটাই তিনি রেগে গিয়েছিলেন যে এরেন্দিরা যখন তাঁকে বিছানায় শোয়াতে নিয়ে গেলো তখনও তিনি ছবিওলার ওপর ঝাল ঝেড়ে চলেছেন। 'ডাইনি মায়ের বাচ্চা!' ঠাকুমা গজগজ করছিলেন। 'কার মনে কী আছে সে-কথা কী জানে বেজন্মাটা?' এরেন্দিরা তাঁর কথায় কোনো পাত্তাই দিলে না, কারণ হাওয়ার তোড় যেই একটু কমে অমনি প্যাঁচাটা জেদ ধ'রে একগুঁয়ের মতো ডাকে, আর সে-ডাক শুনে এরেন্দিরা যে কী করবে তা ভেবেই পায় না, আর কেবলই ছটফট করে। ঠাকুমা শেষ অব্দি বিছানায় শুলেন, পুরোনো প্রাসাদে শুতে যাবার আগে রোজ যে-পালা হ'তো তারই পুনরাবৃত্তি হ'লো, সেই একই রীতি, আর যখন তাঁর নাৎনি তাঁকে হাওয়া করলো আস্তে-আস্তে তাঁর রাগ প'ড়ে এলো, আর আবার তিনি তাঁর বন্ধ্যা শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে শুরু করলেন।

'তোকে সকাল-সকাল উঠতে হবে,' তখন তিনি বললেন, 'যাতে লোকজন আসার আগেই আমার স্নানের জন্যে লতাপাতা সেদ্ধ করতে পারিস।'

'সি, আবুয়েলা।'

'হাতে যা সময় থাকবে, তাতে তুই ইণ্ডিয়ানদের নোংরা কাপড়-চোপড় কেচে দিবি—তাহ'লে আসছে হপ্তায় ওদের মাইনে থেকে আরো টাকা কেটে নেয়া যাবে।'

'সি, আবুয়েলা।'

'আর উটপাখিটাকেও খেতে দিস।'

এরেন্দিরা বললে, 'সি, আবুয়েলা।'

হাতপাখাটা সে শিয়রের কাছে রেখে মৃতদের হাড়গোড়ে ভরা সিন্দুকের সামনে সে দুটো বড়ো পুজোর মোমবাতি জেলে দিলে। ঠাকুমা, এখন ঘুমের ঘোরে, তাঁর হুকুম দেবার কর্ষে পেছিয়ে পড়েছেন।

'আর আমাদিগদের জন্তে মোমবাতি জেলে দিতে ভুলিসনে।'

'সি, আবুয়েলা।'

তখনই এরেন্দিরা বুঝতে পারলে যে ঠাকুমা আর জাগবেন না, কারণ তিনি এতক্ষণে তাঁর প্রলাপ বকতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। সে শুনতে পেলে তাঁবুটাকে ঘিরে হাওয়া গরগর করছে, কিন্তু তবু সে তখনও বুঝতে পারেনি যে এ তারই দুঃসময়ের হাওয়া। সে রাতের দিকে তাকিয়ে রইলো অনিমেষ যতক্ষণ-না আবার ডেকে উঠলো প্যাঁচা আর মুক্তির জন্তে তার যে-সহজাত অনুভূতি সেটাই শেষকালে তার ঠাকুমার কুহকের ওপর জিতে গেলো।

তাঁবু থেকে সে পাঁচ পা বেরিয়েছে কি বেরোয়নি সে ছবিওলার মুখোমুখি এসে পড়লো, ছবিওলা তখন তার সাইকেলের পিঠে তার সব জিনিশপত্তর চাপাচ্ছে। যেন দুজনে কোনো শলা করেছে গোপনে, এমনিভাবে তাকে দেখে হাসলো ছবিওলা, আর তখন সে একটু শান্ত হ'লো।

'আমি কিছুই জানি না,' ছবিওলা বললে। 'আমি কিছুই দেখিনি। আর আমি গানের জন্তেও কোনো পয়সা দেবো না।'

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সে বিদায় নিলে। আর তখন এরেন্দিরা ছুটে গেলো মরুভূমিতে, চিরকালের মতো সে মনস্থির ক'রে ফেলেছে, একধারেই, আর যেখান থেকে প্যাঁচা ডাকছিলো, সেখানকার হাওয়ার ছায়ারা তাকে গিলে ফেললো।

সেবারে ঠাকুমা সঙ্গে-সঙ্গেই বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে হাজির। স্থানীয় দফতরের সিপাহসালার সকাল ছ-টার সময় লাফিয়ে নামলে তার দোলখাটিয়া থেকে যখন ঠাকুমা তার চোখের সামনে মেলে ধরলেন সেনাদোরের চিঠি। উলিসেসের বাবা দরজার কাছে অপেক্ষা করছিলেন।

'চিঠিতে কী লেখা আছে, তা আমি কোন জাহান্নাম থেকে জানবো?' সিপাহসালার চ্যাচালে। 'আমি পড়তেই পারি না।'

ঠাকুমা বললেন, 'এটা সেনাদোর ওনেসিমো সানচেসের লেখা অনুমোদনপত্র।'

আর-কোনো প্রশ্ন না-তুলেই সিপাহসালার তার দোলখাটিয়ার পাশে যে-

রাইফেলটা প'ড়ে ছিলো সেটা তুলে নিলে আর খাঁক-খাঁক ক'রে তার লোকদের হুকুম দিতে শুরু করলে। পাঁচ মিনিট পরে তারা একটা পলটনের ট্রাকে চেপে সীমান্তের দিকে উড়ে চললো, এমনকী বিরুদ্ধ হাওয়াকে কেটেই, উল্টো দিক থেকে বওয়া যে-হাওয়া পলাতকদের সব চিহ্ন মুছে ফেলেছে। সিপাহসালার বসেছে সামনে, চালকের পাশের আসনে। পেছনে বসেছেন ওলন্দাজ আর ঠাকুমা, আর দু-ধারের পাদানিতে একজন ক'রে সশস্ত্র পুলিশ।

শহরের কাছে এসে তারা বর্বাতি-ঢাকা ট্রাকের একটি বহর থামালে। পেছনে কয়েকজন লোক লুকিয়ে থাকছিলো, তারা কেম্বিস কাপড়ের ত্রেরপল তুলে ছোটো গাড়িটাকে তাগ ক'রে মেশিনগান আর ফৌজি রাইফেল উঁচিয়ে ধরলো। প্রথম ট্রাকের চালককে সিপাহসালার জিগেস করলে পাখিবোঝাই একটা খামারের ট্রাক তারা কত পেছনে রেখে এসেছে।

উত্তর দেবার আগেই চালক গাড়ি ছাড়লো।

'আমরা গোয়েন্দা কপুত্তর নই,' দেমাক সে ঠোঁট বেঁকালে। 'আমরা চোরা-চালান করি।'

সিপাহসালার দেখতে পেলে মেশিনগানগুলোর কালিঝুলি মাখা নল তার চোখের পাশ দিয়ে চ'লে গেলো আর সে হাত তুলে আত্মসমর্পণ ক'রে মিটিমিটি হাসলে।

'অন্তত,' সে তাদের উদ্দেশে চ্যাঁচালে, 'তোমাদের এটুকু শোভনতাবোধ থাকা উচিত ছিলো যে প্রকাণ্ড দিবালোকে এমন ক'রে যেতে নেই।'

শেষ ট্রাকের পেছনে, বাম্পারের গায়ে, লেখা : তো মা র ক থা ই আ মি ভা বি, এ রে ন্দি রা।

যত তারা উত্তরমুখো চলেছে হাওয়া ততই শুকনো খরখরে হ'য়ে উঠছে, আর হাওয়ার চাইতেও বেশি খেপে গিয়েছে রোদ্দুর। ঘেরা ট্রাকটার মধ্যে গরম আর ধুলোবালির জন্যে শ্বাস নেয়াও কঠিন।

ছবিওলাকে প্রথমে দেখতে পেলেন ঠাকুমাই : যেদিকটায় তাঁরা উড়ে যাচ্ছেন সেদিকটাতেই জোরে সাইকেল চালিয়ে ছবিওলা চলেছে। মাথায় শুধু একটা রুমাল জড়ানো, তাছাড়া রোদ্দুর থেকে বাঁচবার আর-কোনো উপায়ই নেই তার।

'ঐ-যে, ও!' আঙুল তুলে দেখালেন ঠাকুমা। 'ঐ হতচ্ছাড়া নিচু জাতই ওদের লোক!'

পাদানির ওপরে দাঁড়িয়ে-থাকা সেপাইদের একজনকে সিপাহসালার বললে ছবিওলার দায়িত্ব নিতে।

'ওকে পাকড়ে নিয়ে এখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা কোরো,' সিপাহসালার বললে। 'আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি।'

সেপাই চলন্তি ট্রাকের পাদানি থেকে লাফিয়ে নেমে দু-দুবার চেঁচিয়ে থামতে বললে ছবিওলাকে। উলটো দিক থেকে হাওয়া বইছিলো ব'লে ছবিওলা তাকে শুনতে পায়নি। ট্রাক যখন তার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো ঠাকুমা তার দিকে হেঁয়ালি-ভরা একটা ইশারা করলেন, কিন্তু সে সেটাকে ভুল ভাবলে সম্ভাষণ ব'লে, আর সে হেসে হাত নেড়ে তার জবাব দিলে। গুলির আওয়াজ সে শুনতে পায়নি। হাওয়ায় সে পৎপৎ উড়লো একবার, তারপর, মড়া, ধপ ক'রে পড়লো তার সাইকেলের ওপরেই, রাইফেলের গুলিতে ধড় থেকে মুণ্ডুটা উড়ে গিয়েছে: সে জানতেও পারেনি গুলিটা এসেছিলো কোত্থেকে।

দুপুরের আগেই তারা ছড়ানো পালক দেখলো এদিক-ওদিক। হাওয়ায় উড়ে আসছে তারা, কচি-কচি সব পাখির পালক। ওলন্দাজ তাদের দেখেই চিনতে পারলেন, কারণ এগুলো তাঁরই পাখির পালক, হাওয়া তাদের খাবলে-খুবলে উপড়েছে। চালক দিক পালটালে, প্যাডেলে পা চেপে সব তেল পাঠিয়ে দিলে এনজিনে, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা দিগন্তের কাছে দেখতে পেলে মাল-বওয়া ট্রাকটাকে।

পেছন দেখবার আয়নায় ফৌজি গাড়িটা আসছে দেখেই উলিসেস চেষ্টা করলে দুই গাড়ির মধ্যকার ব্যবধান বাড়িয়ে দিতে, কিন্তু তার এনজিনের এর চাইতে বেশি কোনো ক্ষমতা নেই। এককোঁটাও না-ঘুমিয়ে এতক্ষণ ধ'রে এসেছে তারা, অবসাদে তেষ্টায় তাদের প্রাণ যায় আর-কি। এরেন্দিরা, উলিসেসের কাঁধে মাথা রেখে ঢুলছিলো, হঠাৎ আঁৎকে জেগে উঠলো। সে দেখতে পেলে ট্রাকটা, সেটা এক্ষুনি তাদের নাগাল ধ'রে ফেলবে, আর সরল নিষ্পাপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় দস্তানার খুপরি থেকে এক হ্যাঁচকা টানে পিস্তলটা বার ক'রে নিয়ে এলো।

'এটা কোনো কাজের নয়,' বললে উলিসেস। 'এটা ছিলো সার ফ্রানসিস ড্রেকের পিস্তল।'

এরেন্দিরা কয়েকবার পিস্তলটা ঠুকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। হাওয়ায় পালক-ওপড়ানো পাখি বোঝাই লঝ্‌ঝড় ট্রাকটাকে ফৌজি টহল পেরিয়ে গেলো, তারপর একটা তীক্ষ্ণ মোচড় মেরে ঘুরে গিয়ে তার রাস্তা আটকে দাঁড়ালো।

এ-রকম সময়েই আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় হ'য়ে যায়, যেটা ছিলো তাদের সবচেয়ে জমকালো সময়; কিন্তু আমি হয়তো তাদের জীবনের খুঁটিনাটির দিকে তাকাতুমই না যদি-না অনেক বছর পরে রাকায়েল একালোনা, একটা গানের মধ্যে, এই নাটকটির ভয়াবহ পরিসমাপ্তি উদ্‌ঘাটন ক'রে দিতেন, আর তখনই আমার মনে হ'লো এই কাহনটা বাঁধা বোধহয় ভালো হবে। তখন আমি রিওআচা প্রদেশে বিশ্বকোষ আর ডাক্তারি বই বিক্রি ক'রে বেড়াতুম। আলভারো সেপেদা সামুদিও, সেও তখন ঐ এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, বিয়ার ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্রপাতি বেচতে; আর সে আমাকে তার ট্রাকে ক'রে মরুভূমির শহরগুলোয় নিয়ে যেতো, উদ্দেশ্য আমার সঙ্গে কোনোকিছু নিয়ে কথা বলে, কিন্তু আমরা এতই বকবক করেছি—সব বিষয়ে এবং কোনো বিশেষ বিষয়েই নয়—আর এত বিয়ার গিলেছি যে আমরা টেরই পাইনি কখন কিংবা কোথায় আমরা পুরো মরুভূমিটা পেরিয়ে একেবারে সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছি। আর দেখি, ঐ-তো ভ্রাম্যমাণ প্রণয়ের শিবির, তাঁবুর কেম্বিস কাপড়ের গায়ে এই বয়ান লেখা: এরেন্দিরা—সবার সেরা; এখন কাটো, আবার এসো পরে—ঐ অধীরা এরেন্দিরা তোমার তরে সবুর করে; কী অর্থ হয় জীবনে—এরেন্দিরা বিহনে? অন্তহীন ঢেউ-খেলানো সার চ'লে গেছে, কত জাতির কত-যে লোক, সমাজের কত স্তরের পুরুষ, সারটাকে দেখাচ্ছে কোনো সাপের মতো যার মেরুদণ্ডটা মানুষের, ফাঁকা সব জমি আর জোয়ারে ঢুলছে, রং-বাহারি সব হাটে-বাজারে কোলাহলে শোরগোলে, সেই শহরের সমস্ত রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসছে কাতারে-কাতারে লোক, পিলপিল পিলপিল, সেই শহর দিয়ে যাচ্ছে কত-যে ব্যাবসাদার আর তাদের হৈ-হট্টগোল। সব রাস্তাতেই খোলাখুলি জুয়োর আড্ডা, প্রত্যেক বাড়িই শুঁড়িখানা, প্রত্যেক দুয়ারই ফেরারিদের আশ্রয়। কত-যে মানে-বোঝা-যায়-না গান, কত-যে ফিরিওলার বেসাতি নিয়ে হাঁকাহাঁকি, সেই ঘোরলাগানো দুঃস্বপ্ন-দেখানো অসহ্য উত্তাপের মধ্যে সবকিছু মিলে তৈরি ক'রে দিচ্ছে আতঙ্কের একটাই হাহাকার।

সেইসব লোক যাদের নিজের দেশ ব'লে কিছু নেই, সব ফেরেব্বাজ জোচ্চোর বাটপাড়ের মেলায় ছিলো সাবু রাকামান, টেবিলের ওপর সটান দাঁড়ানো, জিগেস করছে কারু কাছে সত্যিকার কোনো সাপ আছে কি না, সাপের বিষের যে-প্রতিষেধক সে আবিষ্কার করেছে নিজের শরীরেই যাতে সেটা পরখ ক'রে দেখাতে পারে। ছিলো এক মেয়ে, যে বদলে গিয়েছিলো মাকড়শায়, শুধু তার মা-বাবার

কথা শোনেনি ব'লেই, পঞ্চাশ সেন্ট দিলে যে তাকে ছুঁয়ে দেখতে দেয় লোককে, লোকে যাতে বুঝতে পারে এর মধ্যে কোনো জোচ্চুরি নেই, আর যারাই তার এই দুর্দশা নিয়ে প্রশ্ন করতে চায় তাদেরও সে বাকি সব কথার জবাব দেবে। চিরজীবনের মধ্য থেকে এক দূত এসে হাজির, যে ঘোষণা করলে জমকাল ভয়ংকর ভুতুড়ে বাদুড়ের অত্যাসন্ন আগমনবার্তা, যার জলন্ত পলক আর বাতাস ভরা নিশ্বাস উলটে দেবে প্রকৃতির সব নিয়মকানুন আর সমুদ্রের সব রহস্যকে যে অতল থেকে নিয়ে আসবে জলের ওপর।

একটাই বিশ্রামে ভরা শুধু 'পস্তাকেশ' ছিলো শহরের, সেটা লাল আলোর পতিতাপল্লি, শহরে শোরগোলের শুধু ফুলকিরাই যেখানে গিয়ে পৌঁছোয়। সিন্ধু-গোলাপের চৌকোণ থেকে-আসা স্ত্রীলোকেরা পরিত্যক্ত ক্যাবারের একঘেয়েমিতে শুধু হাই তোলে। তারা ব'সে-ব'সেই ঘুমোয় তাদের সিয়েস্তা, যে-সব লোক তাদের কামনা করেছে অজাগর থেকেছে তাদের কাছে, আর কড়িকাঠ থেকে যে-পাখা ঝোলে তার তলায় তারা অপেক্ষা ক'রে থাকে ভুতুড়ে বাদুড়ের আবির্ভাবের জন্যে। হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে একজন উঠে পড়লো, গেলো একটা অলিন্দে, যেখানে হাঁড়ি-পাতিলে ফুল ফুটে তাকিয়ে আছে নিচে রাস্তার দিকে। নিচে ঐখান দিয়ে এরেন্দিরার অনুরক্তরা চলেছে পিলপিল পিলপিল।

'এসো-এসো,' মেয়েটি চেঁচিয়ে বললে তাদের, 'ওর এমন কী-জিনিশ আছে যা আমাদের নেই?'

'সেনাদোরের কাছ থেকে এক চিঠি,' কেউ-একজন চেঁচিয়ে সাড়া দিলে।

শোরগোল আর হাসির হররা শুনে অন্য মেয়েরা এসে দাঁড়ালে অলিন্দে।

'দিনের পর দিন ধ'রে সারটা এ-রকমই চলেছে,' তাদের একজন বললে, 'শুধু ভাবো পঞ্চাশ পেসো ক'রে একেকজনা।'

প্রথমে যে এসেছিলো, সে মনস্থির ক'রে নিলে:

'বেশ, আমি গিয়ে দেখবো ঐ সাত মাসের বাচ্চার কাছে কোন রতন আছে।'

'আমিও যাবো,' আরেকজন বললে, 'ব'সে-ব'সে চৌকিগুলো বিনিপয়সায় গরম করার চাইতে তা ভালো হবে।'

যাবার পথে অন্য অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগ দিলে, আর যখন তারা গিয়ে এরেন্দিরার তাঁবুতে পৌঁছুলো, ততক্ষণে তারা একটা হল্লাগোল্লা মিছিল বানিয়ে ফেলেছে। কাউকে কিছু না-ব'লেই তারা ভেতরে ঢুকে পড়লো, বালিশ তুলে ছুঁড়ে মারলো যে-লোকটাকে তারা দেখতে পেলে, দেখতে পেলে সে তার টাকা

বেরিয়ে এসেছে, তারা লক্ষ করলে সুপ্রাচীন শামুকের এক বাতাস আর তারা শুনতে পেলে হ্যাঁচকা ছেঁড়া-ছেঁড়া জ্যামেকার ভাষায় কথাবার্তা আর অনুভব করলে বেঁচে-থাকার একটা আকৃতি, আর বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা গেরো বেঁধে গেলো। তারা সমুদ্রে পৌঁছেছে।

'এই-যে সমুদ্র,' অর্ধেক জীবন নির্বাসনে কাটাবার পর ক্যারিবিয়ানের কাচের মতো আলোর ঘ্রাণ টেনে ঠাকুমা বললেন: 'তোর ভালো লাগছে না এখানে?'

'সি, আবুয়েলা।'

সেখানেই তারা তাঁবু পাতলে। ঠাকুমা রাতটা কাটালেন অনর্গল কথা ব'লে, স্বপ্ন না-দেখেই, আর মাঝে-মাঝেই তিনি গুলিয়ে ফেললেন তাঁর পিছুটান আর ভবিষ্যতের দিকে তাকাবার প্রাঞ্জল দৃষ্টি। সচরাচর যখন শুতে যান তার চেয়েও পরে শুতে গেলেন, আর জেগে উঠলেন সমুদ্রের শব্দে, মেজাজ শরীফ, চাপ উধাও। তা সত্ত্বেও, এরেন্দিরা যখন তাঁকে স্নান করাচ্ছে তিনি আবার ভবিষ্যৎবাণী করলেন, আর এটা হ'লো এমনই এক জ্বরাতুর অলোকদৃষ্টি যে মনে হ'লো এটা যেন তাঁর রাতপাহারার প্রলাপবিকার।

'সম্ভ্রান্ত এক মহিলা হ'য়ে উঠবি তুই,' ঠাকুমা বললেন নাৎনিকে। 'সেনিওরা, অশেষ গুণের আধার, তোর অধীনে তোর তাঁবে যারা থাকবে তারা সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা করবে তোকে, আর কর্তৃপক্ষের একেবারে ওপরমহলের লোক তোকে সম্মান করবে, খাতির করবে। জাহাজের কাপ্তেনরা তোকে জগতের সব বন্দর থেকে ছবি-ছাপা পোস্টকার্ড পাঠাবে।'

এরেন্দিরা তাঁর কথা শুনছিলোই না। বাইরে থেকে বসানো এক নলের মধ্য দিয়ে ওষধি লতাপাতায় সুগন্ধি উষ্ণ জল গলগল ক'রে ঢুকছে স্নানের গামলায়। এরেন্দিরা সে-জল একটা লাউয়ের খোলে তুলে নিয়ে—অভেদ্য, এমনকী যেন শ্বাসও নিচ্ছে না—একহাতে তা ঠাকুমার ওপর ঢালছে আর অন্যহাত দিয়ে তাঁর গায়ে সাবান মাখাচ্ছে।

'তোর বাড়ির নামডাক মুখে-মুখে উড়ে বেড়াবে, আন্তিইয়ের সুতোর মালার মতো দ্বীপ থেকে ওলন্দাজ দেশের সীমা অব্দি,' ঠাকুমা ব'লেই চলেছেন। 'আর তোর বাড়ি রাষ্ট্রপতি-ভবনের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠবে, কারণ সরকারের সব নীতি-টিতি ওখানেই আলোচনা হবে, আর ওখানেই নির্ধারিত হবে দেশের ভবিতব্য।'

আচমকা নলের মধ্যে জলের তোড় থেমে গেলো। কী হচ্ছে দেখতে এরেন্দিরা

তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো, আর দেখতে পেলো যে-ইণ্ডিয়ানের ওপর জল ঢালবার ভার ছিলো সে রসুইঘরের পাশে কাঠ কাটছে।

'সব জল বেরিয়ে গেছে,' ইণ্ডিয়ানটি বললে। 'আমাদের আরো-কিছু জল ঠাণ্ডা করতে হবে।'

এরেন্দিরা উনুনের কাছে গিয়ে দেখতে পেলে আরো-একটা মস্ত ডেকচিতে সুগন্ধি ওষধি মেশানো জল টগবগ টগবগ ফুটছে। সে তার হাত জড়িয়ে নিলে কাপড়ে আর দেখতে পেলে ইণ্ডিয়ানটির সাহায্য ছাড়াই সে ডেকচিটাকে তুলতে পারে।

সে ইণ্ডিয়ানটিকে বললে, 'তুমি যেতে পারো। আমি নিজেই জল ঢেলে দেবো।'

ইণ্ডিয়ানটি রসুইঘর থেকে বেরিয়ে-যাওয়া অব্দি সে অপেক্ষা করলে। তারপর সে ঐ টগবগে জল তুলে নিলে উনুন থেকে, প্রচণ্ড চেষ্টা ক'রে ডেকচিটা তুললো নলের মুখ অব্দি, আর যেই সে সেই মারণজল নলের মুখে ঢালতে যাবে যাতে সেটা তক্ষুনি স্নানের গামলায় চ'লে যায় এমন সময় ঠাকুমা তাঁবুর মধ্য থেকে হেঁকে উঠলেন :

'এরেন্দিরা!'

মনে হ'লো তিনি যেন সব দেখে ফেলেছেন। নাৎনি, হাঁক শুনে ভয় পেয়ে, শেষ মুহূর্তে অনুশোচনায় ভ'রে গেলো।

'আসছি, আবুয়েলা,' সে বললে। 'আমি জল ঠাণ্ডা করছি।'

সে-রাত্তিরে সে শুয়ে-শুয়ে অনেক রাত অব্দি ভাবলে—আর ওপাশে সেই সোনার গেঞ্জি গায়ে ঠাকুমা ঘুমের ঘোরে তাঁর গান গেয়েই চললেন। নিজের বিছানা থেকে এরেন্দিরা তীব্র চোখে তাকালে, ছায়ার মধ্যে তার চোখ দুটিকে দেখালো যেন কোনো বিড়ালির চোখ। তারপর, যেন কেউ জলের তলায় ডুবে গিয়েছে এমনভাবে সে ফিরে গেলো নিজের বিছানায়, বুকের ওপর তার হাত দুটি, চোখ দুটি ডাগর খোলা, আর সে তার যত জোর আছে সব দিয়ে মনে-মনে চেঁচিয়ে ডাকলে :

'উলিসেস!'

আচমকা নারঞ্জবিতানের বাড়িতে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো উলিসেস। এরেন্দিরার গলা সে এতই স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে যে ঘরের ছায়ায় তার চোখ এরেন্দিরাকে খুঁজে-খুঁজে বেড়ালো। এক ঝলক ভেবে নিয়ে, সে তার জুতো জামা-কাপড় একটা পুঁটুলিতে বেঁধে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সে যখন পাড়িও পেরিয়ে গিয়েছে তখন তার বাবার গলা তাকে চমকে দিলে :

'কোথায় যাচ্ছিস তুই ?'

চাঁদের আলোয় উলিসেস তাকে দেখলো নীল।

'পৃথিবীতে,' সে উত্তর দিলে।

'এবার আর আমি তোকে বাধা দেবো না,' ওলন্দাজ বললেন। 'তবে একটা বিষয়ে আমি তোকে হুঁশিয়ার ক'রে দিচ্ছি: তুই যেখানেই যাবি তোর বাবার অভিশাপও যাবে তোর পেছন-পেছন।'

'তা-ই হোক তবে,' বললে উলিসেস।

একটু অবাক, এমনকী ছেলের প্রতিজ্ঞা দেখে একটু গর্বিতও, ওলন্দাজ তার পেছন-পেছন এলেন বাগানকুঞ্জের মধ্যে দিয়ে, আস্তে-আস্তে তাঁর চোখে ফুটে উঠছে মৃদু হাসি। তাঁর স্ত্রী তাঁর পেছনেই ছিলেন, ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকরা যেমন দাঁড়ায় তেমনি অপরূপভাবে। যখন উলিসেস ফটক বন্ধ ক'রে দিলে, ওলন্দাজ কথা বললেন :

'ও ফিরে আসবে,' বললেন তিনি, 'জীবনের মার খেয়ে ও ফিরে আসবে—তুমি যা ভাবছো তার চেয়েও তাড়াতাড়ি।'

'তুমি একটা পাগল,' উলিসেসের মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'ও আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না।'

সেখানে উলিসেসকে কাউকেই জিগেশ করতে হয়নি যে এরেন্দিরা কোথায়। একটা চলন্তি ট্রাকে লুকিয়ে চেপে উঠে সে পেরিয়ে এলো মরুভূমি, খাওয়া-দাওয়ার জন্যে চুরি করলে সে, অনেকবারই চুরি করলে নিছক ঝুঁকি নেবার বিশুদ্ধ মজা আর উত্তেজনাটা পাবে ব'লে, আর চলতেই থাকলো যতক্ষণ-না সে সমুদ্রতীরে আরেকটা শহরে খুঁজে পেলে তাঁবুটা, সে-শহরের কাচের বাড়িগুলো একটা আলোয় সাজা শহরের রূপ নিয়েছিলো, যেখানে ডুকরে-ডুকরে ওঠে আরুবা দ্বীপের উদ্দেশে বেরিয়ে-পড়া নোঙর-তোলা জাহাজগুলোর নৈশ ভোঁ। খাটিয়ার ডাণ্ডার সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা, এরেন্দিরা ঘুমিয়ে ছিলো, সেই একই ভঙ্গিতে, যেমন বেলাভূমিতে পাওয়া যায় জলে-ডোবা কোনো লোকের মৃতদেহ, যে-ভঙ্গিতে শুয়ে থেকে সে ডেকে পাঠিয়েছিলো উলিসেসকে ; অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে, তাকে না-জাগিয়ে, তার দিকে তাকিয়ে রইলো উলিসেস, কিন্তু সে তার দিকে এমন তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো যে এরেন্দিরা জেগে গেলো। তারপর তারা চুমু খেলে অন্ধকারে, আস্তে সোহাগ করলে পরস্পরকে, ক্লান্তভাবে পোশাক খুললো এক-এক ক'রে, আর নীরব মমতায় আর গোপন সুখে মগ্ন হ'লো রতি ও আরতিতে, যেটা ছিলো প্রণয়ের চেয়েও বেশি-কিছু।

তাঁবুর অন্ধ কোণায় ঠাকুমা একটা প্রকাণ্ড পাশ ফিরলেন আর প্রলাপ বকতে শুরু করলেন।

'গ্রীক জাহাজ এসে যখন পৌঁছেছিলো, এটা তখনকার কথা,' বললেন ঠাকুমা। 'খালাশিরা সব বদ্ধ পাগল—অথচ তারা মেয়েদের সুখে ভরিয়ে দিতো, কিন্তু পয়সার বদলে তাদের দিতো জলের জীব, স্পঞ্জ, জ্যান্ত-সব স্পঞ্জ, যেগুলো পরে বাড়িঘরে হেঁটে বেড়াতো হাসপাতালের রোগীদের মতো উহু-উহু কাৎরে আর যাতে তারা নোনা জলে পিপাসা মেটাতে পারে সেইজন্তে কাঁদিয়ে দিতো বাচ্চাদের।'

পাতালের একটা নড়াচড়ার ভঙ্গি ক'রে তিনি ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসলেন।

'সেই সময়েই সে এসে পৌঁছেছিলো, আমার দেবতা,' তিনি গাঁক-গাঁক করলেন, 'আরো বলিষ্ঠ, আরো দীর্ঘাকৃতি, আমাদিসের চাইতেও আরো-অনেকবেশি পুরুষ।'

উলিসেস—সে এর আগে এই প্রলাপের দিকে কখনোই মন দেয়নি—ঠাকুমাকে বিছানায় উঠে বসতে দেখে লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করলে। কিন্তু এরেন্দিরা তাকে শান্ত করলে।

তাকে বললে: 'ভয় পেয়ো না। যখনই উনি কাহনের এই জায়গায় এসে পড়েন তখনই উনি ধড়মড় ক'রে উঠে বসেন বিছানায়—কিন্তু উনি জাগেন না।'

উলিসেস তার কাঁধে হেলান দিলে।

'সে-রাত্তিরে আমি খালাশিদের সঙ্গে গান গাইছিলাম আর প্রথমে ভেবেছিলাম এ বুঝি কোনো ভূমিকম্প,' ঠাকুমা তোড়ে ব'লে চললেন। 'ওরাও সবাই নিশ্চয়ই তা-ই ভেবেছিলো কারণ তারা, হেসে খুন, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো, আর শুধু সে-ই ছিলো সেই তারার গানের চাঁদোয়ার তলায়। যেন কালকের ঘটনা, এমনিভাবে সব মনে পড়ে আমার, তখন সকলেই যে-গান গাইতো সেই গানই গাইছিলাম আমি। এমনকী উঠোনের তোতাগুলো অব্দি সেই গান গাইতো।'

মাছের মতো চ্যাপটা, যেমন লোকে শুধু স্বপ্নেই গায়, তিনি গেয়ে উঠলেন তাঁর তিক্ততার গান:

দাও হে, প্রভু, দাও, ফিরিয়ে দাও ফের
আমার নিষ্পাপ যা ছিলো, সব—
যাতে আবার আমি তার সোহাগসুখই
প্রথম থেকে করি পুনরুদ্ভব।

শুধু তখনই উলিসেস ঠাকুমার পিছুটানে আগ্রহ আর কৌতূহল বোধ করলে।

'ঐ তো ওখানে ছিলো সে,' ঠাকুমা ব'লেই চলছিলেন, 'কাঁধে একটা ম্যাকাও, লম্বা ল্যাজের টিয়া, আর মানুষখেকো-মারা গাদাবন্দুক, ঠিক যেভাবে অ্যাতোয়ারাল এসে পৌঁছেছিলো গিয়ানায়, আর যখন সে এসে আমার সামনে দাঁড়ালে আমি তার মারণনিশ্বাস গায়ে পেলাম, সে বললে : "হাজার বার আমি সারা জগৎ চক্কর দিয়েছি, সব দেশের মেয়েই চেখে দেখেছি আমি, কাজেই বিষয়টা ভালো জানি ব'লেই আমি তোমায় বলতে পারি, তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে গরবিনী, সবচেয়ে রূপাবতী, পৃথিবীর সবচেয়ে রূপসী মেয়ে।"

আবার শুয়ে পড়লেন ঠাকুমা, বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। উলিসেস আর এরেন্দিরা অ নে ক ক্ষ ণ চুপ ক'রে রইলো, প্রকাণ্ড ঘুমন্ত বুড়ার বড়ো-বড়ো শ্বাসপ্রশ্বাসের ছায়ার মধ্যে দোল খেতে-খেতে। হঠাৎ এরেন্দিরা, তার গলায় একটুও কাঁপন নেই, বললে :

'ওঁকে খুন করতে তোমার সাহস হবে ?'

আচমকা প্রশ্নটা শুনে উলিসেস ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না কী উত্তর দেবে।

'কে জানে,' সে বললে। 'তোমার সাহস হয় ?'

'আমি পারিনি,' এরেন্দিরা বললে, 'উনি আমার ঠাকুমা।'

তখন উলিসেস আবার সেই প্রকাণ্ড ঘুমন্ত দেহটার দিকে তাকালে, যেন মনে-মনে খতিয়ে নিচ্ছে জীবনের কী তেজ আছে তাঁর এখনও, তারপর মনস্থির ক'রে বললে :

'তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি।'

...

পাঁচশো গ্রাম ইঁদুরমারা বিষ কিনে আনলে উলিসেস ; জায়ফলের মোরব্বা আর ফেনানো ক্ষীরের সঙ্গে তা খুব ক'রে ঘেঁটে মিশিয়ে সেই ক্ষীর সে একটা পিঠের মধ্যে ঢেলে দিলে—তা থেকে সে আগেই ভেতরের পুরটা চেঁছে সরিয়ে দিয়েছিলো। তারপর সে ওপরে রাখলে আরো-এক পরত ঘন ক্ষীর, চামচে বুলিয়ে-বুলিয়ে সেটা এমন মসৃণ ক'রে ফেললে যে এই পৈশাচিক কুৎকলাপের কোনো চিহ্নই আর রইলো না, আর কাজটা সে সম্পূর্ণ করলে তার ওপর বাহাত্তরটা খুদে-খুদে গোলাপি মোমবাতি বসিয়ে।

ঠাকুমা তাঁর সিংহাসনে ব'সে নোটগুলো অবহেলাভাবে গুনে তুলে নাড়-ছিলেন, এমন সময় দেখতে পেলেন তারা তাঁর জন্মদিনের কেকটা নিয়ে তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকছে।

'ওরে বেহায়া শয়তান!' তেড়ে উঠলেন ঠাকুমা। 'তোর কী সাহস যে তুই এখানে পা দিস!'

উলিসেস তার দেবদূত মুখের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

'আমি ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছি,' সে বললে, 'আজকের এই দিনে, আপনার এই জন্মদিনে।'

এই ডাহা মিথ্যাটায় নিরস্ত্র হ'য়ে—কেননা কথাটা লক্ষ্যভেদ করেছিলো—ঠাকুমা টেবিলটা এমনভাবে সাজাতে বললেন যেন এটা কোনো বিয়ের ভোজ। উলিসেসকে তিনি তাঁর ডান পাশে বসালেন, আর এরেন্দিরা তাদের পাতে খাবার পরিবেশন করলে, আর এক বিধ্বংসী ফুঁয়ে একসঙ্গে সব মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে, কেকটা তিনি দুই সমান অংশে কেটে ভাগ করলেন, আর একটা টুকরো দিলেন উলিসেসকে।

'যে-পুরুষ জানে কেমন ক'রে ক্ষমা পেতে হয় সে তো অর্ধেক স্বর্গ জিতেই ফেলেছে,' ঠাকুমার বাণী। 'তোমাকেই আমি প্রথম টুকরোটা দিলাম—সেটাই আসলে পরম সুখের ভাগ।'

'আমার মিষ্টি ভালো লাগে না,' উলিসেস বললে, 'আপনিই খান।'

ঠাকুমা এরেন্দিরাকেও কেকের একটা টুকরো দিতে চাইলেন। সে সেটা নিয়ে রান্নাঘরে চ'লে গেলো, আর সেটা আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

বাকি সবটা একাই খেলেন ঠাকুমা। একেকটা আস্ত টুকরো মুখে পুরছেন, চিবোনো-টিবোনোর কোনো বালাই নেই, কপ ক'রে গিলে ফেলছেন, আহ্লাদে মুখ দিয়ে অস্ফুট উম্‌ম্‌ম্‌ আওয়াজ বেরুচ্ছে, আর তাঁর উপভোগের শিখর থেকে কেবলই তাকাচ্ছেন উলিসেসের দিকে। যখন তাঁর নিজের রেকাবিটা চেটেপুটে সাবাড় করা হ'য়ে গেলো তখন উলিসেস যে-চাকটা খেতে চায়নি সেটাও তিনি খেয়ে ফেললেন। শেষ চাকটা চিবুতে-চিবুতে টেবিলঢাকা থেকে গুঁড়োগুলো তুলে নিলেন, তারপর সেগুলোও মুখে পুরে দিলেন।

ইঁদুরদের একটা আস্ত প্রজন্মই খতম হ'য়ে যেতো, এতটাই সেঁকোবিষ খেয়েছেন ঠাকুমা। অথচ তবু তিনি পিয়ানো বাজিয়ে মাঝরাত অব্দি গান গাইলেন, আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে গেলেন বিছানায়, আর এমনকী স্বাভাবিকভাবেই ঘুমিয়ে পড়লেন। যেটা শুধু নতুন হ'লো সেটা তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস—তাতে পাওয়া গেলো পাথরের ওপর কিছু-একটা আঁচড়ানোর আওয়াজ।

এরেন্দিরা আর উলিসেস অন্য বিছানাটা থেকে তাঁর ওপর নজর রাখছিলো,

অপেক্ষা ক'রে ছিলো কখন ওঠে বুড়ার ঝকঝক। কিন্তু ঘুমের ঘোরে রোজকার মতো তিনি যখন প্রলাপ বকতে শুরু করলেন, গলাটা শোনালো আগের মতোই সজীব, সতেজ।

'আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম, ঈশ্বর, আমি একেবারেই পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম!' গাঁক-গাঁক করলেন ঠাকুমা। 'সে যাতে ভেতরে আসতে না-পারে সেজন্যে দু-দুটো হুড়কো লাগিয়ে দিয়েছিলাম আমার শোবার ঘরের দরজায়, দরজার গায়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম টেবিল, সাজচৌকি, ঘরের সবগুলো চেয়ার, আর সে কিনা তার হাতের আংটি দিয়ে শুধু একটা টোকা দিলে; আর দরজার সব আয়োজন মুহূর্তে ভেঙেচুরে ছত্রখান। টেবিলের ওপর থেকে চেয়ারগুলো যেন নিজে-নিজেই উল্টে পড়লো, টেবিল আর সাজচৌকি পরস্পরের কাছ থেকে আপনা থেকেই স'রে গেলো, হুড়কোগুলো নিজে থেকেই উঠে গেলো খাঁজ থেকে।'

এরেন্দিরা আর উলিসেস তাজ্জব হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো; যতই প্রলাপ অতি গম্ভীর আর নাটকীয় হ'য়ে উঠলো আর কণ্ঠস্বর হ'য়ে উঠলো আরো-অন্তরঙ্গ, ততই তাদের চোখগুলো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো।

'আমার মনে হ'লো আমি বুঝি ম'রেই যাচ্ছি, ভয়ে একেবারে ঘেমে-নেয়ে অস্থির, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনুনয় করছি দরজাটা যেন না-খুলেই খুলে যায়, সে যেন না-ঢুকেই ভেতরে ঢোকে, সে যেন কখনও চ'লে না-যায় আবার কখনও ফিরেও না-আসে, আমায় যাতে তাকে খুন করতে না-হয়।'

ফিরে-ফিরে তিনি আউড়েই চললেন তাঁর নাটক, কয়েক ঘণ্টা ধ'রে অবিশ্রাম, এমনকী সব অন্তরঙ্গ গোপন খুঁটিনাটিগুলো শুদ্ধু, যেন আবারও ব্যাপারটা সত্যি-সত্যি ঘ'টে যাচ্ছে তাঁর স্বপ্নে। ভোরের একটু আগে বিছানায় তিনি পাক খেয়ে গড়িয়ে গেলেন ভূকম্পনতরঙ্গের মতো মন্থর ও সাবলীল আর গলাটা ভেঙে গেলো বোবা কান্নার আবির্ভাবে।

'তাকে আমি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলাম কিন্তু সে তা হেসেই উড়িয়ে দিলে,' চীৎকার ক'রে উঠলেন ঠাকুমা। 'আবারও তাকে সাবধান করলাম আমি আর আবারও সে হেসে উঠলো, যতক্ষণ-না সে চোখ খুললো আতঙ্কে, এই ব'লে: "উঃ রানী! উঃ রানী!" আর তার কথাগুলো তার মুখ দিয়ে আর বেরুচ্ছিলো না, বরং বেরুচ্ছিলো তার গলায় ছুরিটা যেখানে পোঁচ দিয়ে কেটেছে সেখান দিয়ে।'

ঠাকুমার ভয়াবহ আহুত স্মৃতিচারণ শুনে উলিসেস আঁৎকে উঠে এরেন্দিরার হাত চেপে ধরলে।

'খুনে বুড়ি!' আর্ত চেঁচিয়ে উঠলো সে।

এরেন্দিরা তাকে কোনো পাত্তাই দিচ্ছিলো না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে ভোরের আলো ফুটতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো। ঘড়ি ঘণ্টা বাজালো পাঁচটা।

'যাও!' এরেন্দিরা বললে, 'এখুনি উনি জেগে উঠবেন।'

'একটা হাতির চেয়েও কড়া জান ওঁর,' আর্ত ও বিস্মিত উলিসেস বললে, 'এ হ'তেই পারে না!'

এরেন্দিরা ছুরির ধারের মতো চোখে তাকালে তার দিকে, তার বাক্‌রোধ ক'রে দিলে।

বললে: 'পুরো গণ্ডগোলটা হ'লো এই যে তোমার কাউকে খুন করারও মুরোদ নেই!'

এই তিরস্কারের রূঢ় স্থূলতায় উলিসেস এতটাই ঘা খেলে যে সে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। গোপন তার ঘৃণা নিয়ে এরেন্দিরা নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলো তার ঘুমন্ত ঠাকুমার দিকে, হতাশা থেকেই প্রচণ্ড আক্রোশ জেগে উঠেছে তার মধ্যে, আর সূর্য উঠলো আর পাখি জাগলো আর হাওয়া ছুটলো। তারপরেই ঠাকুমা তাঁর চোখ খুলে শান্ত হেসে তার দিকে তাকালেন।

'ভগবান তোর সঙ্গে থাকুন, বাছা।'

একমাত্র লক্ষণীয় বদল হ'লো দৈনিক কার্যক্রমের তুলকালাম বিশৃঙ্খলা। দিনটা ছিলো বুধবার, কিন্তু ঠাকুমা চাইলেন গায়ে চাপাবেন রবিবাসরীয় পোশাক, ঠিক করলেন বেলা এগারোটার আগে এরেন্দিরা কোনো মক্কেলকেই তোয়াজ বা আপ্যায়ন করবে না, আর তাকে বললেন তাঁর নখ তামড়ির রঙে রাঙিয়ে দিতে আর মস্ত জমকালো খোঁপা ক'রে তাঁর চুল বেঁধে দিতে।

'এর আগে কখনোই আমার ছবি তোলবার জন্যে এত সাধ হয়নি,' বিস্মিত সুরে ব'লে উঠলেন ঠাকুমা।

এরেন্দিরা তার ঠাকুমার চুল আঁচড়াতে শুরু করলে, কিন্তু যেই সে চুলের মধ্যে চিরুনি চালিয়েছে চিরুনির দাঁতের ফাঁকে-ফাঁকে গোছা-গোছা চুল উঠে এলো। আঁৎকে উঠে সে ঠাকুমাকে তা দেখালে। ঠাকুমা সেটা খুঁটিয়ে দেখলেন, আঙুল দিয়ে টান দিলেন আরেকটা গোছা, আর চুলের আরেকটা ঝোপ তাঁর হাতে উঠে এলো। সেটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে তিনি আবার চুল ধ'রে টান দিলেন, আরো-একটা লম্বা গোছা উঠে এলো। তারপর তিনি দু-হাত দিয়ে তাঁর চুল টানতে শুরু ক'রে দিলেন; হেসেই খুন ঠাকুমা; মুঠো-মুঠো চুল ছুঁড়ে দিচ্ছেন হাওয়ায় কেমন

এক অবোধ উল্লাসে, যতক্ষণ-না তাঁর মাথাটা দেখালো ছোবড়া ছাড়ানো নারকোলের মালার মতো।

দু-ঘণ্টা কেটে যাবার আগে উলিসেসের আর-কোনো পাত্তাই পেলে না এরেন্দিরা, তারপরেই হঠাৎ সে শুনতে পেলে তাঁবুর বাইরে প্যাঁচা ডেকে উঠলো। ঠাকুমা তখন পিয়ানো বাজাতে শুরু করেছেন আর তাঁর স্মৃতির ভেতর এতটাই তলিয়ে গেছেন যে বাস্তবের কোনো বোধই তাঁর ছিলো না। তাঁর মাথায় রংচঙে পালকের একটা পরচুল।

এরেন্দিরা পাঁচার ডাকে সাড়া দিলে আর তখনই সে খেয়াল করলে পিয়ানো থেকে বেরিয়ে-আসা সলতেটা—সেটা ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। সে ছুটে চ'লে গেলো সেখানে যেখানে উলিসেস লুকিয়ে আছে ঝোপের মধ্যে, গিয়েই সে লুকিয়ে পড়লো তার পাশে, আর বুকে কেমন-একটা আঁটো ভাব অনুভব ক'রে তারা দুজনে লক্ষ করলে ছোট্ট নীল শিখাটি কেমন ক'রে সলতে বেয়ে-বেয়ে বুকে হেঁটে যাচ্ছে, পেরিয়ে যাচ্ছে কালো অন্ধকার জমি, ঢুকে পড়ছে তাঁবুর মধ্যে।

'কানে হাত চাপা দাও,' বললে উলিসেস।

দুজনেই কান ঢাকলে, যদিও কোনো দরকারই ছিলো না, কারণ সেখানে কোনোই বাদুম-বুদুম-দুম হ'লো না। শুধু তাঁবুর ভেতরটা আলো হ'য়ে উঠলো, ঝকঝকে এক দীপ্তি, বিস্ফুরণ, স্তব্ধতায় ফেটে পড়লো, আর উধাও হ'য়ে গেলো রেণু-রেণু ভেজা জিনিশের ঘূর্ণিহাওয়ায়। ঠাকুমা এখন মারা গেছেন এই কথা ভেবে অবশেষে যখন এরেন্দিরা ভেতরে ঢোকবার সাহস পেলে সে গিয়ে দেখলো তাঁকে, পরচুলটা পোড়া, তাঁর রাতকাপড় ছিঁড়ে ফালি-ফালি, চিলতে, কিন্তু তিনি নিজে আগের চাইতেও আরো জ্যান্ত, একটা কম্বল চাপা দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছেন।

উলিসেস পিছলে বেরিয়ে গেলো ইণ্ডিয়ানদের চীৎকার শোরগোলের আড়াল দিয়ে। ইণ্ডিয়ানরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না কী করা উচিত, আরো ঘাবড়ে যাচ্ছিলো ঠাকুমার উলটোপালটা হুকুমে। যখন তারা শেষটায় শিখাগুলোকে জব্দ ক'রে নিতে পারলে, আর তাড়িয়ে দিলে ধোঁয়া, তারা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলে সেখানে যেন প'ড়ে আছে একটা ভাঙাচোরা জাহাজ।

'এ-সবই অমঙ্গলটার কাজ', ঠাকুমা বললেন। 'পিয়ানো কখনো এমনভাবে ফেটে পড়ে না।'

নতুন তাণ্ডবটার কারণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ঠাকুমা একের পর এক ব্যাপারে

অনুমান ক'রে গেলেন, কিন্তু এরেন্দিরার ব্যাপারটা এড়িয়ে-যাওয়া কিংবা তার অধিকার ভঙ্গি শেষটায় তাঁকে কেমন ধাঁধায় ফেলে দিলে। তাঁর দাংশিক্ষ ব্যবহারে কোনো চিহ্ন কোনো ফাটল তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন না, উলিসেসের অস্তিত্বটাও তিনি বিবেচনা ক'রে দেখলেন না। ভোর অব্দি তিনি জেগে রইলেন, হাড়গুলো জোড়া দেবার চেষ্টা ক'রে-ক'রে আর লোকসানের বহরটা আন্দাজ করতে-করতে খুব কমই ঘুমুলেন তিনি, তাও সে-ঘুম হ'লো ছেঁড়া-ছেঁড়া। পরদিন সকালে এরেন্দিরা তার ঠাকুমার সোনার চাক্তিবসানো গেঞ্জিটা খুলে নিলে, দেখতে পেলে তাঁর ঘাড়ের কাছে ফোসকা-ফোসকা, স্তনের ওপর বেরিয়ে আছে কাঁচা মাংস। 'ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরবার ভালো কারণ ছিলো,' এরেন্দিরা যখন তাঁর পোড়ায় ডিমের শাদা মাখাচ্ছে, তিনি বললেন। 'আর তাছাড়া তারি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি আমি।' গভীর মনোনিবেশ ক'রে স্বপ্নের ছবিটাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন ঠাকুমা, আর অবশেষে ছবিটা তাঁর স্মৃতিতে স্বপ্নের মতোই স্পষ্ট আর প্রাঞ্জল হ'য়ে এলো।

'শাদা দোলখাটিয়ায় একটা ময়ূর,' তিনি বললেন।

এরেন্দিরা শুনে অবাক হ'য়ে গেলো, কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখে প'রে নিলে প্রতিদিনের অভিব্যক্তি।

'এটা একটা সুলক্ষণ,' মিথ্যে বললে সে। 'স্বপ্নের ময়ূররা হ'লো দীর্ঘস্থায়ী সব প্রাণী।'

'ভগবান যেন তোর কথাই শোনেন,' ঠাকুমা বললেন, 'কারণ আবার আমরা ফিরে এসেছি প্রথম খোপটায়, যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। আবার সব নতুন ক'রে শুরু করতে হবে আমাদের।'

এরেন্দিরা তার মুখের ভাব পালটালে না। সেঁক দেবার পুঁটুলিগুলো একটা রেকাবিতে নিয়ে সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলো; তার ঠাকুমা ব'সেই রইলেন, ধড়টা ডিমের শাদায় ভেজানো, আর মাথার খুলিতে সর্ষেবাটা মাখা। রেকাবিতে আরো ডিমের শাদা রাখছিলো এরেন্দিরা। তালগাছের ছায়ায়, যেখানে রসুইঘর, সেখানে ব'সে-ব'সে। এমন সময় হঠাৎ উনুনের আড়ালে সে দেখতে পেলে উলিসেসের চোখ, যেমন সে দেখেছিলো প্রথমবার তার বিছানার পেছনে। এরেন্দিরা চাঁৎকে ওঠেনি, শুধু ক্লান্ত অবসন্ন গলায় তাকে বললে :

'শুধু যেটা করতে পেরেছো সে হ'লো আমার দেনার বহরটা আরো বাড়িয়ে দিয়েছো।'

উদ্বেগে উলিসেসের চোখ মেঘে ঢেকে গেলো। নিশ্চল, চুপচাপ, সে তাকিয়ে রইলো এরেন্দিরার দিকে, দেখলো কেমন ক'রে সে একের পর এক ডিম কাটিয়েই চলেছে পরম ঘৃণায়, যেন উলিসেসের কোনো অস্তিত্বই নেই তার কাছে। মুহূর্ত পরে চোখ দুটি নড়ালে, তাকিয়ে দেখলে রান্নাঘরের জিনিশগুলো, ঝোলানো খালনকোশন, খুঁটিতে বাঁধা মশলা, মাংস কাটার ছুরি। উলিসেস উঠে দাঁড়ালে, এখনও সে কিছু বলছে না, আস্তে ঢুকলো সে তালপাতার ছাউনির তলায়, তারপর ছুরিটা হাতে তুলে নিলে।

এরেন্দিরা তার দিকে আর তাকায়নি, কিন্তু উলিসেস যখন ছাউনি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে তাকে খুব নিচু গলায় বললে :

'সাবধান থেকো, কারণ এর মধ্যেই উনি একবার মৃত্যুর হুঁশিয়ারি পেয়েছেন। শাদা দোলখাটিয়ায় একটা ময়ূরের স্বপ্ন দেখেছেন উনি।'

ঠাকুমা দেখলেন ছুরি হাতে উলিসেস ঘরে এসে ঢুকলো, আর একটা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে তাঁর সেই দোর্দণ্ডের সাহায্য ছাড়াই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর দু-হাত তুললেন শূন্যে।

'ছেলে!' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। 'তোর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে?'

উলিসেস তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিলে তাঁর নগ্ন বুকে। ঠাকুমা কাৎরে উঠলেন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর, তাঁর সবল ভালুক হাতে তার গলা টিপে মারবার চেষ্টা করলেন।

'কুত্তির বাচ্চা!' গরগর ক'রে উঠলেন ঠাকুমা। 'বড্ড দেরি ক'রে আবিষ্কার করলাম তোর মুখটা আসলে বেইমান দেবদূতের মতো!'

আর-কিছু বলতে পারলেন না ঠাকুমা, কারণ উলিসেস তখন কোনোরকমে ছুরিটা টেনে বার ক'রে নিয়েছে, এবার সে ছুরিটা ঢোকালে পাশ থেকে। ঠাকুমার মুখ থেকে গোপন এক গোঙানি বেরিয়ে এলো, হানাদারকে তিনি আরো জোরে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলেন। উলিসেস ছুরিটা হানলে তৃতীয়বার, দয়াবিহীন, আর রক্তের একটা দমকা, উঁচু চাপে ছাড়া পেয়ে, ফোয়ারার মতো ছিটকে পড়লো তার মুখে : তেলতেলে রক্তের ফোয়ারা, জলজলে, সবুজ, যেন তা পুদিনার মধু।

এরেন্দিরা দেখা দিলে দরজায়, তার হাতে রেকাবি, আর যুদ্ধটা সে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলে কোনো অপরাধীর ভাবলেশহীন মুখে।

বিশাল, যেন কোনো একশিলা, ব্যথায় আক্রোশে গর্জন করছেন, ঠাকুমা পাকড়ে ধরলেন উলিসেসের শরীর। তাঁর বাহু, তাঁর পা, এমনকী তাঁর নির্কেশ মাথা রক্তে

সবুজ হ'য়ে গিয়েছে। তাঁর প্রকাণ্ড হাপরের মতো শ্বাসপ্রশ্বাস, মৃত্যুর প্রবল ধড়ফড়ানি, কেমন যেন ছন্দহারানো, সারা জায়গাটা ভর্তি ক'রে দিচ্ছে। হাতিয়ার সমেত হাতটা কোনোরকমে আরো-একবার ছাড়িয়ে নিয়ে এলো উলিসেস, খুলে দিলে তাঁর পেটের মধ্যে একটা চির, আর রক্তের এক দমকা বিস্ফোরণ তাকে ভিজিয়ে সবুজ ক'রে দিলে, মাথা থেকে পায়ের পাতা অব্দি। ঠাকুমা চেষ্টা করলেন খোলা হাওয়ায় পৌঁছুতে, হাওয়া চাই এখন, হাওয়া, বাঁচতে হ'লে হাওয়া চাই, আর মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেলেন। উলিসেস নিস্প্রাণ বাহুপাশ ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলো, আর এক মুহূর্তও না-থেমে প্রকাণ্ড প'ড়ে-থাকা শরীরটায় শেষবার বসিয়ে দিলে ছুরি।

এরেন্দিরা তখন রেকাবিটা নামিয়ে রাখলে টেবিলে, ঝুঁকে পড়লো তার ঠাকুমার ওপর, তাঁকে স্পর্শ না-ক'রেই সব খুঁটিয়ে দেখলে। যখন সে নিঃসংশয় হ'লো যে তিনি মারা গেছেন, তার মুখ হঠাৎ অর্জন ক'রে বসলো কোনো বয়স্কের পাকা ভাব যেটা তার কুড়ি বছরের দুর্ভাগ্যও অ্যাদ্দিন তাকে দিতে পারেনি। ক্ষিপ্র, নিখুঁত, মুঠোয় হাতে সে সোনার গেঞ্জিটা পাকড়ে ধরলো, তারপর তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

উলিসেস বসেছিলো মৃতদেহের পাশে, যুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত, আর যতই সে তার মুখ পরিষ্কার করার চেষ্টা করলে ততই তার মুখ চটচটে সবুজ অ্যাস্ত পদার্থে ভ'রে গেলো—মনে হচ্ছে যেন তার আঙুল থেকেই তা গলগল ক'রে বেরিয়ে আসছে। যখন সে দেখতে পেলে এরেন্দিরা সোনার গেঞ্জি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে শুধু তখনই সে নিজের দশা সম্বন্ধে সম্বিৎ ফিরে পেলে।

সে চেঁচিয়ে ডাকলে এরেন্দিরাকে, কিন্তু কোনো সাড়া পেলে না। সে নিজেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলো তাঁবুর মুখে, আর দেখতে পেলে এরেন্দিরা শহর থেকে দূরে সমুদ্রতীর ধ'রে ছুটতে শুরু ক'রে দিয়েছে। তখন সে একটা শেষ চেষ্টা করলে তার পেছনে ধাওয়া ক'রে যাবার, বারে-বারে চেঁচিয়ে ডাকলে তাকে ব্যথাতুর ধরা গলায় যেটা এখন আর কোনো প্রেমিকের গলা নয়, বরং যেন কোনো ছেলের গলা, কারু সাহায্য ছাড়াই কোনো স্ত্রীলোককে খুন ক'রে সে যেন একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে। ঠাকুমার ইন্ডিয়ানরা যখন তার নাগাল পেলে সে তখন বেলাভূমিতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে, আর হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে আতঙ্কে আর নিঃসঙ্গতায়।

এরেন্দিরা তাকে শুনতেই পায়নি। সে ছুটে যাচ্ছে হাওয়ায়, কোনো হরিণের

ফিরেও পিছে, আর জগতের কোনো কণ্ঠস্বরই তাকে থামাতে পারতো না। একবারও মাথা না-ঘুরিয়েই, সে পেরিয়ে গেলো সোনার খনি, বাড়ুর পাতের আলাদুপ, ঝুপড়ি-আটচালাগুলোর জবড়জং, যতক্ষণ-না শেষ হ'লো মনুষ্যের প্রকৃতিবিকার আর শুরু হ'লো মরুভূমি। তবু কিন্তু সে ছুটেই চললো সোনার ঘোড়াটা নিয়ে উষর হাওয়ার পরপারে, আর কখনও-শেষ-না-হওয়া সূর্যাস্তগুলো পেরিয়ে। তার কথা আর-কোনোদিনই শোনা যায়নি অথবা পাওয়া যায়নি তার দুর্ভাগ্যের সামান্যতম চিহ্নও।

১৯৭২

মৃত্যুই ধ্রুব প্রণয়ের পরপারে

মৃত্যুর মুখোমুখি হবার যখন ছ-মাস এগারো দিন বাকি তখনই সেনাদোর ওনেসিমো সান্‌চেস খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনের নারীকে। তার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো সুহকের প্রায় রোসাল দেল ভিররেইতে, অলীক যে-গ্রামটি রাত্তিরে হ'য়ে ওঠে চোরাচালানিদের জাহাজ ভেড়াবার ঘাট, আর অন্যদিকে, প্রকাণ্ড দিবালোকে যাকে দেখায় নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় কোনো খাঁড়ির মতো, পথ ভুল ক'রে যেটা মরুভূমিতে ঢুকে পড়েছে, এমন-এক সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যেটা ঊষর, দিকহারা, সবকিছু থেকেই এত দূরে যে ভুলেও কেউ সন্দেহই করতে পারতো না যে কারু ভাগ্যকে বদ্‌লে-দেবার ক্ষমতা রাখে এমন-কেউ সেখানে থাকে। এমনকী তার নামটাও যেন একটা মস্করা, কারণ গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র যে-গোলাপটি আছে সেটা পরেছিলেন সেনাদোর ওনেসিমো সান্‌চেসই স্বয়ং, সেই একই বিকেলে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো লরা ফারিনার।

প্রতি চার বছর পর-পর তাঁকে যে নির্বাচনী প্রচার-অভিযানে বেরুতে হয়, তাতে এই গ্রামে থামাটা অপরিহার্যই। কার্নিভালের টানাগাড়িগুলো এসে পৌঁছেছে সকালবেলায়। তারপর এসেছে ভাড়া-করা ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে ট্রাক-গুলো, সরকারি কোনো অনুষ্ঠানে চিরকাল তাদের শহরগুলোয় নিয়ে-যাওয়া হয় ভিড় বাড়াতে। বেলা এগারোটার একটু আগে, অনুচরদের গান-বাজনা হাউই-পটকা আর জিপগাড়িগুলোর সঙ্গে, মন্ত্রীমহোদয়ের ধনুকমণি সোডার রঙের মোটর-গাড়ি এসে পৌঁছেছে। সেনাদোর ওনেসিমো সান্‌চেস তাঁর বাতানুকূলিত গাড়ির ভেতরে এতক্ষণ ছিলেন অবিচল আর আবহাওয়াবিহীন, অথচ যেই তিনি গাড়ির দরজা খুললেন আগুনের একটা হলকা তাঁকে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে গেলো, আর তাঁর খাঁটি রেশমি জামাটা হালকারঙের কোনো সুরুয়ায় ভিজে সপসপে হ'য়ে উঠলো, নিজেকে তাঁর হঠাৎ বয়েসের তুলনায় বড্ড বুড়ো লাগলো, আর ভারি একা লাগলো তাঁর, আগের চাইতেও একা। বাস্তব জীবনে তিনি সবে পা দিয়েছেন বিয়াল্লিশে, গয়টিনগেন থেকে ধাতুবিৎ এনজিনিয়ার হিশেবে সাম্মানিক সহ স্নাতক হয়েছেন; গোগ্রাসে তিনি বই পড়েন, যদিও খুব-একটা লাভ হয় না তাতে, পড়েন

তিনি খুব বাজে তর্জমা-করা ধ্রুপদী সব লাতিন বই। এক ঝলমলে আলেমান মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে, যিনি তাঁকে দিয়েছেন পাঁচটি সন্তান, আর তারা সবাই সুখেই আছে বাড়িতে; তিনি নিজেই ছিলেন সবচাইতে সুখী যতক্ষণ-না তিনমাস আগে তারা তাঁকে বললে যে আগামী বড়োদিনের মধ্যেই চিরকালের মতো তাঁর ইহলোকের লীলা ঘুচবে।

জনসভার জন্যে যাবতীয় প্রস্তুতি যখন সারা হচ্ছে, তাঁর বিশ্রামের জন্যে তারা যে-বাড়িটা বরাদ্দ করেছিলো সেনাদোর সেখানে ঘণ্টাখানেক একা থাকবার সুযোগটা বাগিয়ে নিয়েছেন। শুয়ে-পড়ার আগে খাবার জলের গেলাশটায় তিনি গোলাপটা ডুবিয়ে দিলেন, গোটা মরুভূমিতেই এটাকে তিনি বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন, যে-পথ্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসছেন তাতেই সেরেছেন দুপুরের খাওয়া যাতে দিনের বাকি সময়ে তাঁর জন্যে অনবরত ও পুনরাবৃত্ত পাঁঠার মাংসের ভাজা-ভুজি অপেক্ষা ক'রে আছে সেটা এড়িয়ে যেতে পারেন। কয়েকটা ব্যথাকমানো বড়িও গিলে ফেললেন তিনি, ব্যবস্থাপত্রে যে-সময়ে খেতে বলা হয়েছে তার আগেই, যাতে ব্যথাটা চাগিয়ে ওঠবার আগেই সেটাকে তিনি ঠেকাতে পারেন। তারপর তিনি দোলখাটিয়ার কাছে টেনে নিয়ে এলেন বিজলি পাখাটা, গোলাপের ছায়ায় মিনিট পনেরো শুয়ে রইলেন বিবস্ত্র, ঢুলতে-ঢুলতে প্রচণ্ড চেষ্টা করলেন মনকে অন্য খাতে বওয়াতে যাতে মৃত্যুর কথা তাঁকে ভাবতে না-হয়। ডাক্তাররা ছাড়া, আর-কেউই জানে না যে রায় বেরিয়ে গিয়েছে তাঁর, নিদিষ্ট একটা সময়ই শুধু তিনি বাঁচবেন, কারণ তিনি ঠিক ক'রে নিয়েছেন তাঁর এই গুপ্তকথা তিনি একাই সহ্য করবেন, কোনো বদল ঘটাবেন না জীবনযাপনে, সেটা কিন্তু অহমিকাবশত নয়, বরং মৃত্যুকে তাঁর মনে হচ্ছিলো একটা ডাহা কেলেঙ্কারি।

বেলা তিনটেয় যখন আবার তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হলেন, তাঁর মনে হ'লো সবকিছুই এখন তাঁর আয়ত্তে : বিশ্রাম হয়েছে, পরিচ্ছন্ন, রুক্ষ তাফতায় তৈরি স্ল্যাকস আর ফুল-কাটা জামা গায়ে, আর ব্যথাকমানো বড়ির দৌলতে তাঁর মেজাজটাও শরীফ। তৎসত্ত্বেও, তিনি যা ভেবেছিলেন তিল-তিল এই মরণ তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর; কারণ যখন তিনি মঞ্চে উঠছেন, তখন যারা তাঁর সঙ্গে করমর্দন করবার সৌভাগ্যের জন্যে নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করছিলো তাদের জন্যে এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণা তিনি অনুভব করলেন। খালি-পা ইণ্ডিয়ানরা প্রায় সইতেই পারে না উষর বন্ধ্যা ছোট্ট স্কোয়ারের তপ্ত শোরার কয়লা; অন্যসময়ে তাদের দেখে তাঁর করুণাই হ'তো, কিন্তু এখন বরং উলটোটাই হ'লো। হাত নেড়ে তিনি হাততালির

ধবকাটা থামিয়ে দিলেন, প্রায় যেন তেড়েফুঁড়েই, কষ্ট, আর কোনো মুদ্রা ব্যবহার না-ক'রেই তিনি কথা বলতে শুরু ক'রে দিলেন, দৃষ্টি নিবদ্ধ সমুদ্রের ওপর—যে-সমুদ্র গরমে এখন হাঁসফাঁস করছে। তাঁর ভাষা, গভীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন অতল জলেরই ছোঁয়াচ, কিন্তু যে-ভাষণটি তিনি মুখস্থ করেছেন আর গমপেষাইয়ের মতো জাঁতা থেকে একবার বার ক'রে দিয়েছেন যে তাঁর কাছে মনেই হ'লো না সে-ভাষণে কোনো সত্য কথা বলবার ধরন আছে, বরং তা যেন মার্কাস অরেলিয়াসের 'ধ্যানপুথি'র চতুর্থ খণ্ডের নিয়তিবাদী উচ্চারণের উলটোটাই ব'লে মনে হ'লো।

'আমরা এখানে আছি প্রকৃতিকে হার মানাবো ব'লে,' তাঁর সমস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই তিনি শুরু করলেন। 'আমাদের নিজেদের দেশে আমরা আর কুড়িয়ে-পাওয়া অনাথ হ'য়ে থাকবো না, পিপাসা আর বিকট জলবায়ুর মহালে ঈশ্বর-পরিত্যক্ত হ'য়ে থাকবো না আমরা, আর থাকবো না নিজ বাসভূমে পরবাসী। সেনিওরা ও সেনিওরগণ, আমরা একেবারে অন্য মানুষ হ'য়ে উঠবো—মহান এবং সুখী জনগণ হ'য়ে উঠবো আমরা।'

তাঁর এই সার্কাসের পেছনে একটা ছক একটা নকশা আছে। যখন তিনি কথা বলছেন, তাঁর অনুচরেরা হাওয়ায় ছুঁড়ে দিলে ঝাঁকে-ঝাঁকে কাগজের পাখি আর এই নকল পাখিরা হাওয়ায় প্রাণ পেয়ে গেলো, তক্তা বসিয়ে তৈরি-করা মঞ্চের ওপর ঘুরে বেড়ালো এলোমেলো, তারপর উড়ে চ'লে গেলো সমুদ্রে। ঠিক তখন, অন্য অনুচরেরা ঠেলাগাড়িগুলোর মধ্য থেকে নিয়ে এলো শোলার পাতা লাগানো কত-গুলো খুঁটি, নাটমঞ্চের গাছ, আর ভিড়ের পেছনে শোরার জমিতে সেগুলো তারা পুঁতে দিলে। কাচের জানলা বসানো লাল ইটের বাড়ির ভাণ—কার্ডবোর্ডে তৈরি তার সদর—বসিয়ে দিয়ে শেষ করলে ভোজবাজি, আর এই বাড়িগুলো দিয়ে তারা ঢেকে দিলে সত্যিকার, ভাঙাচোরা, ঝুপড়ি আর আটচালাগুলো।

সেনাদোর তাঁর ভাষণ বিলম্বিত করলেন লাতিন থেকে দুটি উক্তি দিয়ে যাতে প্রহসনটায় আরো সময় কাটে। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন বৃষ্টি তৈরির কারখানা, খাবারটেবিলের প্রাণীদের জন্যে সহজে-বহনীয় বংশবর্ধক, সুখবিলাসের স্নেহপদার্থ যা শোরার জমিতে ফলাবে শাকসব্জি, আর জানলায়-জানলায় বাক্সভর্তি সব বেগনি ফুল। যখন তিনি দেখলেন তাঁর কাল্পনিক জগৎ বসানো হ'য়ে গেছে, তিনি আঙুল তুলে সেটা দেখালেন। 'সেনিওরা ও সেনিওরগণ, এইরকমই হবে সবকিছু আমাদের জন্যে।' চেঁচিয়ে বললেন: 'দেখুন! এইরকমই হবে সব—আমাদের জন্যে।'

শ্রোতারা ফিরে তাকালে। রং-করা কাগজে বানানো বড়ো একটা সমুদ্রগামী জাহাজ বাড়িগুলোর পেছন দিয়ে ভেসে চলেছে, সেই নকল নগরীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ির চাইতেও সেটা উঁচু। সেনাদোর শুধু নিজেই খেয়াল করলেন যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বারে-বারে নিয়ে-যাওয়া এই লজ্‌ঝড় শহরের ওপর চাপানো কার্ডবোর্ডের শহরটাকে উৎকট ও ভয়ংকর জলবায়ু এর মধ্যেই খেয়ে ফেলেছে, এটা এখন রোসাল দেল ভিরেইয়ের মতোই গরিব, বেচারি, ধুলিমলিন ও হতশ্রী।

বারো বছরের মধ্যে এই প্রথমবার, নেলসন ফারিনা সেনাদোরকে অভ্যর্থনা করতে যায়নি। রুক্ষ, পালিশ না-করা, কাঠে তৈরি বাড়ির ছায়ায়—যে-বাড়িটা সে তৈরি করেছে সেই একই ভেষজবিদের হাতে, যে-হাত দিয়ে টেনে নিয়ে সে তার প্রথমা স্ত্রীকে কুচি-কুচি ক'রে কেটেছিলো—তার দিবানিদ্রার ভগ্নাবশেষের মধ্যে তার দোলখাটিয়া থেকেই সে বক্তৃতাটা শুনছিলো। ডেভিলস আইল্যাণ্ড [যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর] থেকে পালিয়ে এসে সরল সব ব্যাকাওতে ভরা এক জাহাজে ক'রে সে আবির্ভূত হয়েছিলো রোসাল দেল্ ভিরেইয়ে, সঙ্গে ছিলো পরমা রূপসী ও খিস্তি-খেউড়ে মহাওস্তাদ এক কালো মেয়ে, যাকে সে আবিষ্কার করেছিলো পারামারিবোতে, আর যার মারফৎ সে জন্ম দিয়েছে এক মেয়ের। কিছুদিন বাদেই সেই সুন্দরী কৃষ্ণা স্বাভাবিক কারণেই মারা যায়—অন্য স্ত্রীর কপালে যা ছিলো সেই দুর্ভোগ তাকে আর সইতে হয়নি—সেই যার কুচি-কুচি টুকরো দিয়ে সে তার ফুল-কপি ফলানোর জমিতে সার দিয়েছিলো, বরং তার ওলন্দাজ নাম সমেত স্থানীয় গোরস্থানে এই দ্বিতীয়া স্ত্রীকে কবর দেয়া হয়েছিলো সর্বাঙ্গসুষ্ঠাম। মেয়েটি উত্তরা-ধিকার পেয়েছে শ্যামলা রং আর তার দেহসৌষ্ঠব, সঙ্গে পেয়েছে বাবার অবাক-অবাক হলুদ চোখ, আর নেলসন ফারিনার এ-কথা ভাববার সংগত কারণই আছে যে সে জগতের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে বড়ো ক'রে তুলছে।

যেদিন থেকে সেনাদোর ওনেসিমো সানচেসের সঙ্গে তাঁর প্রথম নির্বাচনী সফরে তার আলাপ হয়েছে সেদিন থেকেই নেলসন ফারিনা তাঁকে অনুনয় ক'রে চলেছে তার জন্যে একটা নকল পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা ক'রে দিতে, যা তাকে আইনের খপ্পর থেকে বাঁচাবে। সেনাদোর খুবই বন্ধুভাবে কিন্তু দৃঢ় স্বরে প্রস্তাবটা নাকচ ক'রে দিয়েছেন। নেলসন ফারিনা কিন্তু কখনোই হাল ছেড়ে দেয়নি, গত কয়েক বছর ধ'রে যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই, ততবারই, ভিন্ন কোনো ছুতোয় বা ওজরে ফিরে অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু এবারে সে প'ড়ে রইলো দোলখাটিয়ায়, ক্যারি-বিয়ানের বোম্বেটেদের সেই জলন্ত আড্ডায় জ্যান্ত ঝলসে মরবার জন্যে দণ্ডিত।

যখন সে শেষ হাততালি শুনতে পেলে, সে তার মাথা তুললো, বেড়ার কাঠগুলোর ওপর দিয়ে তাকিয়ে সে দেখতে পেলে রূপকটার, প্রহসনটার, পশ্চাদ্দেশ : বাড়িঘরের ঠেকনো, গাছগুলোর কাঠামো, গোপন মায়াবীরা—সমুদ্রগামী জাহাজটাকে যারা ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ঢং দেখে সে কোনো বিদ্বেষ ছাড়াই শব্দ ক'রে থুতু ফেললে।

'মের্দ,' সে বললে, 'সে ল্য গ্রাকাবেন দ লা পোলিতিক।' (যাঃ কলা, এ যে স্রেফ রাজনীতির গ্রাকাবান।')

ভাষণের পর, দস্তুর অনুযায়ী, সেনাদোর শহরের রাস্তাগুলো দিয়ে হেঁটে গেলেন গানবাজনা আর পটকা ও হাউইয়ের মধ্য দিয়ে, শহরের লোকেরা তাঁকে চারপাশ থেকে আক্রমণ ক'রে কেবলই তাঁকে তাদের দুঃখের কাহন কাঁদুনি গেয়ে শোনালে। সেনাদোর সদাশয়ভাবেই তাদের সব কথা শুনলেন, আর এ-রকম সময়ে চিরকালই তাদের কোনো দুরূহ দাক্ষিণ্য দেখাবার ভড়ং ছাড়াই তিনি গেয়ে যান সবাইকে সান্ত্বনা জানাবার বাঁধা গৎ। এক স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিলো তার বাড়ির ছাতে তার ছোটো ছজন ছেলেমেয়ে সমেত, আর সব কোলাহল আর বাজিপটকার মধ্যেও সে চেঁচিয়ে নিজের কথা শোনাতে পারলে।

'আমি বেশি-কিছু চাচ্ছি না, সেনাদোর,' সে বললে। 'শুধু একটা গাধা চাই—ফাঁসি-যাওয়ার কুয়ো থেকে জল আনবার জন্যে।'

ছ-ছজন রোগা টিংটিঙে ছেলেমেয়েকে তাকিয়ে দেখলেন সেনাদোর। 'তোমার মরদের কী হ'লো?' সেনাদোর জানতে চাইলেন।

'সে তার কপাল ফেরাতে গেছে আরুবা দ্বীপে,' স্ত্রীলোকটি খোশমেজাজেই জবাব দিলে। 'আর গিয়ে যা পেয়েছে সে হ'লো এক ভিনদেশী মাগি—সেই তাদেরই একজন যারা তাদের দাঁতেও হিরে বসায়।'

উত্তরটা একটা হাসির হর্‌রা তুললো।

'ঠিক আছে,' সেনাদোর ঠিক ক'রে ফেললেন। 'তুমি তোমার গাধা পেয়ে যাবে।'

একটু পরেই তাঁর এক অনুচর সেই স্ত্রীলোকের বাড়িতে একটা ভালোজাতের মালবওয়া গাধা নিয়ে এসে হাজির হ'লো আর মোছা-যায়-না এমন রঙে তার পাছায় লিখে দেওয়া হ'লো চুনাওয়ের একটা জিগির, যাতে কেউ কখনও না-ভোলে যে এটা স্বয়ং সেনাদোরেরই একটি উপহার।

রাস্তার ছোট্ট প্রসার ধ'রে তিনি এইরকম আরো অন্য ছোটোখাটো বদান্যতা

দেখালেন। একজন রক্ষী সবাইকে ধ'রে তার বিছানাটা নিয়ে এসেছিলো দরজার কাছে যাতে সেনাদোর রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সে তাঁকে চর্মচক্ষে দেখতে পারে—সেনাদোর এমনকী তার মুখে এক দাগ ওষুধও ঢেলে দিলেন। শেষ মোড়টায়, বেড়ার কাঠগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখলেন মেলসন ফারিনা শুয়ে আছে তার দোল-খাটিয়ায়, কী-রকম মনখারাপ আর ছাইধূসর দেখাচ্ছে তাকে, তবু সেনাদোর তাকে সম্ভাষণ জানালেন—ভাব-ভালোবাসার কোনো আদিখ্যেতা না-ক'রেই অবশ্য।

'এই-যে, কেমন?'

মেলসন ফারিনা তার দোলখাটিয়ায় পাশ ফিরে তার দুঃখের করুণ অম্বরে তাঁকে ভিজিয়ে দিলে।

'মোয়া, ভু সাভে (আমি, আপনি তো জানেনই),' সে বললে।

সম্ভাষণ শুনে তার মেয়ে বেরিয়ে এলো উঠোনে। সে পরেছিলো শস্তা রং-চটা গুয়াহিরো ইণ্ডিয়ান আংরাখা, রঙিন ফিতে দিয়ে বাঁধা তার মাথার চুল, রোদ্দুরের হাত থেকে মুখটিকে বাঁচাবার জন্তে তাতে ছিলো রং মাখা; তবু এমনকী, সেই বেহেরামতি দশাতেও এটা কল্পনা করা সম্ভব ছিলো যে সারা জগতে আর-কেউ অত সুন্দরী নয়। সেনাদোরের প্রায় দম আটকে গেলো। 'গোল্লায় যাবো আমি!' বিশ্বাসের ফাঁকে তিনি ফিশফিশ করলেন। 'প্রভু যে কত তাজ্জব ব্যাপারই ঘটান!'

সে-রাত্তিরে মেলসন ফারিনা তার মেয়েকে সাজালে তার সেরা পোশাকে, তারপর তাকে সেনাদোরের কাছে পাঠিয়ে দিলে। রাইফেলে সশস্ত্র দুই পাহারাওলা ধার-করা বাড়িটার গরমে ঢুলছিলো, তারা তাকে সেনাদোরের ঘরের পাশে একমাত্র চৌকিটায় বসতে হুকুম করলে।

পাশের ঘরে সেনাদোর তখন রোসাল দেল্ ভিররেইয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে ব'সে সভা করছেন: তাঁর বক্তৃতা থেকে যে-সব সত্য তিনি ছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন সেগুলোই গেয়ে শোনাবেন ব'লে তাদের তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মরুভূমির অন্যান্ত শহরে যে-ধরনের লোকের সঙ্গে তাঁর মোলাকাৎ হয়েছে, এদেরও সবাইকেই তাদের মতো এতই একরকম দেখতে যে সেনাদোরের নিজেরই এই চিরন্তন নৈশ আলোচনা সভা অসহ্য ও বিরক্তিকর ঠেকছিলো। তাঁর জামা ঘামে ভিজে গপগপ করছে, এক বিজলি পাখার গরম হাওয়ার হলকায় গায়েই তিনি জামাটা শুকোবার চেষ্টা করছেন—পাখাটা ঘরের ভারি গরমে ঘোড়ার নাদির ওপর নীল মাছির মতো গুঞ্জন করছে।

'বাহুল্য বলা যে আমরা কাগজের পাখি খেতে পারি না,' সেনাদোর বলছিলেন। 'আপনারা আর আমি, আমরা সবাই জানি যেদিন এই ছাগলের নাদির গাদায় গাছ গজাবে আর ফুল ফুটবে, যেদিন জলের গর্তগুলোয় কিলবিলে পোকার বদলে ইলিশমাছ পাওয়া যাবে, সেদিন আপনার আমার আর-কিছুই করার থাকবে না এখানে। কী? আমি স্পষ্ট বোঝাতে পারছি তো কথাটা?'

কেউ কোনো উত্তর দিলে না। কথা বলতে-বলতে সেনাদোর ক্যালেণ্ডার থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়েছিলেন, তা থেকে নিজের হাতেই তিনি বানিয়ে নিচ্ছিলেন এক কাগজে প্রজাপতি। প্রজাপতিটাকে বিশেষ কোনোদিকে তাগ না-ক'রেই তিনি শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন, আর পাখার হাওয়ায় প্রজাপতিটা ফরফর ক'রে এলোমেলো উড়ে বেড়ালো ঘরে, তারপর আধখোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো। মৃত্যুর সঙ্গে যোগসাজশ হ'লে সবকিছুর ওপর যেমন দখল জন্মায়, তেমনি ভঙ্গিতেই সেনাদোর কথা ব'লে চললেন।

'সেইজন্যেই,' বললেন সেনাদোর, 'আপনাদের কাছে আমাকে নিশ্চয়ই ফিরে বলতে হবে না যে আপনারা সবকিছুই খুব ভালো জানেন: আমার পুনর্নির্বাচন আমার কাছে যতটা, আপনাদের কাছে সেটা তার চেয়েও বেশি লাভের ব্যাবসা —কারণ আমি এইসব বদ্ধ ডোবা আর ইণ্ডিয়ান ঘামে একেবারেই অসহ্য বোধ করছি—অথচ আপনারা, অন্যদিকে, তার ওপর নির্ভর ক'রেই টাকা কামাচ্ছেন, আখের গুছোচ্ছেন।'

লরা ফারিনা কাগজের প্রজাপতিটাকে উড়ে আসতে দেখলো। শুধু সে-ই তাকে দেখতে পেলো, কেননা এ-ঘরের শাস্ত্রীরা সিঁড়ির ওপর তাদের রাইফেলগুলো জড়িয়ে ধ'রে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। কয়েকবার ফরফর ক'রে ঘুরে, রঙিন ছাপানো প্রজাপতিটা পুরো ডানা খুলে, দেয়ালের গায়ে পুরোপুরি লেপটে বসলো —আর সেখানেই আটকে রইলো। লরা ফারিনা তার নোখ দিয়ে সেটাকে উপড়ে তোলবার চেষ্টা করলে। পাহারোলাদের একজন, পাশের ঘরে হাততালির শব্দ শুনে সে জেগে গিয়েছে, তার ব্যর্থ চেষ্টাটা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলে।

'ও আর উঠবে না,' ঘুম-ঘুম গলায় সে বললে, 'ও তো দেয়ালে এঁকে দেয়া।'

লরা ফারিনা আবার তার চৌকিতে বসতে-না-বসতেই লোকজন সব সভা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করলে। সেনাদোর দরজায় দাঁড়িয়ে, হাতটা খিলের ওপর; পাশের ঘরটা যখন একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেলো, শুধু তখনই তিনি খেয়াল করলেন লরা ফারিনাকে।

'তুমি এখানে কী করছো?'

'জ্য ন পার্ল পা ফ্রঁসে (এটা আমার বাবার কাণ্ড),' সে বললে।

সেনাদোর বুঝতে পারলেন। পাহারোলাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি, খুঁটিয়ে দেখলেন লরা ফারিনাকে—আপাদমস্তক ; তাঁর সব ব্যথাবেদনার চাইতেও এই মেয়েটির অসাধারণ সৌন্দর্য যেন আরো নাছোড় দাবি জানাচ্ছে, আর তখনই তিনি ঠিক ক'রে ফেললেন যে তিনি নন বরং মৃত্যুই তাঁর হ'য়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

'এসো, ভেতরে,' তিনি বললেন তাকে।

ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে লরা ফারিনা একেবারে অভিভূত হ'য়ে গেলো। হাজার-হাজার ব্যাঙ্কনোট পৎপৎ উড়ছে হাওয়ায়, তারা যেন পাখা নাড়ছে প্রজাপতিটার মতোই, কিন্তু সেনাদোর বোতাম টিপে পাখা বন্ধ ক'রে দিতেই নোটগুলি হাওয়া খুইয়ে ঝরঝর ক'রে ঘরের নানান জিনিশের ওপর এসে পড়লো।

'দেখলে তো,' তিনি বললেন, মুচকি হেসে। 'এমনকী গুও উড়তে পারে।'

লরা ফারিনা স্কুলের ছেলেদের একটা চৌকির ওপর ধপ ক'রে ব'সে পড়লো। টান-টান ও মসৃণচিক্কণ তার গায়ের চামড়া ; খনির তেলের মতো রং টলটল করছে, যেন তেমনি সৌর ঘনত্বে ভরপুর ; তার মাথার চুল যেন কোনো তরুণ ঘোটকীর কেশরের মতো ; আর ডাগর চোখগুলো আলোর চাইতেও উজ্জ্বল। সেনাদোর তার দৃষ্টির সুতো অনুসরণ ক'রে অবশেষে গোলাপটিকে দেখতে পেলেন, নোনা সেটায় এখন দাগ ধরিয়ে দিয়েছে।

'এটা একটা গোলাপ,' সেনাদোর বললেন।

'হ্যাঁ, জানি,' কেমন-একটু হতভম্বভাবেই বললে লরা ফারিনা। 'রিওআচায় থাকতেই জেনেছিলাম এগুলো কী ফুল।'

সেনাদোর একটি ফৌজি খাটিয়ায় ব'সে পড়লেন, জামার বোতাম খুলতে-খুলতে তিনি গোলাপ নিয়েই কথা ব'লে চললেন। তাঁর বুকের যেদিকটায় হৃৎপিণ্ড আছে ব'লে তিনি কল্পনা করেছিলেন, সেখানে—নৌবহরের জাহাজের কাপ্তেনদের বুকে যেমন উল্কি থাকে, তেমনি—একটা উল্কি দাগা : একটা হরতন এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে একটা তীর চ'লে গিয়েছে। তাঁর ভেজা জামাটা মেঝের ছুঁড়ে ফেলে তিনি লরা ফারিনাকে বললেন তাঁর বুটজোড়া খুলতে সাহায্য করতে।

খাটিয়ার মুখোমুখি নতজানু হ'য়ে বসলো লরা ফারিনা। সেনাদোর, চিন্তিত-ভাবে, তাকে খুঁটিয়ে দেখেই চলেছেন, আর সে যখন জুতোর ফিতে খুলছে, তিনি

মনে-মনে অনুমান করবার চেষ্টা করলেন এই দেখা-হওয়াটায় দুজনের মধ্যে কে-সে তিমি খেয়ে পড়বে দুর্ভাগ্যে।

'একেবারেই কচি মেয়ে তুমি,' তিনি বললেন।

'সেটা কিন্তু বিশ্বাস করবেন না,' সে বললে, 'এই এপ্রিলে আমি উনিশে পা দেবো।'

সেনাদোর হঠাৎ খুব কৌতূহলী হ'য়ে উঠলেন।

'কত তারিখে?'

'এগারো,' সে বললে।

সেনাদোর একটু ভালো বোধ করলেন। 'আমাদের দুজনেরই মেষরাশি,' তিনি বললেন। তারপর একটু হেসে যোগ করলেন:

'সেটা কিন্তু নিঃসঙ্গতার চিহ্ন।'

লরা ফারিনা এ-সব কথায় কোনো মনোযোগ দিচ্ছিলো না, কারণ সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না এই বুটজোড়া নিয়ে সে কী করবে। সেনাদোর আবার, তাঁর দিক থেকে, বুঝতে পারছিলেন না লরা ফারিনাকে নিয়ে তিনি কী করবেন, কারণ তিনি কোনোদিনই আকস্মিক প্রেমে-ট্রেমে অভ্যস্ত নন, তাছাড়া তিনি জানেন নাগালের মধ্যে যে-মেয়েটি আছে তার জন্ম হয়েছিলো কলঙ্কে। ভাববেন ব'লে একটু সময় ক'রে নেবার জন্যে, তিনি লরা ফারিনাকে দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরলেন, জড়িয়ে ধরলেন তার কোমর, তারপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লেন তক্তপোশে। আর তখনই তিনি টের পেলেন তার পোশাকের তলায় মেয়েটি একেবারে নগ্ন, কারণ তার শরীর থেকে বনের কোনো জন্তুর মতো অন্ধকার ঝাঁজ বেরিয়ে আসছে—তবে তার হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠছে ভয়ে, আর গায়ের চামড়া এক হিমজমাট ঘামে ঘাবড়ে গিয়েছে।

'কেউ আমাদের ভালোবাসে না,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেনাদোর।

লরা ফারিনা কী যেন বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু শুধু শ্বাস নেবার মতোই হাওয়া পেলে সে সেখানে। তাকে একটু সাহায্য করবার জন্যে তাকে তিনি তাঁর পাশে শোয়ালেন, নিভিয়ে দিলেন আলো, আর ঘরটা গোলাপের ছায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো। খুব ধীরে-ধীরে তাকে সোহাগ করলেন সেনাদোর, খুঁজলেন তাকে তাঁর আদর ভরা হাত দিয়ে, প্রায় যেন তাকে না-ছুঁয়েই, কিন্তু যেখানে তিনি তাকে খুঁজে পাবেন ব'লে ভেবেছিলেন, সেখানে লোহার-তৈরি কী-একটা তাঁর সন্ধানী হাতকে আটকে দিলে।

'ওখানে তোমার ওটা কী ?'

'কুলুপ,' সে বললে, 'একটা তালা।'

'এ আবার কোন জাহান্নাম!' কিন্তু সেনাদোর ব'লে উঠলেন, আর যা তিনি খুব ভালো ক'রেই বুঝতে পেরেছেন, সেই বিষয়টাই জিগেশ করলেন। 'চাবি কই' ?

লরা ফারিনা একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লে।

'চাবিটা বাবার কাছে,' সে উত্তর দিলে। 'বাবা বললেন আপনার কোনো লোক পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে আসতে, আর সেই সঙ্গে একটা লিখিত প্রতিশ্রুতি পাঠাতে যে আপনি তাঁর ঝামেলাগুলো মিটিয়ে দেবেন।'

টান-টান হ'য়ে গেলেন সেনাদোর। 'ফরাশি বেজন্মা, ব্যাঙের বাচ্চা!' ঘৃণায় আর রাগে বিড়বিড় করলেন তিনি। তারপর তিনি টান-টান ভাবটা কাটাবার জন্যে চোখ বুজলেন আর অন্ধকারে দেখা পেলেন নিজেরই। মনে রেখো, আর তিনি মনে ক'রে নিলেন, সে তুমিই হও বা অন্য-কেউই হোক, খুব বেশিদিন কাটবে না—তুমি ম'রে যাবে, আর বেশিদিন কাটার আগে তোমার নামটার অব্দি কোনো চিহ্ন থাকবে না।

শিহরনটা কেটে যাবার জন্যে তিনি সবুর করলেন।

'আচ্ছা,' তিনি তখন জিগেশ করলেন, 'আমায় তুমি একটা কথা বলো। আমার সম্বন্ধে তুমি কী শুনেছো ?'

'আপনি কি সত্যি-সত্যি জানতে চান ? ভগবানের নামে হলফ ?'

'ভগবানের নামে হলফ—সত্যি কথা বলবে।'

'বেশ, বলছি,' লরা ফারিনা সাহস ক'রে এগুলো, 'ওরা বলে, আপনি অন্য সবার চেয়েও অধম, কারণ আপনি আলাদা ধরনের মানুষ।'

সেনাদোর চ'টে গেলেন না। অনেকক্ষণ, চোখ বুজে, তিনি চুপ ক'রে রইলেন।

যখন তিনি আবার চোখ খুললেন, মনে হ'লো তিনি যেন তাঁর সব চাইতে গোপন প্রবৃত্তিগুলো থেকে ফিরে এসেছেন।

'ধুৎ, সে আর-কোন জাহান্নামের চাইতে বেশি হবে ?' তক্ষুনি তিনি মনস্থির ক'রে নিলেন, 'তোমার ঐ কুত্তির বাচ্চা বাপটাকে বোলো আমি তার ঝামেলাগুলো মিটিয়ে দেবো।'

'আপনি যদি চান তো আমি নিজেই গিয়ে চাবিটা নিয়ে আসতে পারি,' লরা ফারিনা বললে।

সেনাদোর তাকে আটকালেন।

'চাবি গোল্লায় যাক,' তিনি বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে একটু ঘুরোও। যখন তুমি অত একা তখন কেউ-একজন সঙ্গে থাকলেই ভালো।'

তখন লরা ফারিনা তার মাথা রাখলে তাঁর কাঁধে, তার চোখ দুটো আটকে আছে গোলাপের ওপর। সেনাদোর তার কোমর জড়িয়ে রইলেন, মুখ গুঁজলেন তার বনের-অন্তর বগলে, আর নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন আতঙ্কের কাছে। ছ-মাস এগারো দিন পরে, ঠিক ঐ ভঙ্গিতেই তিনি মারা যাবেন—লরা ফারিনাকে জড়িয়ে যে-কেচ্ছাটা রটবে তার জন্যে কাদায় লেপা আর পরিত্যক্ত, আর মারা যাবেন লরা ফারিনাকে ছাড়াই মরতে হচ্ছে ব'লে প্রচণ্ড আক্রোশে কাঁদতে-কাঁদতে।

১৯৭০

অলৌকিকের ফিরিওলা সাধু ব্লাকামান

প্রথম যে-রোববারটায় তাকে আমি দেখি আমার অমনি মনে হ'য়ে গিয়েছিলো এ যেন ষাঁড়ের লড়াইয়ের রিঙে কোনো-এক খচ্চর : সোনালি সুতো দিয়ে উলটো ফোঁড়ে সেলাই-করা তার সাদা সেলিস, তার প্রতিটি আঙুলে রঙিন পাথর বসানো আংটি, বিনুনির মতো পাকানো রেশমি সুতোগুলো থেকে ঝুলছে ঝুনঝুন ঘুন্টি, দাঁড়িয়ে আছে সান্তা মারিয়া দেল দারিয়েনের জাহাজঘাটায় একটা চৌকির ওপর, চৌকির চারপাশে ছড়ানো রাশি-রাশি বোতলভর্তি টোটকা আর সান্ত্বনার জড়িবুটি যে-সব তার নিজেরই উদ্ভাবন, যা সে ফিরি ক'রে বেরিয়েছে ক্যারিবিয়নের শহরে-শহরে, বেদম চিল্লিয়েছে তার জখম গলায়, তবে একটাই তফাৎ ছিলো সে-বারে, সে ঐসব ইণ্ডিয়ান প্যাবাবের কিছুই বিক্রি করতে চাচ্ছিলো না, বরং বলছিলো তার কাছে সত্যিকার এক জ্যান্ত সাপ নিয়ে আসতে, যাতে সে সকলের চোখের সামনে হাতে-নাতেই দেখিয়ে দিতে পারে — হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিজের গায়েই ছোবল খেয়ে — বিষ ঝাড়বার যে-প্রতিষেধক সে বার করেছে, একমাত্র মোক্ষম দাওয়াই, একমাত্র অব্যর্থ ওষুধ, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, সাপ, মহানাগ, তারানতুলা, শতপদী পুচ্ছকণ্টককে তো বটেই, আরো যত-সব বিষাক্ত প্রাণী আছে, তাদেরও বিষ ঝেড়ে দেবার উপায়। তার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখে একজন এতই বিমোহিত হ'য়ে পড়েছিলো যে সে কোথেকে একটা বোতলে ক'রে সবচেয়ে বজ্জাত একটা ঝোপরাজ সাপ (শ্বাসনালী বিষিয়ে তুলে মোক্ষম মারে যে-সাপ) নিয়ে এসে হাজির, আর অমনি এমনই সাগ্রহে সে বোতলের ছিপিটা খুললো যে আমরা সবাই ভেবেছিলাম সে বুঝি ওটাকে চিবিয়েই খেয়ে ফেলবে, কিন্তু যেই-না ঐ ঝোপরাজ টের পেলো যে সে আর আটকে নেই, লাফিয়ে বেরুলো বোতল থেকে আর ছোবলটা হানলো তার গর্দানে, আর সঙ্গে-সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ, সে দাঁড়িয়ে রইলো হতবাক — বক্তৃতার জন্যে এক-ফোঁটাও দম নেই, আর প্রতিষেধকটা গেলবার জন্যে টায়ে-টোয়ে একটুই মাত্র সময় ছিলো, তার ঝোলার জেব থেকে ওষুধগুলো গড়িয়ে পড়লো ভিড়ের মধ্যে, কেবল গড়াগড়ি খেলে সে মাটিতে, তার বিশাল বপু যেন ফোঁপরা হ'য়ে গেলো, যেন এটা একটা খোসা — ভেতরটায় কিছু নেই, তবু

দমকাটা হাসছিলো সে সারাক্ষণ, তার ঐ সোনার দাঁতগুলো কেলিয়ে। হল্লাটা এমন বেজায় জম্পেশ হ'লো যে উত্তরের যে-ক্রুজারটা সেই জাহাজঘাটায় শুভেচ্ছা-সফরে এসে কুড়ি বছর ধ'রে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়েছিলো, তারা তক্ষুনি ঘোষণা ক'রে দিলে সঙ্গরোধ যাতে ঐ সাপের বিষ জাহাজটায় গিয়ে উঠতে না-পারে, আর যারা তখন গির্জের ঈস্টারের আগের রোববারটায় ভজন গাইছিলো তারা ছুটে বেরিয়ে এলো তাদের জেরুসালেমের তালপাতা হাতে, কেননা কেউ-যে অমনভাবে টেঁসে যাচ্ছে তার ছটফটানির দৃশ্যটা দেখার লোভ কেউই সামলাতে পারেনি, সে এর মধ্যেই খাবি খেতে-খেতে ফুঁয়ে-ফুঁয়ে বার ক'রে দিচ্ছে মৃত্যুর হাওয়া, ফুলে-ফেঁপে আগের চাইতে দুনো নাদুশ হয়েছে সে, মুখ থেকে ছিটোচ্ছে পিত্তভরা ফেনা, আর তার প্রতিটি রোমকূপই যেন হাঁসফাঁস করছে, অথচ এখনও এতখানি কড়া জান নিয়ে দমকে-দমকে হেসেই চলেছে যে ঝুনঝুন ঘুন্টিগুলো তার সারা শরীরেই বেজে উঠছে। ফোলাটা তার পায়ে হাঁটু-অব্দি-ওঠা জুতোর ফিতের বাঁধন খ-স ক'রে ছিঁড়ে ফেললো, ফেটে গেলো তার জামার জোড়গুলোর সেলাই, আংটিগুলোর চাপে তার আঙুলগুলো হ'য়ে উঠলো নীললোহিত, শরীরে ফুটে উঠলো নুনজলে জারানো হরিণের মাংসের রং, আর তার পশ্চাদ্দেশ থেকে একটা সশব্দ ইঙ্গিত এলো মৃত্যুর শেষ মুহূর্তের, সেটা এমনই যে সাপে ছোবলালে কী হয় তা যারা আগে দেখেছে তারা বুঝতে পারলে যে অক্কা পাবার আগেই সে প'চে যাচ্ছে, সে এমনই বেমক্কা ভেঙেচুরে যাবে যে শেষকালে তাদের তাকে বেলচা দিয়ে তুলতে হবে বস্তায়, তবে তারা এও ভাবলো যে তার এই কাঠের গুঁড়োর মতো দশাতেও—ছাখো কেমন—সে বেদম হেসেই চলেছে। এটা এতই উৎকটরকম অবিশ্বাস্য যে নৌবহরের সেপাইরা এসে দাঁড়ালে ডেকের ওপর, দূরায়নী লেন্স দিয়ে তার রঙিন ছবি তুলবে ব'লে, কিন্তু গির্জে থেকে যে-মেয়েরা বেরিয়ে এসেছিলো তারা এদের মৎলবটায় বাধ সাধলে মুমূর্ষুকে তক্ষুনি একটা কম্বলে ঢেকে ফেলে, আর পূত ও পবিত্র তালপাতাগুলো রাখলে তার ওপরে, কেউ-কেউ মোটেই চায়নি নৌসৈন্যেরা তাদের ম্লেচ্ছ যন্তরগুলো দিয়ে কলঙ্কিত করুক তার শরীর, অন্যরা একটু ভয়ই পাচ্ছিলো সেই পৌত্তলিকটির দিকে তাকাতে—হেসে-হেসেই যে খুন হ'য়ে যেতে তৈরি, আর আরো অন্যরা ভেবেছিলো এইভাবে অন্তত তার আত্মাটা বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে না। সবাই যখন সে অক্কা পেয়েছে ব'লে ধ'রে নিয়েছে, তখন সে একহাতে তালপাতাগুলো সরিয়ে, তখনও তার কেমন হতভম্ব ঘোর, ঐ বিষম মুহূর্তটার জের তখনও তার পুরোপুরি কাটেনি, অথচ তবু সে

অন্য-কেউ হাত না-লাগালেও একাই চৌকিটাকে খাড়া ক'রে দিলে, কাকতার মতো তাতে সে বেয়ে উঠলো আবার, আর ফের সে ঐখানে, হেঁকে বলছে তার ঐ প্রতিষেধক আসলে আর-কিছুই না, স্রেফ বোতলভর্তি ভগবানের হাতই, আমরা তো সবাই দেখেছি নিজের চোখেই, তবে এর দাম মাত্র দুই কুয়ার্তিয়ো, কারণ সে বেচে মুনাফা লোটবার জন্যে এটা বানায়নি বরং মানবজাতির মঙ্গলের জন্যেই সে বানিয়েছে, আর সে এই কথা বলবামাত্র, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, আমি চাই না যে আপনারা হুড়োহুড়ি ক'রে ভিড় বাড়িয়ে গ্যাঞ্জাম করুন, কারণ এখানে যত ওষুধ আছে তাতে সকলেরই কুলিয়ে যাবে।

তারা যে ভিড় এবং গ্যাঞ্জাম দুটোই করলে, সে তো বলাই বাহুল্য, আর ক'রে ভালোই করেছিলো, কারণ শেষটায় কিন্তু ঐ গরলনাশায় মোটেই সকলের কুলোয়নি। এমনকী ক্রুজারের ঐ সেনাধ্যক্ষ, অ্যাডমিরাল স্বয়ং, একটা আস্ত বোতল কিনে নিলেন, তার আগে অবশ্য সে তাঁকে বিশ্বাস করিয়েছে যে এতে নৈরাজ্যবাদীদের বিষাক্ত বুলেটেও ফল পাওয়া যাবে, আর নৌসেনারা শুধু চৌকির-ওপর-দাঁড়ানো তার রঙিন ছবি তুলেই পালিয়ে যায়নি, —সে যখন মরেছিলো সে ছবি তো তারা কেউ নিতেই পারেনি—তবে তাকে দিয়ে তারা ছবিগুলোয় এতই স্বাক্ষর করালে যে আর হাতটাই খিল ধ'রে গিয়ে কেমন বেঁকেচুরে গেলো। ওদিকে রাত্তির হ'য়ে আসছে, আর শুধু সবচেয়ে-বোমকে-যাওয়া আমরাই আছি জাহাজঘাটায়, যখন তার চোখ খুঁজে বেড়ালে যেন কাউকে, হয়তো কোনো গাড়লকে, যে এতই হাবাগোবা যে তাকে সে তুকতাকের বোতলগুলো সাজিয়ে রাখতে হাত লাগাবে, আর স্বভাবতই সে আমাকে দেখে ফেললে। এ যেন ভবিতব্যেরই দৃষ্টি, নিছক আমার নয়—তারও, কারণ সে ছিলো তো শতাব্দীরও আগে, আর আমাদের দুজনেরই তা মনে ছিলো, যেন তা ঘটেছে গত রোববারে। হয়েছিলো কী, আমরা যখন তার ঐ সার্কাসের টোটকা ও জড়িবুটি নীললোহিত ফিতে লাগানো তোরঙ্গে ভরছি—সেটাকে মোটেই কোনো হাতুড়ের নয়, বরং কোনো পণ্ডিতের সিন্দুকের মতোই দেখাচ্ছিলো—তখন সে নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কোনো জ্যোতির স্ফুরণ দেখে ফেলেছিলো—সে তো আর আমাকে আগে কখনও ভাখেনি—কারণ সে আমায় কেমন-একটা বিদঘুটে খ্যানখেনে গলায় জিগেশ করলে তুমি কে বট হে, আর আমি উত্তর দিলাম আমি মা-বাপ দু-দিক থেকেই অনাথ, যদিও আমার বাবা অবশ্য তখনও মারা যাননি। সে-কথা শুনে সে এত জোরে এমন হো-হো ক'রে হেসে উঠলো, তেমন হো-হো সে তার শরীরে বিষ ঢোকবার পরেও হাসেনি; তারপর সে আমায় জিগেশ করলে কী

করো যে তুমি, জীবিকা কী, আর আমি বললাম নিছক চিঁকে-থাকা ছাড়া আমি আর-কিছুই করি না, কেননা আর-কিছু করতে গেলেই এত ঝামেলা বাধে যে সে-সব করার কোনোই মানে হয় না, আর হাসির দমকে-দমকে তখনও চোখের জল ফেলতে-ফেলতে সে আমায় জিগেশ করলে পৃথিবীতে তুমি কোন বিজ্ঞানটা সবচেয়ে বেশি ক'রে শিখতে চাও, আর একমাত্র তখনই আমি কোনো পড়িমসি না-ক'রে জবাব দিয়েছিলাম, আমি জ্যোতিষী হ'তে চাই, বলতে চাই লোকের ভবিষ্যৎ, আর সে-কথা শুনে সে আর হাসেনি, তবে আমায় বলেছিলো—যেন সশব্দেই চিন্তা করছে—যে সেজন্যে আমার তবে বেশি-কিছু চাই না, কারণ আমি নাকি এর মধ্যেই এমন জিনিশ শিখে গিয়েছি যা শেখা সবচেয়ে কঠিন, অর্থাৎ আমার আছে হাবা-গোবা মুখ। সেই একই রাত্তিরে সে আমার বাবার সঙ্গে কথা বললে, আর একটা রেয়াল আর দুটি কুয়ারতিইয়ে, আর ব্যভিচার ব'লে দিতে এমন-এক প্যাকেট তাশের বিনিময়ে সে-আমায় সারা জীবনের জন্যে কিনে নিলে।

এইরকমই ছিলো ব্লাকামান, অর্থাৎ যে-ব্লাকামান অসৎ, অসাধু, ফেরেব্বাজ—কেননা আমিই হচ্ছি সাধু ব্লাকামান। সে ইচ্ছে করলে কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানীকেও বুঝিয়ে দিতে পারতো যে ফেব্রুয়ারি মাসটা আসলে অদৃশ্য এক হাতির পাল ছাড়া আর-কিছু নয়, তবে সৌভাগ্য যখন তাকে পেছন দেখালে সে হ'য়ে উঠলো আদ্যোপান্ত এক হৃদয়গভীর জানোয়ার। তার রমরমার দিনে সে বড়োলাটদের মৃতদেহে মলম মাখাতো, আর লোকে বলে সে তাঁদের মুখগুলোকে এমনই রাশভারি কর্তৃত্বের ছাপ দিতো যে মৃত্যুর পরও অনেক বছর ধ'রেই তাঁরা ভালোভাবে শাসনকাজ চালিয়ে যেতেন—বেঁচে থেকে যেমন শাসন করতেন তার চাইতেও নাকি ভালো, আর তখন কেউই তাঁদের গোর দিতে চাইতো না—অন্তত ততক্ষণ নয় যতক্ষণ-না সে তাঁদের মরা মুখগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু তার মানসম্মান ইজ্জৎপ্রতিপত্তি সবই ধুলোয় লুটোলো যখন সে এমন-এক শতরঞ্জ খেলা উদ্ভাবন ক'রে বসলো যার কোনোই শেষ নেই, আর সে-খেলা শেষটায় এক পারিবারিক যাজককে পাগল ক'রে তুললো আর দু-দুটো সুবিখ্যাত আত্মহত্যার কারণ হ'লো, ফলে তার পতন শুরু হ'য়ে গেলো, স্বপ্নের মানে কী বলবার বদলে এখন তাকে গিয়ে লোকের জন্মদিনে সম্মোহন বা বশীকরণ করতে হয়, কেবল ইঙ্গিতেই মাড়ির দাঁত উপড়ে ফেলার বদলে সে হ'য়ে উঠলো হাটবাজারের হাতুড়ে: সেইজন্যেই, আমাদের যখন দেখা হ'লো, লোকে তখনই তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে, এমনকী বোম্বেটেরা অবধি। আমাদের এই ভোজবাজির মকটা নিয়ে আমরা ভেসে বেড়াতে লাগলাম,

আর জীবন হ'য়ে উঠলো নিত্য অনিশ্চয়, বিশেষত আমরা যেহেতু চম্পটবটিকা—ঐ যে বলবারে গৌজবার মতো পাকাবাকার ভেষজ—বিক্রি করতে চাচ্ছিলাম যেটা ব্যবহার করলে চোরাচালানকারীরা স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে, কিংবা বেচতে চাচ্ছিলাম গুপ্ত বটিকা, বাপ্তিস্ম হয়েছে এমন স্ত্রীরা যা তাদের ওলন্দাজ স্বামীদের জন্যে রান্না-করা সুরুয়ায় দিতো যাতে তাদের মধ্যে ভগবানের ভয় জেগে ওঠে; আর স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে, যা-ই আপনারা কিনতে চান না কেন, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, তা-ই কিনতে পারবেন, কারণ এ তো আর অনুশাসন বা অনুজ্ঞা নয়, নিছকই পরামর্শ, তাছাড়া সুখও শেষ অব্দি কোনো বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়। তৎসত্ত্বেও, তার রঙ্গ ও রগড়ে যতই আমরা হেসে খুন হই না কেন, সত্যি কথাটা এই-যে দু-বেলা খাবার জোটানোও আমাদের পক্ষে রীতিমতো কঠিন হ'য়ে পড়েছিলো, অবশেষে তার শেষ ভরসাটা ছিলো আমার ভাবীকথকের বৃত্তি। জাপানির ছদ্মবেশ পরিয়ে সে আমাকে একটা কফিনের মতো তোরঙ্গে আটকে রাখতো, তোরঙ্গটা থাকতো জাহাজের গলুইয়ের ডান দিকের শেকল দিয়ে বাঁধা, যাতে ঐ তোরঙ্গের মধ্য থেকেই আমি ব'লে দিতে পারি ভবিষ্যতে কী ঘটবে, আর এই ফাঁকে সে তন্নতন্ন ক'রে সাবাড় করতো ব্যাকরণপুথি যাতে আমার এই নূতন বিজ্ঞান বিষয়ে জগৎকে সে বিশ্বাস করাবার সেরা কথাগুলো পেয়ে যায়, আর এখানেই, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, জেনে রাখুন আপনার ঐ বাচ্চাকে সারাক্ষণ জ্বালায় এজেকিয়েলের জোনাকিরা, আর ঐ-যে মুখে অবিশ্বাসের হাসি নিয়ে আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন, দেখি-তো আপনাদের এ-কথা জিগেশ করবার সুযোগ কবে হবে কিনা কখন আপনারা মরতে চলেছেন, কিন্তু আমি তো তোরঙ্গের মধ্যে এমনকী এটাও অনুমান করতে পারতাম না সেদিন সেটা কত তারিখ, তাই সে শেষকালে ঠিক করলে আমাকে দিয়ে ঐ ভাবীকথকের কাজটা হবে না, কারণ জোর তোমার ভাবীকথক গ্রন্থিকে জট পাকিয়ে দেয়, আর সৌভাগ্যের জন্যে আমার মাথায় কামড় মেরে, সে ঠিক করলে আমাকে সে আবার আমার বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে টাকাটা ফেরৎ চাইবে। তবে সে-সময়ে সে দৈবাৎ জেনে ফেললে শোকদুঃখের বিদ্যুতের একটা ব্যাবহারিক প্রয়োগ, আর সে একটা সেলাইকল উদ্ভাবন করতে লেগে গেলো—শরীরের যেখানটায় ব্যথাবেদনা সেখানটায় রক্তশোষক কাচ লাগিয়ে তার সঙ্গে হাপরটা জুড়ে দিলেই নাকি কলটা চলবে। যেহেতু আমি রাত কাটাতাম তার জোঁকক মারধোরে কেঁদে-ককিয়ে—সে আমায় পেটাতো এই জন্যেই যাতে দুর্ভাগ্য-কে ঝেড়ে ফেলা যায়, ভূত তাগিয়ে দেয়া যায়—তাই তার আবিষ্কারটায় কোনো

কাজ হচ্ছে কি না সেটা পরখ ক'রে দেখবার জন্যে আমাকেই তাকে রাখতে হ'লো, আর তাই আমাদের ফেরৎ-আসাটা বিলম্বিত হ'য়ে গেলো, আর সেও ক্রমে-ক্রমে ফিরে পাচ্ছিলো তার রঙ-রগড়ের মেজাজ, আর শেষটায় সেলাইকলটা এতই ভালো কাজ করলে যে সে যে কেবল নবীশ সন্ন্যেসিনীদের চাইতেও ভালো সেলাই করতে পারতো তা নয়, কাপড়ের ওপর সে এমনকী পাখি বা আকাশের তারা বুনে দিতে পারতো—বাখাটা ঠিক কোনখানে আর কতটা ঘোরালো ঠিক তারই সঙ্গে তাল রেখে। দুর্ভাগ্যটাকে জিতে গিয়েছি এই বিশ্বাস নিয়ে এ-সবই করছিলাম আমরা, এমন সময় আমাদের কাছে খবর এসে পৌঁছুলো যে কুরাসাওয়ের নৌ-অধ্যক্ষ ঐ প্রতিষেধকটা দিয়ে পরীক্ষাটা ফের নাকি চালাতে গিয়েছিলেন ফিলাডেলফিয়ায়, আর তারপর নাকি তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের সামনেই নৌ-অধ্যক্ষ একদলা মোরব্বায় বদলে গিয়েছেন।

অনেকদিন ধ'রে, তারপর, সে আর হাসেনি। আমরা চোঁ-চাঁ পালিয়ে গেলাম ইণ্ডিয়ানদের যত গিরিসংকট আর নয়ানজুলি দিয়ে, আর যতই আমরা পথ হারাই ততই স্পষ্ট হ'য়ে সঙিন খবরটা এসে পৌঁছোয় আমাদের কাছে: মার্কিন নৌবহর নাকি দেশ থেকে হলদি জ্বর নির্মূল করবার ছুতোয় দেশটাকে আক্রমণ করেছে, আর যারাই বাটি-গেলাশ-কলশি বানায়—সে তারা অনেক কাল ধ'রেই ব্যাবসা চালাক বা ভবিষ্যতে কোনোদিন এই ব্যাবসা আবার চালাতে পারে—তাদের সবাইকার মুণ্ডু উড়িয়ে দিচ্ছে, কাউকে রেহাই দিচ্ছে না রাস্তায়, আর 'সাবধানের মার নেই' ভেবে শুধু যে নেটিভদের গলা কাটছে তা-ই নয়, মনটাকে অন্যখাতে বইয়ে দেবার জন্যে মুণ্ডু ওড়াচ্ছে চিনেদের, অভ্যাসবশেই কোতল করছে কালা আদমিদের, আর হিন্দুদের মারছে এই ব'লে যে তারা নাকি সাপের খেলা দেখায়, তারপর তারা উড়িয়ে দিলে যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী, লোপাট ক'রে দিলে সব খনিজ সম্পদ—যতটা পারলো ততটাই—কারণ আমাদের ব্যাপার-স্যাপারে যারা তাদের বিশেষজ্ঞ তারা তাদের শিখিয়েছে যে নিছক ক্রিওলদের ধ্যানধারণায় জট পাকিয়ে দেবার জন্যেই নাকি ক্যারিবিয়নের লোকজন ভেলকির মতো, রাতারাতি, তাদের স্বভাব বা প্রকৃতি অনায়াসেই বদলে ফেলতে পারে। যতক্ষণ-না লা গুয়াহিরার নিত্য বাতাসের মধ্যে নিরাপদে অটুট গিয়ে পৌঁছুলাম, আমি বুঝতেই পারিনি ঐ খ্যাপা আক্রোশটা ঠিক কোত্থেকে এলো অথবা আমরাই বা ভয়ে এতটা কুঁকড়ে যাচ্ছি কেন, আর শুধু তখনই আমার কাছে সব কথা ফাঁস ক'রে দেবার সাহস পেলে সে, ঐ প্রতিষেধক নাকি রেউচিনিলতা আর তার্পিন তেলের বিশোল ছাড়া আর-কিছুই

না, আর সে নাকি এক বেকার ভবঘুরেকে দুই দুয়ারজিয়ো দিয়েছিলো সব বিষ ঝেড়ে ফেলে একটা বোগরাজকে ধ'রে আনতে। তখন আমরা গিয়ে উঠেছি ঔপনিবেশিক আশ্রয়ের একটা ধ্বংসস্তূপে, নিজেদের মধ্যে এই আশাতেই বিভ্রম জাগিয়েছিলাম যে কোনো-না-কোনো চোরাচালানি নিশ্চয়ই এখান দিয়ে যাবে, কারণ বিশ্বাস যদি কাউকে করা যায় তো এদেরকেই, একমাত্র এরাই পায়রাওঠানো সূর্যের তলায় ঐ দুঃসাহসী সমভূমিতে বেরিয়ে পড়ার তাকৎ রাখে। গোড়ায় আমরা খাচ্ছিলাম গোসাপ-পোড়া আর সেই ধ্বংসস্তূপের ফুলপাতা, আর যখন আমরা জুতোর ফিতের চামড়া খাবার চেষ্টা করেছিলাম তখনও আমাদের হাসি-হাসি করবার মতো ক্ষমতা ছিলো : শেষটায় আমরা চৌবাচ্চা থেকে জোলো-মাকড়সার জাল অব্দি খেয়েছিলাম, আর শুধু তখনই বুঝতে পেরেছিলাম জগৎটাকে আমরা কতটা হারিয়েছি। সে-সময় আমি ঠিক জানতাম না মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোন-কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, তাই আমি নিছক শুয়ে প'ড়েই মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলাম, ভাবছিলাম এইভাবে মৃত্যু হয়তো আমায় কম ব্যথা দেবে ; আর সে তখন কোন-এক মেয়েকে একটানা প্রলাপ বকছে, মেয়েটি নাকি এমনই নরমকোমল ছিলো যে নিছক দীর্ঘশ্বাস ফেলেই সে দেয়ালের মধ্য দিয়ে চ'লে যেতে পারতো, কিন্তু তার সেই বানিয়ে-তোলা স্মৃতিটাও ছিলো বিরহ দিয়ে মৃত্যুকে ধাপ্পা দেবার একটা চাল। তবু, সেই মুহূর্তে, আমাদের যখন ম'রেই যাবার কথা, তাকে আমার ঠেকলো আগের চাইতেও আরো-অনেক জ্যান্ত, সে তাকিয়ে-তাকিয়ে সারা রাত ধ'রে আমার যন্ত্রণা দেখে যেতো, এমনই বিপুল ছিলো তার শক্তি যে আমি এখনও ভেবে উঠতে পারিনি এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শিস দিয়ে যা ব'য়ে যেতো তা কি হাওয়া না কি তার ভাবনারা, আর ভোর হবার আগে একবার সে আগেকার মতোই দৃঢ় স্বরে বললে যে এখন সে সত্যি কথাটা জানে, আমিই আসলে আবার তার ভাগ্যকে দুমড়ে-মুচড়ে পাক খাইয়ে দিয়েছি, কাজেই তোমার পাৎলুন প্রস্তুত করো বাপু, কারণ যেভাবে তুমি আমার ভাগ্যটায় জট পাকিয়ে দিয়েছো, ঠিক তার উলটো মোচড়ে সেটার পাক খুলে তোমায় সরলসোজা ক'রে দিতে হবে।

ঠিক তখনই আমি তার জন্যে আমার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ যে-ভাবভালোবাসা ছিলো সব আমি হারিয়ে বসলাম। শেষ যে-ছেঁড়া কাপড়-চোপড় আমি প'রেছিলাম সে সেগুলো খুলে নিলে, আমাকে গড়িয়ে পাক খাইয়ে জড়িয়ে নিলে কতগুলো কাঁটাতারে, বাতলোর মধ্যে ঘ'ষে দিলে পাথুরে নুন, আমাকে চুবিয়ে রাখলে নোনা জলে—আমার নিজের পেচ্ছাবেই, আমাকে ঝুলিয়ে রাখলে মুণ্ডু-তলায়-পা-ওপরে

রোদ্দুর যাতে আমার চাবকাতে পারে, তার ওপর সারাক্ষণ চেঁচিয়ে বলতে লাগলো অতখানি শারীরিক নিগ্রহও নাকি তার পশ্চাত্তাপকারীদের শান্ত করতে পারছে না। শেষটায় সে আমাকে ছুঁড়ে ফেললো অনুতাপীদের অন্ধকূপে যাতে নিজের দুর্দশার মধ্যেই আমি পচি, সেই অন্ধকূপে এককালে আশ্রমিকেরা বিধর্মীদের শোষণ করতো, আর কোনো হরবোলার বেইমানি নিয়ে—এখনও তার সেই ক্ষমতা যথেষ্টই ছিলো—সে নকল ক'রে ডেকে শোনাতে লাগলো সুখাদ্য প্রাণীদের সুবচন, পাকা বাটপাড়ের শোর, টাটকা জলঝর্নার ধ্বনি যাতে আমাকে সে এই কুহক দিয়ে পীড়ন করতে পারে যে স্বর্গসুখের ঠিক মধ্যটায় আমি মরতে চলেছি খাদ্যাভাবে, অনাহারে। চোরা-চালানকারীরা শেষকালে যখন তাকে রসদ জোগালে, সে সেই অন্ধকূপে এসে আমাকে কী যেন খেতে দিলে—যাতে আমি একেবারে ম'রে না-যাই, কিন্তু এই বদান্যতার জন্যে আমায় তাকে বেদম মাশুল দিতে হ'লো, চিমটে দিয়ে সে টেনে-টেনে তুললো আমার নোখ, দাঁত ভ'রে দিলে শান পাথরে, আর সেই দশায় আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিলো এটাই যে জীবন একদিন আমাকেও সময় দেবে সুযোগ দেবে যাতে এই জঘন্য কেলেঙ্কারির শোধ তুলতে পারি আমি—এর চেয়েও অধম শহিদত্ব দিয়ে সবকিছুর হিশেবনিকেশ করতে পারি। আমি যে এখনও আমার নিজের পচন-পচনের মড়কটা ঠেকাতে পারছি তাতেই আমি তাজ্জব হ'য়ে গেলাম, আর সে কেবলই ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিতে লাগলো তার খাবারের ভুক্তাবশেষ ও উচ্ছিষ্ট, কোণায়-খামচিতে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিলে পচা গিরগিটি আর মরা বাজপাখি যাতে এই অন্ধকূপের বিষহাওয়া শেষটায় আমায় গরলে ভরিয়ে দেয়। এভাবে যে কতদিন কেটেছিলো তার কোনো ধারণাই আমার নেই, তারপর একদিন সে একটা মরা খরগোশ এনে আমায় দেখাতে চাইলো যে আমাকে সেটা খেতে দেবার বদলে সেটাকে বরং ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেই তার পছন্দ হবে; কিন্তু আমার ধৈর্য শুধু অদ্দুরই গিয়েছিলো, আমার মধ্যে শুধু যা বাকি ছিলো তা হ'লো বিদ্বেষজ্বালা, কাজেই খরগোশটা পাকড়ে ধ'রে আমি দেয়ালে ছুঁড়ে মারলাম এই বিভ্রমে যে এ যেন খরগোশ নয়, বরং সে-ই বরং ফেটে পড়বে এখন, আর তারপরেই তা ঘ'টে গেলো, যেন কোনো স্বপ্নের মধ্যে। খরগোশটা যে শুধু আতঙ্কের একটা ঝালাপালা-করা আর্তনাদ ক'রেই বেঁচে উঠলো তা নয়, হাওয়ায় লাফঝাঁপ খেতে-খেতে সে সোজা আমার হাতে এসে পড়লো।

এইভাবেই শুরু হয়েছিলো আমার দুর্দান্ত, পরাক্রান্ত, জীবন। সেই থেকে আমি সারা জগৎটা চ'ষে বেড়িয়েছি: দু-পেসো নিয়ে ম্যালেরিয়ারোগীদের শরীর থেকে জ্বর তাড়িয়ে দিয়েছি, সাড়ে-চার পেসোয় দৃষ্টি দিয়েছি অন্ধদের, আঠারো

পেলোর শোথরোগীদের শরীর থেকে নিংড়ে বার ক'রে দিয়েছি জল, কুড়ি পেলোর আস্ত ও মুঠোয় ক'রে দিয়েছি পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের—যদি অবশ্য তারা জন্ম থেকেই পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হয়, আর বাইশ পেলো নিয়েছি যদি তারা নুলো ও ঠুঁটো হ'য়ে থাকে কোনো দুর্ঘটনায় বা কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামায়, পঁচিশ নিয়েছি যদি তাদের সে-হাল হ'য়ে থাকে যুদ্ধে, ভূমিকম্পে বা পদাতিক বাহিনীর হানায়, অথবা অন্য-যে-কোনোরকম অনর্থযোগে, বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে পাইকিরি হারে সেই সঙ্গে যত্ন করেছি সাধারণ রোগীদের, পাগল সারিয়েছি সে কী নিয়ে পাগল এটা শুনে, ছোটোদের জন্যে আদ্ধেক দাম, আর হাবাগোবাদের সারিয়েছি নিছক কৃতজ্ঞতাবশেই, আর কার এত সাহস হবে বলুক শুনি যে আমি দান-ছিত্র করি না, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, আর এখন, হ্যাঁ, সেনিওর, বিংশতি নৌবহরের অধ্যক্ষ মহোদয়, বলুন আপনার স্যাঙাৎদের সব অবরোধ তুলে নিতে, এ-পথ দিয়ে যেতে দিন দীনদুঃখী দুর্গতদের, কুষ্ঠরোগীরা বাম দিক দিয়ে, মৃগীরোগীরা ডান দিক দিয়ে, নুলোঠুঁটোরা যাবে যেখান দিয়ে যেখানে তারা কারু পথ আটকাবে না, আর পেছনে থাকবে সে-সব মক্কেল যাদের মামলাটা অত জরুরি নয়, শুধু অনুগ্রহ ক রে আমার চারপাশে ভিড় জমাবেন না, কারণ তাহ'লে যদি অসুখবিসুখগুলো মিলেজুলে গি:য় জট পাকিয়ে—আমি কিন্তু দায়ী থাকবো না, আর যে-রোগ নেই সেই রোগ আর লোকদের সারাতে হবে না, আর বাজান, বাজান, বাজিয়ে চলুন গান যতক্ষণ-না টগবগ ফুটে ওঠে বোতল, আর যত পারেন ছুঁড়ুন হাউই-পটকা-আতশবাজি যতক্ষণ-না দেবদূতেরা পুড়ে যায়, আর ব'য়ে যাক মদিরা ও সুরা যতক্ষণ-না ভাবনাচিন্তা ম'রে যায়, আর নিয়ে আসুন ডবকা ছুঁড়ি আর দড়ির বাজি দেখানেওলাদের, নিয়ে আসুন কসাই আর ছবিওলা, সব আমারই খরচে, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, কারণ এখানেই ট্যাড়া প'ড়ে গেলো ব্রাকামানদের বদনামে আর শুরু হ'লো জগৎজোড়া হুলুস্থুল। যদি কখনও আমার বিচারবুদ্ধি ভিমি খায় আর কেউ-কেউ আগের চাইতেও বিগড়ে গিয়ে আমার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাই আমি ঘুম পাড়িয়ে দিই সেনাদোরদের সব কুৎকৌশলকে। একমাত্র যা আমি করি না তা হ'লো, আমি মরা মানুষ বাঁচাই না, কারণ যেই তারা চোখ খোলে অমনি খুনেডাকাতেরা চ'টে-ম'টে অস্থির হ'য়ে ওঠে—তাদের ঐ দশাকে বিগড়ে দেবার জন্যে, যা-ই করুন-না কেন যারা আত্মহত্যা করে না তারা সবাই ফের ম'রে যায় মোহভঙ্গের ফলে। আমার নিজের বৈধতা সন্ধানের জন্যে গোড়ার দিকে একদল জ্ঞানীগুণী আমার পেছন নিয়েছিলো, পরে যখন নিঃসংশয় হ'লো তারা আমায় তা দেখালে আমাকে নাকি সিমোন মাগুস-এর মতো নরকবাস করতে

হবে, আর আমার জন্যে তারা অনুমোদন ক'রে দিলে অনুতাপীর জীবন—যাতে পরে আমি সাধো হ'য়ে যেতে পারি, কিন্তু আমি তাদের উত্তর দিলাম, উঁহু, না, তাদের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কোনো কটাক্ষ না-ক'রেই বললাম যে আমি ঠিকভাবেই আমার কাজকারবার শুরু করেছি। সত্য কথাটা এই-যে, বলুন তো মরবার পরে সাধো-টাধো হ'য়ে আমার আর কোন ফায়দা হবে, আমি তো আসলে একজন শিল্পী, এবং আমি শুধু চাই বেঁচে থাকতে যাতে আমি নিতান্তই গাধাদের জন্যে সারাক্ষণ চলতে পারি ছয়-সিলিণ্ডারের সফরি গাড়িতে, গাড়িটা আমি নৌবহরের কনসালের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি, এমনকী তার এই জিনিসাদীর শোকেসার সমেত যে এককালে নিউ-অর্লিন্সের বোথেটে অপেরায় উদাত্ত পুরুষালি স্বরে গান করতো, গায়ে আমার আসলি রেশমি জামা, হু-রঙা সব বোতাম, আমার পোখরাজ দাঁত, আমার চ্যাপটা সোলার টুপি, প্রাচ্যদেশগুলোর সব আরক ও আতর, কোনো অ্যালার্ম ঘড়ি ছাড়াই ঘুম, সৌন্দর্যশ্রীদের সঙ্গে হরবখৎ নাচ, আর আমার আভিধানিক অলংকৃত বচনে তাদের মধ্যে ঘোর আর ধাঁধা জাগিয়ে দেয়া, এবং যদি কোনো তপ্ত বুধবারে আমার সব ক্ষমতা শুকিয়ে ঝ'রে যায় তবু আমার প্লীহায় কোনো ধড়ফড় ফরফর নেই, কারণ আমি জীবন যাপন করি পরহিতব্রতে সান্ত্বনা ও সাহায্য বিলিয়ে, কোনো মন্ত্রীর মতোই বলা যায় এ-জীবন, আর তা বজায় রাখবার জন্যে আমার শুধু যা চাই তা এই গাড়ল বদন, এই গবেট মুখ, এবং আমার যথেষ্টই আছে সব, এখান থেকে এমনকী সূর্যাস্ত পেরিয়ে সার-সার যে-দোকানপাট চ'লে গিয়েছে তার মালিক আমিই, সেই একই পর্যটকেরা—যারা এককালে নৌবহরের অধ্যক্ষ মারফৎ আমাদের দোহন ক'রে নিতো—এখন তারা আমার নাম স্বাক্ষর-করা ছবি কিনতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, পত্রিকাগুলো এখন আমার লেখা সুভাষিত আর প্রণয়গীতিতে ভরা, তারা কেনে এমন পদক যাতে আমার শ্রীমুখের ছবি—পাশ থেকে তোলা, কেনে আমার জামাকাপড়ের ফালি টুকরো-টাকরা, আর এইসবই সমস্তদিন সমস্ত রাত নষ্ট করবার মতো ঝকমকে সড়ক ছাড়াই, মর্মরপাথরে খোদাই বীর ঘোড়সোয়ার—সেও আমি, আমাদের দেশের সমস্ত জনকের মতোই সোয়ালোদের বিষ্ঠায় ভরপুর।

এটাই ভারি দুঃখের যে অসাধু রাকামান এই গল্পটা ফিরে বলতে পারে না, লোকে তাহ'লে দেখতে পেতো এর মধ্যে বানানো কিছুই নেই। শেষবার তাকে যখন কেউ জগতে দেখেছিলো সে ততক্ষণে তার আগেকার মহিমার ঝি-শির বোতাম শুদ্ধ হারিয়ে বসেছে, তার সত্তা তখন ছড়ানো এলোমেলো টুকরোর স্তূপ, হাড়গোড়গুলো মরুভূমির কঠোর কবে জেরবার, তবে এটা ঠিক তখনও তার যথেষ্ট ঝুলঝুল

ছুটি ছিলো, সান্তা মারিয়া দেল দারিয়েনের জাহাজঘাটায় রোববার-রোববার এসে সে উদয় হ'তো, সঙ্গে তার ফকিরের মতো তোরঙটা নিত্যসঙ্গী, তফাৎটা শুধু এই যে এখন আর সে কোনো মোক্ষম প্রতিষেধক বিক্রি করবার চেষ্টা করে না, বরং আবেগে-চিরে-যাওয়া গলায় অনুনয় করে নৌবহর যেন জনগণের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে তাকে গুলি ক'রে মারে, যাতে সে নিজের শরীরেই পরখ ক'রে দেখাতে পারে এই অতিপ্রাকৃত প্রাণীর পুনর্জীবন-প্রদায়িনী যাবতীয় শক্তি, সেনিওরা ও সেনিওর-গণ, প্রতারক ও প্রবঞ্চক হিশেবে আমি আগে যে-সব ফেরেব্বাজি করেছি তাতে আপনাদের হকের চেয়েও বেশি অধিকার আছে আমাকে বিশ্বাস না-করার, কিন্তু আমি আমার মায়ের হাড়গোড়ের নামে হলফ ক'রে বলছি আজকে আমি আপনাদের যে-প্রমাণ দেবো তা কিন্তু অন্তর্জগতের প্রমাণ ভিন্ন আর কিছু নয় এটাই অতীব দীন সত্য, কাঙালের শেষ কথা, আর যদি-বা আপনাদের এখনও কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ থেকে থাকে, খেয়াল ক'রে দেখুন আমি কিন্তু আর হাসছি না—আগে যে-রকম দাঁত কেলাতাম সেইরকম আর করছি না, বরং দেখুন কীভাবে কোনোমতে আমি আমার কান্না চেপে রাখছি। খুবই বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিলো সে নিশ্চয়ই, জামার বোতাম খোলা, চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে, আর নিজের বুকের ওপর যেখানে তার হৃৎপিণ্ড থাকার কথা সে-কথা অনবরত খচ্চরের লাথির মতো চাপড়াচ্ছিলো, এটাই বোঝাতে গুলি মারবার সেরা চাঁদমারি এটাই, অথচ তবু নৌবহর সাহস পায়নি গুলি করতে, ভয় যে রোববারের এই ভিড় হয়তো তাতে খুঁজে পাবে তাদের মানহানি, হয়তো নিদারুণ অপমানিত বোধ করবে। কেউ-একজন—সে সম্ভবত অতীতের ব্লাকমানীর তোজবাজিগুলো পুরো ভুলে যায়নি—কেউ জানে না সে কেমন ক'রে কোথায় গিয়ে তার জন্যে একটা কৌটোয় ক'রে নিয়ে এলো যথেষ্ট পরিমাণে বিষশেকড় আর সেই শেকড় ওপরে তুলে ফেলতে ক্যারিবিয়নের যত আমিষখোর দাঁড়কাক, আর সেটা সে প্রবল কামনায় খুলে ফেললো, যেন সে সত্যিই ওটা খেয়ে ফেলবে, এবং হ্যাঁ, সত্যিই, সে তা খেয়েও ফেললো, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, আপনারা কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে আবেগ তাড়িত হবেন না অথবা আমার আত্মার শান্তির জন্যেও প্রার্থনা করবেন না, কারণ এই মৃত্যু পরজগতের সঙ্গে সাময়িক একটি সাক্ষাৎকার ছাড়া আর-কিছুই নয়। সে-বারে সে এতটাই সততা দেখিয়েছিলো যে সে কোনো অপেরা পালার মরণখড়খড়ে ভেঙে পড়েনি, বরং চৌকিটা থেকে নেমে এসেছিলো একটা কাঁকড়ার মতো, কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে শেষটায় শুয়ে-পড়ার জন্যে সবচেয়ে যোগ্য জায়গাটা বেছে নিলে মাটিতে, আর সেখান থেকে

সে তাকালে আমার দিকে যেমন ক'রে কোনো অসহায় শিশু তার মায়ের দিকে তাকায়, আর তারপর সে ত্যাগ করলে তার শেষ নিশ্বাস—নিজেরই বাহুবন্ধনে আবদ্ধ, চিরন্তনের বহ্নিকারে ডুবতে যাবার সময়ও সে তার পৌরুষভরা অশ্রু ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলো। একমাত্র সে-বারই বলা বাহুল্য, আমার বিজ্ঞান আমার কোনোই কাজে এলো না—সম্পূর্ণ বিফল হ'লো। আমি তাকে রাখলাম অনুকূলে যাপের সেই কফিন-তোরঙে, তার মধ্যে তাকে শুইয়ে রাখার মতো যথেষ্ট জায়গা ছিলো। তার অন্ত্যেষ্টির খ্রিষ্টযাগের গান গাওয়ার ব্যবস্থা করলাম আমি, সেজন্তে আমায় চুয়ান্ন পেসো এম্পানি স্বর্ণমুদ্রা দিতে হয়েছিলো, কারণ গায়করা সেজে এসেছিলো সোনার জরিতে, আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিন-তিনজন বিশপ। তার জন্তে আমি একটা সমাধিসৌধও নির্মাণ করলাম, কোনো সম্রাটের সমাধিসৌধ যেমন হয় তেমন, সমুদ্রের সেরা আবহাওয়া যেখানে সেখানে, একটা টিলার ওপর, নির্মাণ করলাম একটা চ্যাপেল—শুধু তারই জন্তে, আর এক লোহার ফলক বসালাম যাতে বড়ো-বড়ো গথিক হরফে লেখা রইলো : এখানে শুয়ে আছে মৃত রাকামান, নিন্দুকেরা তাকে ডাকতো অসাধু, বদ, নৌবহরের প্রবঞ্চক আর বিজ্ঞানের বলি, আর যখন তার যাবতীয় সদ্গুণের জন্তে এ-সব যথোচিত সম্মান ব'লে বিবেচনা করলাম, তখনই আমি তার জঘন্য ব্যবহারের জন্তে শোধ নিতে শুরু করলাম, তখনই আমি তাকে ঐ সাঁজোয়া সমাধির ভেতরে পুনর্জীবন দিলাম, আর তাকে ঐ কবরের মধ্যেই রেখে দিলাম যাতে বিভীষিকা ও আতঙ্কে সে সারাক্ষণ ছটফট করে, গড়াগড়ি যায়। সে অনেকদিন আগেকার কথা, আগুনে পিঁপড়েরা সান্তা মারিয়া দেল দারিয়েনকে গিলে ফেলবারও অনেক আগে ঘটেছিলো এ-সব, কিন্তু সমাধিসৌধটা অটুট আছে এখনও, টিলার ওপর, অ্যাটলান্টিকের হাওয়ায় যে ড্রাগনেরা ওখানে ঘুমোতে ওঠে তাদের ছায়ায়, আর যতবারই আমাকে এখান দিয়ে যেতে হয় আমি তার জন্তে গাড়ি বোঝাই ক'রে গোলাপ নিয়ে আসি, আর তার সদ্গুণের কথা ভেবে আমার বুকটা ব্যথা করে, কিন্তু তখন আমি কান পাতি ফলকটার গায়ে, শুনতে পাই ভাঙাচোরা কফিন-তোরঙটার ভগ্নস্তূপে সে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে, আর দৈবাৎ যদি সে আবার ম'রে যায় নাছোড়ের মতো আমি তাকে আবার ফিরিয়ে আনি জীবনে, কারণ এই শাস্তির সৌন্দর্যটা এখানেই যে সে তার কবরের মধ্যে বেঁচেই থাকবে, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন সেও বেঁচে থাকবে, আর তার মানে হ'লো অনন্তকাল।

১৯৬৮

ভুতুড়ে জাহাজের শেষ পাড়ি

এবার ওরা টের পাবে আমি কে, তার জোরালো নতুন পুরুষগলায় বললে সে, যেদিন সে প্রথম দেখেছিলো সেই আলোহীন শব্দহীন বিশাল সমুদ্রগামী জাহাজটি তার অনেকদিন পরে, একরাতে গাঁয়ের পাশ দিয়ে গিয়েছিলো সেই অতিকায় জাহাজ, আস্ত গ্রামটার চেয়েও দীর্ঘ, গির্জের গম্বুজটার চেয়েও উঁচু, আর—পালখাটানো—পাশ দিয়ে চ'লে গিয়েছিলো অন্ধকারে ঔপনিবেশিক নগরীটির উদ্দেশে, জলদস্যুদের হামলা থেকে বাঁচবার জন্যে যেখানে বানানো হয়েছে দুর্গপ্রাকার, পুরোনো ক্রীতদাস বন্দর আর পাকখাওয়া সন্ধানী আলো আছে যার, যার বিষণ্ণ রশ্মি প্রতি পনেরো সেকেণ্ডে পর-পর গ্রামটার রূপবদল করিয়ে দেয় জ্বলজ্বলে বাড়িঘর আর আগ্নেয়-শিলার মরুউষর রাস্তায় ওরা কোনো চান্দ্রশিবিরে, আর যদিও সে তখন নেহাৎ বালক ছিলো, ছিলো না এই পুরুষালি গমগমে গলা, হাওয়ার নৈশ বীণাগুলোকে শোনাবার জন্যে তবু মায়ের অনুমতি পেয়েছিলো অনেক রাত অব্দি বেলাভূমিতে থাকবার, এখনও সে মনে করতে পারে, জাহাজটা দেখবার অনেক বছর পরে, যেন সে এখনও দেখতে পাচ্ছে কেমন ক'রে জাহাজটা মিলিয়ে যায় যখন বাতিঘরের আলো ঠিকরে পড়ে তার পাশে আর কেমন ক'রে সে আবার দেখা দেয় যখন আলো চ'লে গিয়েছে পাশ দিয়ে, আর এই দেখে-দেখে মনে হচ্ছিলো এ যেন কোনো সবিরাম জাহাজ থেমে-থেমে চলেছে পাল খাটিয়ে, এই দেখা দেয়, এই মিলিয়ে যায়, চলেছে উপসাগরের মুখটার দিকে, যেন ঘুমের ঘোরে পথ-হাঁটার মতো হাৎড়ে-হাৎড়ে চলেছে, কারণ বয়াগুলো চিহ্নিত ক'রেই রেখেছিলো বন্দরের খাড়ি, কিন্তু কিছু-একটা বুঝি বিগড়ে যায় দিগ্‌দর্শিকার কাঁটায়, কেননা সে এগিয়েছে সেই মগ্ন চড়াগুলো সেই প্রচ্ছন্ন বিপদের দিকে, গিয়ে আছাড় খেয়েছে তার ওপর, ভেঙে চুরমার, ডুবে গিয়েছে কোনো শব্দ না-ক'রেই, যদিও কোনো ডুবোপাহাড়ের সঙ্গে কোনো জাহাজের যদি এমন সংঘর্ষ হয় তবে উচিত হ'তো ধাতুর প্রকাণ্ড ঝনঝন আর এনজিনের তুমুল বিস্ফোরণ, আতঙ্কে যে-নিনাদ জমাট বাধিয়ে দিতো প্রাগৈতিহাসিক জঙ্গলের সবচেয়ে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন ড্রাগনকেও, গ্রামের শেষ [illegible]গুলো থেকে যে-জঙ্গলের শুরু আর যে-জঙ্গলের শেষ একেবারে জগতের

পরপারে, আর তাই সে নিজেই ভেবেছিলো এটা বোধহয় কোনো স্বপ্ন, বিশেষত পরদিন, যখন সে দেখতে পেয়েছিলো উপসাগরের উজ্জ্বল মেছোঘেরি, বন্দরের ওপরে টিলার গায়ে নিগ্রোদের ঝুপড়িগুলোর রংবেরঙের বিশৃঙ্খলা, গিয়ানার চোরাচালানকারীদের বিষাক্ত পোতে তোলা হচ্ছে নির্দোষ-সব কাকাতুয়া যাদের পাকস্থলিগুলো ভর্তি হিরে-জহরতে, সে ভেবেছিলো, তারা গুনতে-গুনতেই নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর স্বপ্নে দেখেছিলাম সেই বিশাল জাহাজটা, নিশ্চয়ই তা-ই, আর এ-কথা সে এতটাই বিশ্বাস ক'রে বসেছিলো যে কাউকেই সে-সম্বন্ধে কিছু বলেনি, আর পরের মার্চের সেই একই রাতে তাকে আবার দেখবার আগে এই দেখাটাও তার মনে পড়েনি, সে তখন শিশুমারের ঝিলিক দেখবে ব'লে তাকিয়েছিলো সমুদ্রের দিকে, আর তার বদলে যা দেখেছিলো তা এই কুহকতরীটিকেই, এই বিভ্রম জাগানো জাহাজটিকেই, এই আছে এই নেই, বিমর্ষ, সবিরাম, প্রথমবারের মতো সেই একই ভ্রান্ত লক্ষ্যের দিকে সটান চলেছে, তফাৎ শুধু এটাই যে সে-রাতে সে জেগে আছে ব'লে এতটাই নিশ্চিত ছিলো যে সে ছুটে গিয়েছিলো তার মাকে বলবে ব'লে আর তিনি তিন-তিনটে সপ্তাহ কাটালেন হতাশায় ফুঁপিয়ে, কারণ তোর মগজটাই প'চে যাচ্ছে, সবকিছু উলটোপালটা করলে যা হয়, তোর দিন-রাত যেন ডিগবাজি খেয়েছে, দিনে ঘুমোস আর রাতে বেরিয়ে যাস অপরাধীদের মতো, আর যেহেতু মা-র তখন শহরে যাবার কথা, আরামে-বসা-যায় এমন কোনো-কিছুর খোঁজে, যাতে তাঁর ওপর ব'সে তিনি তাঁর মৃত স্বামীর কথা ভেবে যেতে পারেন, কারণ এগারো বছরের বৈধব্যের পর এতদিনে তাঁর কেদারার দোলকাঠামো ভেঙে গিয়েছে, সে তাই এই উপলক্ষের সুযোগটা নিলে, মাঝিদের বললে মেছোঘেরির পাশটায় চ'লে যেতে যাতে তাঁর ছেলে স্বচক্ষে দেখতে পারে আসলে সে সত্যি-সত্যি কী দেখেছিলো জলের আয়নায়, স্পঞ্জদের বসন্তে মাতা রশ্মিদের প্রণয়লীলা, গোলাপি স্ন্যাপার আর নীল কাক ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই জলের মধ্যেই আরো-নরম জলের অন্তসব কুয়োয়, আর এমনকী কোনো ঔপনিবেশিক নৌকাডুবিতে যারা জলে ডুবে মারা গেছে তাদের ভবঘুরে চুল ভেসে যাচ্ছে জলে, কোনো সদ্য-ডোবা জাহাজ কিংবা তার মতো কিছুরই কোনো পাত্তা নেই, অথচ তার মাথাটা এমনি শুওর-মার্কা যে তার মা শেষ অব্দি কথা দিলেন পরের মার্চে তার সঙ্গে গিয়েই নজর রাখবেন, সত্যি, কথা দিচ্ছি, নিশ্চয়ই যাবো, যাবোই, এটা তো জানতেন না তাঁর অদূর ভবিষ্যতে একমাত্র যেটা নিশ্চয়ই ঘটবে সেটা সার ফ্রানসিস ড্রেকের আমলের একটা আরামকেদারা, যেটা তিনি তুরানির দোকান থেকে নিলেমে কিনেছেন, যার

ওপরে সেই রাত্তিরেই যা বলবেন বিশ্রাম করতে, ফস-ফস শ্বাস ফেলবেন কষ্টের, ওঃ, বেচারা আমার, ওলোফেরনেস, যদি তুমি শুধু দেখতে পেতে এই মখমলমোড়া কিংখাবেঘেরা রানীর সম্পুটে ব'সে-ব'সে তোমার কথা ভাবতে কী-যে ভালো লাগে, কিন্তু যতই তিনি তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতি ফিরিয়ে আনেন ততই তাঁর রক্ত তাঁর হৃৎপিণ্ডে বুড়বুড়ি তোলে আর চকোলেট হ'য়ে যায়, যেন ব'সে-থাকার বদলে তিনি আসলে ছুটছেন, ভিজে একশা হিমশিহরনে আর জ্বরে, আর তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস যেন দলা-দলা মাটিতে ভরা, আর শেষটায় ছেলে ফিরে এলো ভোরবেলায় আর দেখলো মা ম'রে প'ড়ে আছে আরামকেদারায়, কিন্তু আদ্ধেক এর মধ্যেই প'চে গেছে, সাপে ছোবলালে যেমন হয় ঠিক একই জিনিশ ঘটেছিলো পরে আরো চারজন স্ত্রীলোকের আর তারপরেই খুনে কেদারাকে ছুঁড়ে ফেলা হয় সমুদ্রে, অনেক দূরে, কারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এটাকে এতই ব্যবহার করা হয়েছে যে তার আরাম বা শান্তি দেবার সব ক্ষমতা লোপ পেয়ে গিয়েছিলো, আর তাই তাকে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে হয়েছিলো বাপ-মা মরা কোনো অনাথের দুঃস্থ কর্মসূচিতে, সবাই যাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতো এ হচ্ছে ঐ বিধবাটির ছেলে যে গ্রামে নিয়ে এসে-ছিলো দুর্ভাগ্যের ঐ সিংহাসন লোকের দয়াদাক্ষিণ্য ততো নয়, সে খেয়ে বাঁচতো নৌকোগুলি থেকে চুরি ক'রে হাতানো মাছ খেয়ে, আর ক্রমে তার কণ্ঠস্বর হ'য়ে উঠলো ভরাট গর্জন, আরেকটা মার্চের রাত্তির না-আসা অব্দি পুরোনো দৃশ্যগুলো তার মনেই পড়েনি, কিন্তু সে-রাতে দৈবাৎ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলো সে, আর আচমকা, ধন্যি প্রভু, ঐ তো ওটা ওখানে, অ্যাসবেস্টসে তৈরি সেই বিশাল তিমি, বেহেমথ পশু, যন্ত্রদানব, এসো-গো, দেখে যাও, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ আর মেয়েদের আতঙ্কের এমন-একটা তুলকালাম শোরগোল তুললো সে যে সবচেয়ে বুড়ো থুর-থুরেদেরও মনে প'ড়ে গেলো তাদের বাপপিতামহদের আতঙ্ক আর ঢুকে পড়লো খাটের তলায় ভাবলো যে উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ের বুঝি আবার এসে হাজির, কিন্তু যারা ছুটে বেরিয়ে এসেছিলো রাস্তায় সেই-তারা কিন্তু সেই অসম্ভব যন্ত্রটিকে দেখ-বার কোনো চেষ্টাই করেনি, সেই মুহূর্তে সেটা অবশ্য আবার হারিয়ে গিয়েছিলো পুবদিকে, আর উড্ডীন উঠেছিলো তার সাম্বাৎসরিক সর্বনাশের প্রাক্কালে, কিন্তু তারা তাকে মেরে-ধ'রে এমন দোমড়ানো-কুঁচকোনো ক'রে ফেলে রেখে চ'লে গিয়েছিলো যে তখনই সে নিজেকে বলেছিলো, রাগে তার কষ বেয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, এবার এরা টের পাবে আমি কে, তবে সে হুঁশিয়ার ছেলে, কারু কাছেই সে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা খুলে বলেনি, বরং সারাটা বছর সে কাটালো এই একই

ভাবনা মাথায়, এবার এরা দেখতে পাবে আমি কে, অপেক্ষা ক'রে রইলো আবারও সেই ছায়া-জাহাজের আবির্ভাবের সন্ধ্যাটার জন্যে, সে যা করতে চায় তার জন্যে এই অপেক্ষাটা জরুরি, অর্থাৎ সেই সন্ধ্যেয় সে একটা নৌকো চুরি ক'রে উপসাগর পেরিয়ে যাবে, সন্ধেবেলাটা কাটাবে ক্রীতদাস বন্দরের খাড়িগুলোর একটায় তার দুর্দান্ত মুহূর্তটার জন্যে, সেই যে-খাড়িগুলো ক্যারিবিয়নের সব মানুষের পেচ্ছাবে ভরা, তবে সে তার অভিযানে এমনই নিবিষ্ট হ'য়েছিলো যে সে এমনকী সবসময়ে যা করে তার মতো আস্ত-আস্ত হাতির দাঁত কেটে বানানো আইভার মান্দারিন মূর্তিতে ভরা হিন্দু দোকানগুলোর সামনেও থামেনি কিংবা রগড়-তামাশা করেনি বিকলাঙ্গ পায়ে গতিময় জুতো-পরানো ওলন্দাজ নিগ্রোদের নিয়ে, কিংবা সে অন্য-বারের মতো ভয়ও পায়নি খয়রি রঙের মলয়ালিদের দেখে যারা নাকি সারা পৃথিবী ঘুরে বেরিয়েছে হর্ষোৎফুল্ল সেই ভাঁটিখানাটির অসার ও অলীক কল্পনায় যেখানে নাকি বিক্রি হয় ব্রাজিলের মেয়েদের রাং-এর কাবাব, কারণ রাত্তির নামার আগে আশপাশের কোনোকিছুর সম্বন্ধেই তার কোনো চেৎভেদ ছিলো না, আর রাত নেমে এলো হঠাৎ তারাদের সব ভার নিয়ে আর জঙ্গল নিঃশেষে ছড়িয়ে দিলে গার্ডেনিয়া আর প'চে-যাওয়া বহুরূপীদের মধুর ঝিম সৌরভ, আর সে ছিলো ঐ-তো ওখানে, দাঁড় বাইছিলো তার চোরাই নৌকোয়, সেটা নিয়ে যাচ্ছিলো উপ-সাগরের মুখের দিকে, শুল্ক দফতরের পাহারার দৃষ্টিকে সজাগ না-ক'রে দেবার জন্যে লণ্ঠন নেভানো, বাতিঘরের আলোর সবুজ ডানার ঝাপটায় প্রতি পনেরো সেকেণ্ডে পর-পর সে না-মানুষ হ'য়ে উঠছে তারপরেই অন্ধকার তাকে ফের মানুষ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে, বন্দরের খাড়িটা চেনাবার জন্যে বয়াগুলোর পাশে এসে পড়ছে দেখে শুধু-যে তার চাপে ভরা দীপ্তি আরো তীব্র ও প্রখর হ'য়ে উঠছে তা নয়, বরং জলের নিশ্বাস ক্রমশ যে করুণ হ'য়ে উঠছে সেইজন্যেই, সে ঐভাবে বৈঠা চালিয়ে গেলো, নিজের মধ্যে এমন জড়ানো-গোটানো যে সে জানতেই পারেনি ঠিক কোনখান থেকে এলো ভয়াবহ হাঙরের নিশ্বাস কিংবা কেনই যে রাত এমন নিবিড় ও ঘন হ'য়ে উঠলো, যেন অতর্কিতে নিভে গিয়েছে সব তারা, আর এইজন্যেই যে-জাহাজটা ছিলো ওখানে, তার যাবতীয় অভাবনীয় মহাকায় নিয়ে, প্রকাণ্ড, বাপ রে, জগতের যে-কোনো অতিকায় জিনিশের চাইতেও আরো-বড়ো, জলে-ডাঙায় যাবতীয় মিশকালো জিনিশের চাইতেও আরো-কালো, নৌকোর এত কাছে দিয়ে যাচ্ছে সেই তিনশো হাজার টনের সেই হাঙরগন্ধ যে সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে ইস্পাতি খাড়াইয়ের কিনার, অগুনতি ঘুলঘুলির মধ্যে একটাতেও আলো জ্বলছে না,

কোনো দীর্ঘশ্বাস পড়ছে না এনজিন থেকে, কোনো জনপ্রাণী নেই, নিজের স্তব্ধতার বুকে সে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজেরই মরা বাতাস, তার নিজেরই থমকে-পড়া সময়, তার পলাতক নিস্তব্ধতা যার মধ্যে জলে-ডোবা মানুষদের একটা আস্ত জগৎই যেন ভাসছে, আর আচমকা এই সবই উধাও হ'য়ে গেলো বাতিঘরের আলোর ঝলকে আর মুহূর্তের জন্যে চারপাশ আবার হ'য়ে উঠলো স্বচ্ছ ক্যারিবিয়ন, মার্চের রাত্তির, পেলিকানদের প্রাত্যহিকতা, কাজেই সে একাই থেকে গেলো বয়াগুলোর মধ্যে, বুঝতেই পারছে না কী করবে, নিজেকে জিগেশ করছে কী করা উচিত, আতংকেই পেছে, সে কি জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখছে নাকি, শুধু যে এখন তা নয়—অন্যান্য বারেও সে কি স্বপ্নই দেখেছে, কিন্তু নিজেকে এ-কথা শুধিয়েছে কি শুধোয়নি বয়া-গুলোর মধ্য থেকে রহস্যের দম বেরিয়ে ভাড়ালো কেউ, প্রথম বয়া থেকে শেষ অব্দি, যখন বাতিঘরের আলো আবার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো আবার দেখা দিলে জাহাজ, এখন তার দিগ্দর্শিকা বিকল, হয়তো জানেই না মহাসমুদ্রের ঠিক কোন-খানে এই সাগর, অদৃশ্য খাড়িটার জন্যে যেন আকুল হাৎড়াচ্ছে কিন্তু আসলে সোজা এগিয়ে চলেছে প্রচ্ছন্ন ডুবোপাহাড়ের দিকে, শেষটায় সে যেন একটা সবচাপানো প্রকাশিত আলো পেলে, দিব্যদৃষ্টি, বুঝলো যে বয়াগুলোই নিশ্চয়ই এই রহস্যের শেষ চাবিকাঠি, আর সে নৌকোয় জেলে নিলে তার লণ্ঠন, খুদে একরত্তি একটা লাল আলো, প্রহরীমিনারের বিপদ জানান দেবার কোনো যুক্তিই যার নেই কিন্তু যেটা সারেঙের কাছে হবে দিশারী সূর্যের মতো, কারণ, তারই সৌজন্যে, জাহাজটা তার গতিপথের ভুলটা শোধরালে, আর খাড়ির প্রধান তোরণটা দিয়ে ঢুকে পড়লো, জাহাজ-চালানোর কৃৎকৌশলের ভাগ্যে-ঘটা পুনরুত্থানে, আর তখনই একসঙ্গে জ'লে উঠলো তার সব আলো, ঝগঝগ শুরু ক'রে দিলে বয়লার, তারারা আটকে রইলো যে যার জায়গায়, আর প্রাণীদের মৃতদেহগুলো চ'লে গেলো জলের অতলে, রভই ধরে উঠলো রেকাবি-বারকোশের ঝনঝন আর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো লরেল কোলের সুঘ্রাণ, কেউ ইচ্ছে করলেই শুনতে পেতো খোলা চাঁদের তলায় জেকে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠেছে আর রাজকীয় ঘরগুলোর ছায়ায় দপদপ ক'রে উঠছে প্রেমিক-প্রেমিকার ধমনী, তবু সে নিজের মধ্যে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছিলো একটাই ভুক্তাবশিষ্ট রোষ যে সে নিজেকে আবেগে তাড়িত হ'তেই দেবে না কিংবা ভয় পাবে না এই আশ্চর্য অলৌকিককে, তবে নিজেকে সে বললে আগের চাইতে আরো-দৃঢ়ভাবে, এবার ওরা টের পাবে আমি কে, ভদ্রলোক, ভিতুর ডিম, এবার ওরা দেখবে, আর অতিকায় যন্ত্রযানবটি যাতে তার ঘাড়ে এসে না-পড়ে সেইজন্যে

পাশে স'রে যাবার বদলে সে তার সামনে দিয়েই দাঁড় বাইতে লাগলো, কারণ এবার কাপুরুষগুলো সত্যি টের পাবে আমি কে, আর সে লণ্ঠন দেখিয়ে জাহাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো, তারপর সে নিশ্চিত হ'লো জাহাজের বাধ্যতায়, সে-যে আবারও একবার জাহাজঘাটা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে জাহাজের গতিপথ, তাকে যার ক'রে নিয়ে এসেছে অদৃশ্য খাল থেকে, আর তার লাগাম ধ'রে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত গ্রামের আলোগুলোর দিকে যেন সে কোনো সিন্ধুঘোটক, জ্যান্ত এক জাহাজ, বাতিঘরের মশালের আলো এখন যাকে আর ভয় পাওয়ায় না, এখন আর তাকে অদৃশ্য ক'রে দেয় না সে-আলো বরং তাকে অ্যালুমিনিয়াম ক'রে তোলে প্রতি পনেরো সেকেণ্ড পর-পর, আর গির্জের ওপরকার ক্রুশগুলো, বাড়িঘরগুলোর দুঃস্থ দীন দশা, বিভ্রম যেন চেতিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তবু মহাসমুদ্রের জাহাজ পেছন-পেছন এসেছে তার, ভেতরে-ভেতরে অনুসরণ ক'রে এসেছে তারই গোপন অভিপ্রায়, তার হৃৎপিণ্ডের দিকে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছে কাপ্তেন, তাদের রান্না-বান্নার ভাঁড়ার ঘরের দুয়ারে ঘুমিয়ে আছে লড়িয়ে যত ষণ্ডা, রোগশয্যায় শুধু এক-মাত্র এক রোগী, তার চৌবাচ্চাগুলোর অনাথ জল, মুক্তিবিহীন সারেঙ যে নিশ্চয়ই জাহাজঘাটা হিশেবে ভুল করেছে শৈলশিরাকে, কারণ সেই মুহূর্তে ভোঁ উঠলো ভ'ত্র প্রখর প্রকাণ্ড, একবার, আর তার ওপর অনর্গল ঝ'রে-পড়া বাষ্পে সে ভিজে চুপচুপে হ'য়ে গেলো একেবারে, আবারও, আর অন্ত-যার নৌকো সে চুরি করেছে সেই নৌকো বুঝি এবার কাৎ হ'য়ে পড়ে, আর আবার, কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে, কারণ ঐ তো বেলাভূমির কড়িঝিনুক, রাস্তাঘাটের খোয়াপাথর, অবিশ্বাসীদের যত ঘর-দুয়ার, সারা গাঁ আলো হ'য়ে উঠেছে ভয়াবহ ঐ জাহাজের ভীষণ আলোয়, আর সে যেন শেষ মুহূর্তটাই শুধু পেলে মহাপ্লাবনের ঠিক আগটায়, পাশে স'রে যাবার জন্যে, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে সে চীৎকার ক'রে উঠেছে, এই-যে ছাখো, ভিতুর দল, ভরপোক, ইস্পাতের মস্ত খোপটা মাটি চুরমার ক'রে দেবার ঠিক এক মুহূর্ত আগে যে-কেউ শুনতে পেতো নব্বুই হাজার পাঁচশো শ্যাম্পেন গেলাশের ভেঙে-পড়ার পরিচ্ছন্ন ঝনঝন, একটার পর আরেকটা গলুই থেকে হাল পর্যন্ত, তারপর ছিটকে বেরিয়ে এলো আলো, এখন সে আর মার্চের কোনো ভোর নয়, বরং কোনো ঝকঝকে বুধবারের দুপুর, আর অবিশ্বাসীরা এখন কেমন আতঙ্কে হা ক'রে বিস্ফারিত চোখে দেখছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রকাণ্ড জাহাজকে সেটা দেখবার তৃপ্তি ও সন্তোষ দিলে সে নিজেকে, আর গির্জের সামনে মাটিতে পোঁতা

অক্তটা, সবকিছুর চাইতে শাদা, সমুদ্রের চেয়েও কুড়িগুণ উঁচু, সারা প্রান্তটার চেয়ে প্রায় সাতানব্বুইগুণ দীর্ঘ, সোনার হরফে তার নাম খোদাই করা, *Halalcaillag*, আর তার পাশ দিয়ে ঝ'রে পড়ছে মৃত্যুসমুদ্রের যত প্রাচীন আর অলস জল, কৌটায়-কৌটায়, কৌটার পর কৌটায়।

১৯৬৮

হারানো সময়ের সমুদ্র

জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সমুদ্র কেমন রুক্ষ ফুঁসে উঠলো, শহরের গায়ে খালাশ ক'রে দিতে শুরু করলো তার বিপুল আবর্জনা, আর কয়েক সপ্তাহ বাদেই সবকিছুতেই সংক্রমিত হ'য়ে গেলো তার অসহনীয় মেজাজ। সেই সময় থেকেই পৃথিবী আর বাসযোগ্য রইলো না, অন্তত পরের ডিসেম্বর অব্দি তো নয়ই, কাজেই আটটার পরে কেউই আর জেগে থাকে না। কিন্তু যে-বছর মিস্টার হার্বার্ট এসে হাজির হলেন সমুদ্রের কোনো বদলই হ'লো না, এমনকী ফেব্রুয়ারিতেও নয়। উলটো দিকে, বরং, সমুদ্র হ'য়ে উঠলো আরো-মসৃণ আরো-ঝলমলে আর মার্চ মাসের প্রথম রাতগুলোয় সে ছড়িয়ে দিলো রাশি-রাশি গোলাপের গন্ধ।

গন্ধটা পেলে তোবিয়াস। কাঁকড়াদের কেমন যেন কাছে টেনে নিয়ে আসে তার রক্ত, আদ্ধেক রাতটাই সে কাটালে তার বিছানা থেকে কাঁকড়াদের তাড়িয়ে, তারপর আবার হাওয়া জেগে উঠলো, আর সেও একটু ঘুমোতে পারলে। জেগে-জেগে শুয়ে-থাকার দীর্ঘ সময়টায় সে হাওয়ার সবরকম বদল চিনে ফেলতে শিখে ফেলেছে। কাজেই সে যখন গোলাপের গন্ধ পেলে, তাকে গিয়ে দরজাটাও খুলতে হ'লো না, সে জানে এই গন্ধ আসছে সমুদ্র থেকে।

সে ঘুম থেকে উঠলো দেরি ক'রে। ক্লোতিল্‌দে তখন উঠোনে আগুন ধরাচ্ছে। হাওয়াটা জুড়িয়ে যাচ্ছে সব, সমস্ত তারাই রয়েছে যে যার নিজের জায়গায়, কিন্তু সমুদ্রের আলোগুলোর জন্যেই তাদের কেউ যে এক-এক ক'রে দিগন্ত অব্দি গুনবে সেটা কঠিন ঠেকে। তার কফি খাবার পরও তোবিয়াসের মনে হ'লো সে যেন এখনও রাত্তিরটাকেই একটু-একটু চাখতে পারছে।

'কাল রাতে তারি আশ্চর্য কাণ্ড হয়েছে,' তার মনে প'ড়ে গেলো।

ক্লোতিল্‌দে, বলাই বাহুল্য, গন্ধটা পায়নি। সে এমনই গভীর ঘুমে চ'লে পড়েছিলো যে তার এমনকী স্বপ্নগুলোও আর মনে পড়ছে না।

'গোলাপের গন্ধ পেলাম,' তোবিয়াস বললে, 'আর আমি ঠিক জানি গন্ধটা এসেছিলো সমুদ্র থেকে।'

'গোলাপের গন্ধ কেমন, তা-ই আমি জানি না,' বললে ক্লোতিল্‌দে।

সে হয়তো ঠিকই বলেছে। শহরটা উষর, কঠিন মাটি চিরে-চিরে গেছে পোড়া, আর শুধু ভাটিংই কেউ কোনো উপলক্ষে বাইরে থেকে ফুলের তোড়া আনে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলবে ব'লে, যেখানে তারা তাদের মৃতদের ভাসিয়ে দেয়।

'ভ্রাকামাইয়ালের যে-লোকটা জলে ডুবে মরেছিলো, গন্ধটা ছিলো তারই মতো, হুবহু এক,' তোবিয়াস বললে।

'তা,' ক্লোতিল্দে বললে, মুখে মুচকি হাসি, 'গন্ধটা যদি ভালো হয় তাহ'লে এটা তুমি ধ'রেই নিতে পারো যে গন্ধটা সমুদ্র থেকে আসেনি।'

সমুদ্র এখানে, সত্যি, নিষ্ঠুর। কখনো-কখনো, জালগুলো যখন ভাসন্ত আবর্জনা ছাড়া আর-কিছুই আনে না, তখন যখন ভাঁটার টানে জল স'রে যায়, শহরের রাস্তাগুলো তখনও ভরা থাকে মরা মাছে। ডাইনামাইট শুধু পুরোনো জাহাজডুবির ভাঙা টুকরোগুলোই জলের ওপর নিয়ে আসে।

ক্লোতিল্দের মতোই, শহরে অল্প যে-কজন স্ত্রীলোক আছে, তিক্ততায় তারা শুধু টগবগ টগবগ ফুটছে। আর তারই মতো, ঐ তো আছে বুড়ো হাকোবের বৌ, সেদিন সকালে সে অন্যদিনের চাইতে আগেই উঠে পড়েছে; সে বাড়িঘর সব ঠিকঠাক গোছালে, তারপর বসলো ছোটোহাজরিতে, চোখের ভাবে মনে হয় যেন কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

'আমার শেষ ইচ্ছে,' সে বললে তার স্বামীকে, 'যেন জ্যান্ত কবরে যাই।'

কথাটা সে এমনভাবে বললে যেন সে আছে মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু সে বসেছিলো খাবারঘরের টেবিলে, জানলাগুলোর মুখোমুখি, জানলাগুলো দিয়ে তখন মার্চের ঝকঝকে আলো ঝ'রে পড়ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে গোটা বাড়িতেই। স্ত্রীর মুখোমুখি ব'সে, তার শান্ত ক্ষুধাকে প্রশমিত করছিলো বুড়ো হাকোব—সে তার স্ত্রীকে এত ভালোবাসে, এতদিন ধ'রে ভালোবাসে যে সে এখন এমন-কোনো দুঃখকষ্টের কথা কল্পনাও করতে পারে না যেটা কোনো-না-কোনোভাবে তার স্ত্রীকে দিয়ে শুরু হয়নি।

'আমি এই আশ্বাস নিয়ে মরতে চাই যে আমি সত্যিকার মানুষের মতো মাটির তলায় শোবো,' তার স্ত্রী ব'লেই চললো। 'আর সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে জনে-জনে গিয়ে বলা যে আমাকে যেন ভগবানের নাম ক'রে তারা জ্যান্তই কবর দেয়।'

'কাউকে তোমায় বলতে হবে না,' অতীব শান্তভাবেই বললে বুড়ো হাকোব। 'আমি নিজেই তোমায় কবর দেবো।'

'তাহ'লে চলো, যাই,' স্ত্রী বললে, 'কারণ অন্নক্ষণের মধ্যেই আমি মারা যাবো।'

বুড়ো হাকোব তাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে। স্ত্রীর চোখ দুটি এখনও কচি। তবে তার হাড়গুলো জোড়ের কাছে কেমন জট পাকিয়ে গেছে, আর তাকে দেখে মনে প'ড়ে যায় চষা জমির কথা; তা, সে-কথা যদি ওঠে তো বলতেই হয় সবসময়েই তাকে এমন দেখাতো।

'আগের চেয়েও তুমি এখন বেশি সুঠাম আছো,' বুড়ো হাকোব তাকে বললে।

'কাল রাতে আমি গোলাপের গন্ধ পেয়েছি,' তার স্ত্রী ঘন একটা শ্বাস ছাড়লে।

'সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না,' বুড়ো হাকোব তাকে আশ্বস্ত করতে চাইলো। 'আমাদের মতো গরিব বেচারাদের জীবনে এ-রকম-কিছু সবসময়েই ঘটছে।'

'মোটেই তা নয়,' স্ত্রী বললে। 'সমুদ্র থেকে অনেক দূরে চ'লে গিয়ে আমি মরতে চাই। চিরকাল আমি প্রার্থনা করেছি আমি যেন অনেক আগে থেকেই টের পাই কখন আমি মরতে চলেছি। এই শহরে গোলাপের গন্ধ একমাত্র ঈশ্বরের নির্দেশই হ'তে পারে।'

বুড়ো হাকোব তখন শুধু এটাই তাকে বলতে পারলে যে সবকিছু গোছগাছ ক'রে নেবার জন্যে একটু সময় দিতে। যখন মরা উচিত লোকে তখন মরে না—সে এই কথা অনেককেই বলতে শুনেছে—বরং তারা ম'রে যায় যখন তারা মরতে চায় তখনই, আর সে তার স্ত্রীর পূর্বাশঙ্কায় ভারি উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়লো। সে এমনকী এই কথাও ভাবলে, যখন সময় আসবে তখন সে সত্যি-সত্যি তার স্ত্রীকে জ্যান্ত কবর দিতে পারবে কি না।

যেখানে এককালে তার একটা দোকান ছিলো, ন-টার সময় সে তার ঝাঁপ খুললো। দরজার পাশেই সে রাখলে দুটো চৌকি আর একটা টেবিল, টেবিলের ওপরে রাখলে শতরঞ্জ ও চেকার খেলার চৌখুপি-কাটা একটা ছক, সারা সকালটা এখান দিয়ে যে-ই যায় তার সঙ্গেই সে চেকার খেলে কাটায়। নিজের বাড়িটা থেকে সে ভুতুড়ে পোড়ো শহরটার দিকে তাকালে: শহরের ভাঙা টুকরোগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে আছে, এখনও আগেকার বাহারি রংচঙের ঝাপসা চিহ্ন দেখা যায়, শহরটাকে ঠুকরে খেয়েছে সূর্য আর রাস্তার শেষে সমুদ্রের একটা চাং।

দুপুরের খাবার আগে, সবসময় যেমন করে, সে দোন মাহিমো গোমেসের সঙ্গে চেকার খেলে কাটালে। যে-লোক দু-দুটো গৃহযুদ্ধ অক্ষত টি'কে গিয়েছে, তৃতীয়টায় যে শুধু একটা চোখই খুইয়েছে, তার চেয়ে যাবতিক কোনো প্রতিপক্ষের কথা বুড়ো

হাকোব ভাবতেই পারে না। প্রথম দানটা সে ইচ্ছে ক'রেই হেরে গিয়ে আরেকটি দান খেলবার জন্তে সে দোন র্যাহিমোকে আটকে রাখলে।

'আচ্ছা, দোন র্যাহিমো, আমাকে একটা কথা বলুন তো,' তাঁকে সে শুধোলে তখন। 'আপনি কি আপনার স্ত্রীকে জ্যান্ত কবর দিতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই,' দোন র্যাহিমোর জবাব। 'যদি বলি যে আমার হাত তাতে একটুও কাঁপবে না, সে-কথা আপনি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন।'

বুড়ো হাকোব বিস্মিত একটা স্তব্ধতায় আছাড় খেলে। তারপর নিজের সেরা ঘুঁটিগুলোর সর্বনাশ ঘটিয়ে দিয়ে, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে:

'তা যেমন দেখছি, পেত্রা বোধহয় মরতে বসেছে।'

দোন র্যাহিমোর মুখের অভিব্যক্তি মোটেই পালটালো না। 'সেক্ষেত্রে,' তিনি বললেন, 'তো তাঁকে জ্যান্ত কবর দেবার কোনো কথাই ওঠে না।' দুটো ঘুঁটি খতম ক'রে তিনি একটা রাজা বানালেন। তারপর করুণ ঘোলাজলে ভেজা চোখটা তিনি প্রতিপক্ষের ওপর লেপটে রাখলেন।

'কী হয়েছে তাঁর?'

'কাল রাতে,' বুড়ো হাকোব ব্যাখ্যা ক'রে জানালে, 'ও গোলাপের গন্ধ পেয়েছে।'

'তাহ'লে আদ্ধেকটা শহরই মরতে বসেছে,' দোন র্যাহিমো গোমেস বললেন। 'আজ সকালে লোকে শুধু এই কথাই বলাবলি করছিলো।'

তাঁকে আহত না-ক'রে আবার হেরে-যাওয়া তারি কঠিন লাগলো বুড়ো হাকোবের। টেবিল আর চৌকিগুলো তারপর সে ভেতরে নিয়ে এলো, ঝাঁপ ফেললো তার দোকানে, আর তারপর বেরিয়ে গেলো সত্যি-সত্যি কে, বা কারা, গন্ধটা পেয়েছে তার খোঁজে। শেষটায় দেখা গেলো শুধু তোবিয়াসই একমাত্র নিঃসংশয়। কাজেই বুড়ো হাকোব তাকে বললে যে একবার যেন সে তার বাড়িতে আসে, যেন দৈবাৎই এসে পড়েছে এমন ভঙ্গি ক'রেই যেন আসে, আর তার স্ত্রীকে এ-সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলে

তাকে যা বলা হ'লো, তোবিয়াস ঠিক তা-ই করলে। চারটে নাগাদ, তার রবিবাসরীয় পোশাকে সেজেগুজে, সে এসে হাজির হ'লো পাতিওতে—সারা বিকেলটা সেখানে বুড়ো হাকোবের স্ত্রী বিপত্নীকের সাজপোশাক রিফু করেছে, গুছিয়ে রেখেছে।

তোবিয়াস এমন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিলো যে বুড়ো হাকোবের স্ত্রী চমকেই উঠেছিলো।

'দোহাই!' সে আঁৎকে বললে, 'আমি ভেবেছিলাম বুঝি দূতপ্রধান গাব-রিয়েল।'

'হয়, দেখতেই তো পাচ্ছো তা নয়,' তোবিয়াস বললে, 'এ শুধু আমি, আর আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।'

বুড়ো হাকোবের স্ত্রী চশমাটা ঠিক ক'রে প'রে আবার তার কাজে লেগে গেলো।

বললে: 'কী বলবে, আমি জানি।'

'বাজি ধ'রে বলতে পারি, জানো না,' তোবিয়াস বললে।

'কাল রাতে তুমি গোলাপের গন্ধ পেয়েছো।'

'তুমি কী ক'রে জানলে?' হার মেনে গিয়ে শুধোলে তোবিয়াস।

'আমার এই বয়েসে,' হাকোবের স্ত্রী বললে, 'ভাবনার জন্যে কারু হাতে এত সময় থাকে যে ইচ্ছে করলে কেউ পুরোদস্তুর প্রবক্তা হ'য়ে যেতে পারে।'

দোকানের ভেতরে হালকা দেয়ালটার গায়ে কান লাগিয়ে ব'সে ছিলো বুড়ো হাকোব, এবার সে লজ্জায় উঠে দাঁড়ালে।

'বুঝলে, মেয়ে,' দেয়ালের মধ্যে দিয়ে সে চ্যাচালে, তারপর ঘুরে বেরিয়ে এলো পাত্তিওতে। 'তুমি যা ভাবছো তা কিন্তু সত্যি নয়।'

'এই ছেলেটা মিছে কথা কইছে,' কাজ থেকে মাথা না-তুলেই বললে তার স্ত্রী। 'কিছুরই গন্ধ পায়নি এ।'

'পেয়েছি, রাত এগারোটা নাগাদ,' তোবিয়াস বললে, 'আমি তখন কাঁকড়াগুলো খেদাচ্ছি।'

বুড়ো হাকোবের স্ত্রী একটা গলবন্ধে তালি লাগানো শেষ করলে।

জোর দিয়ে বললে, 'মিছে কথা। সব্বাই জানে তোমার মাথায় নানা ফন্দি-ফিকির ঘোরে।' দাঁত দিয়ে সুতোটা কেটে সে চশমার ওপর দিয়ে তোবিয়াসের দিকে তাকালে।

'এখানে এসে আমায় যদি অশ্রদ্ধাই দেখাবে, তাহ'লে চুলেই বা তেল দিয়েছো কেন, আর জুতোজোড়াই বা অত পালিশ করেছো কেন—এই কথাটাই আমি বুঝতে পারছি না।'

সেই সময় থেকেই তোবিয়াস সমুদ্রের ওপর কড়া নজর রাখতে শুরু করলে। সে উঠোনের পাশে পাত্তিওতে তার দোলখাটিয়া টাঙায়, সারা রাত ধ'রে অপেক্ষা ক'রে থাকে, লোকে যখন ঘুমোয় তখন জগতে যা-সব কাণ্ড হয়, তা দেখে অবাক

হয়। অনেক রাতেই সে শুনতে পেয়েছে কাঁকড়াদের বয়ীয়া বুকে হাঁটার শব্দ, বিশেষ ক'রে তারা যখন দাঁড়া দিয়ে খুঁটিগুলো আঁকড়ে বেয়ে উঠতে চেষ্টা করে—তারপর এতগুলো রাত এমনভাবে কেটে গেলো যে তারা ক্লান্ত হ'য়ে চেষ্টা করাই ছেড়ে দিলে। ক্লোতিল্দের ঘুমের ধরনটাও জেনে গেলো তোবিয়াস। সে আবিষ্কার করলে, যখন গরম আরো অসহ্য হ'য়ে ওঠে তার বাঁশির মতো নাকের ডাক কী-রকম উঁচু পর্দায় ওঠে, তারপর জুলাইয়ের ঝিম-ধরা গরমে কেমন অলস বিলম্বিত একটা সুর হ'য়ে ওঠে।

গোড়ায় তোবিয়াস সমুদ্রের ওপর নজর রেখেছিলো যারা সমুদ্রকে ভালো ক'রে চেনে তাদের মতোই—দিগন্তে একটাই বিন্দুর ওপর স্থির আটকে রাখতো চোখ। তাকে সে দেখলো রং বদলাতে। দেখলো সেটাকে তার আলো নিভিয়ে ফেনিল আর ঘোলাটে হ'য়ে উঠতে, দেখলো যখন ঝড়তুফান তার পেটটায় মোচড় দেয় আর কেমন ক'রে সে আবর্জনায় ভরা ঢেকুর তোলে। আস্তে-আস্তে সে শিখে গেলো যারা আরো ভালো ক'রে সমুদ্রের ওপর নজর রাখতে পারে তাদের ধরন: তারা মোটেও দৃকপাতই করে না তার দিকে, অথচ এমনকী ঘুমের ঘোরেও কখনও তার কথাও ভুলেও যায় না।

বুড়ো হাকোবের স্ত্রী মারা গেলো আগস্টে। ঘুমের মধ্যেই মরলো সে, আর তারা অন্য-সকলের মতোই তাকেও কূলবিহীন এক সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলে। তোবিয়াস অপেক্ষা ক'রেই রইলো। অ্যাদ্দিন ধ'রে সে অপেক্ষা করছে যে অপেক্ষাটাই তার ধাঁচ হ'য়ে উঠছে। এক রাত্তিরে সে যখন তার দোলখাটিয়ায় ঢুলছে, সে টের পেলে হাওয়ায় যেন কিছু-একটা বদল হ'য়ে গেছে। সবিরাম একটা গন্ধের ঢেউ, থেমে-থেমে, আসছে—সেই যে-বার বন্দরের মুখটায় একটা জাপানি জাহাজ ধাক্কা লাগিয়েছিলো পচা পেঁয়াজে-ভরা মালবওয়া এক জাহাজের সঙ্গে, বন্দরের ঠিক মুখটায়, তারই মতো একটা ঢেউ। তারপর ঘন হ'য়ে গেলো গন্ধটা, আর ভোর না-হওয়া অব্দি রইলো নিশ্চল। শুধু যখন তার মনে হ'লো সে বুঝি এখন এটাকে হাতে ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারবে, তোবিয়াস লাফিয়ে নামলে তার দোলখাটিয়া থেকে আর গিয়ে হাজির হ'লো ক্লোতিল্দের ঘরে। সে তাকে ঝাঁকুনি দিলে।

বললে, 'এসেছে। এসে গেছে।'

উঠতে গিয়ে ক্লোতিল্দেকে মাকড়শার জালের মতো গন্ধটাকে ঝেড়ে ফেলতে হ'লো। তারপর সে তার তুলতুলে গরম তুলনির ওপর ধপ ক'রে পড়লো চিৎপাত।

বললে, 'ভগবান একে শাপ দিন।'

তোবিয়াস লাফিয়ে গেলো দরজার দিকে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে গিয়ে হল্লা জুড়ে দিলে। গায়ের জোরে সে চ্যাচালে, গভীর একটা দম নিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর একটু চুপচাপ, সে আরো গভীরভাবে শ্বাস টেনে নিলে, সমুদ্রের ওপর এখনও আছে গন্ধটা! কিন্তু কেউ তার চ্যাচামেচিতে সাড়া দিলে না। তারপর সে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো, যে-সব বাড়িতে লোক থাকে না, এমনকী সে-সব বাড়িতেও—তারপর তার হল্লাটা জট পাকিয়ে গেলো কুকুরের ডাকের সঙ্গে—আর সে সকলকে জাগিয়ে ফেললে।

তাদের অনেকেই গন্ধটা শুঁকে পেলে না। কিন্তু অন্তরা বিশেষ ক'রে বুড়োরা বেলাভূমিতে চ'লে গেলো গন্ধটা তারিয়ে-তারিয়ে চাখতে। আঁটো, সংহত, একটা সৌরভ, অতীতের আর-কোনো গন্ধের জন্যে সে একটুও ফাঁক রাখেনি। কেউ-কেউ, শুঁকে-শুঁকে এত ক্লান্ত ও অবসন্ন যে বাড়ি ফিরে গেলো। বেশির ভাগ লোকই তাদের রাতের ঘুমটা সারবার জন্যে বেলাভূমিতেই থেকে গেলো। ভোর নাগাদ গন্ধটা এমনই শুদ্ধ হ'য়ে উঠলো যে সে-গন্ধে শ্বাস নিতেও কেমন মন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছিলো।

দিনের বেশির ভাগটাই তোবিয়াস ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে। সিয়েস্তার সময় ক্লোতিল্‌দে তাকে পাকড়ালে, বিকেলটা তারা কাটালে বিছানায় হুল্লোড় ক'রে—উঠোনের দিকের দরজাটা অব্দি তারা বন্ধ করেনি। প্রথমে তারা প্রেম করলে কেন্নোদের মতো, তারপর যেমনভাবে করে খরগোশরা, শেষটায় কচ্ছপের মতো—যতক্ষণ-না বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলো পৃথিবী, আর তারপরেই অন্ধকার এসে হাজির। হাওয়ায় এখনও ফুলের গন্ধ—গোলাপের গন্ধের রেশ। মাঝে-মাঝে গানবাজনার ঢেউ এসে পৌঁছুচ্ছে শোবার ঘরে।

'সুরটা আসছে কাতারিনোর আখড়া থেকে,' ক্লোতিল্‌দে বললে। 'কেউ নিশ্চয়ই এসেছে শহরে।'

এসেছে তিনজন পুরুষ আর একজন মেয়ে। কাতারিনো ভেবেছিলো পরে হয়তো আরো অনেকে এসে হাজির হবে, চেষ্টা করেছিলো তার গ্রামোফোনটা সারাতে। যেহেতু তার পক্ষে সেটা মেরামত করা সম্ভব হ'লো না, সে পাকো আপেরিসিদোরকে অনুরোধ করলে, পাকো আপেরিসিদোর নিজের যেহেতু কোনো-কালেই কিছু ছিলো না সে সবরকম কাজ কারবার করে ফুটফরমাশ খাটে, তাছাড়া যন্ত্রপাতিভরা একটা বাক্স তার আছে, আছে একজোড়া চালাকচতুর হাত।

কাতারিনোর আখড়াটা একটা কাঠের বাড়ি, আলাদা, দূরে-সরানো, সমুদ্রের

দিকে মুখ খোলা। বেঞ্চি আর ছোটো-ছোটো টেবিল সাজানো একটা বড় ঘর, পেছনে রয়েছে আরো গোটা কতক শোবার ঘর। পাকো আর্গোরিসদোর কাজ দেখতে-দেখতে তিন পুরুষ আর এক মেয়ে চুপচাপ পানশালায় ব'সে পান ক'রে যাচ্ছিলো আর পালা ক'রে হাই তুলছিলো।

কয়েকবার চেষ্টার পর গ্রামোফোনটা ভালোই কাজ করলে। যখন তারা গানের সুর শুনতে পেলে, সুদূরাগত কিন্তু স্পষ্ট, লোকে কথাবার্তা থামিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালে। একটুক্ষণ তারা ভেবেই পেলে না কী বলবে, কারণ তখনই তারা টের পেয়েছে শেষ যে-বার তারা কোনো গান শুনেছিলো তারপরে এখন তারা কতটা বুড়িয়ে গেছে।

নটার পরেও তোবিয়াস দেখতে পেলে সবাই জেগে আছে। তারা দরজার কাছে ব'সে-ব'সে কাস্তারিনোর পুরোনো রেকর্ডগুলো শুনছে, লোকে যেভাবে গ্রহণ ভাখে তেমনি-একটা ছেলেমানুষি নিয়তিবাদের ভঙ্গি তাদের মুখে-চোখে। প্রত্যেকটি রেকর্ড তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে কোনো মৃতের কথা, দীর্ঘ রোগভোগের পর খাবারের স্বাদ, কিংবা পরদিন তাদের যা করবার কথা ছিলো অনেককাল আগে, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলো ব'লে সে-কাজ তারা করেনি।

গান থামলো এগারোটা নাগাদ। অনেকে শুতে চ'লে গেলো, ভাবলে বৃষ্টি পড়বে নিশ্চয়ই, কারণ সমুদ্রের ওপর একটা কালো মেঘ ঝুলছে। কিন্তু মেঘ নিচে নেমে এলো, জলের ওপর ভেসে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর টুপ ক'রে জলে ডুবে গেলো। ওপরে রইলো শুধু তারারাই। একটু পরে, শহর থেকে বেরিয়ে গেলো হাওয়া, ফিরে এলো গোলাপের গন্ধ নিয়ে।

'ঠিক যা আমি বলেছিলাম আপনাকে, হাকোব,' দোন মাহিয়ো গোয়েস বিস্মিত স্বরে ব'লে উঠলেন। 'আবার ফিরে এসেছে। ঠিক জানি এখন থেকে রোজ রাত্তেই আমরা গন্ধটা পাবো।'

'ভগবান না-করুন,' বললে বুড়ো হাকোব। 'ঐ গন্ধই আমার জীবনে একমাত্র জিনিশ যা বড্ড দেরি ক'রে এলো আমার কাছে।'

ফাঁকা দোকানঘরে ব'সে-ব'সে তারা চেকার খেলছিলো, রেকর্ডগুলোর দিকে তেমন-একটা মন দেয়নি। তাদের স্মৃতিগুলো এতই প্রাচীন যে এ-সব রেকর্ড সেই তুলনায় তেমন পুরোনো নয় যে তাদের মনে সাড়া তুলবে।

'আমার দিক থেকে বলতে পারি, এর কিছুই আমি বিশ্বাস করি না,' দোন মাহিয়ো গোয়েস বললেন। 'এত বছর ধ'রে ধুলো খাবার পর, কত-কত মেয়ে

যারা ফুলগাছ লাগাবে ব'লে একটুখানি জমি চাচ্ছিলো, এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে শেষটায় কেউ এ-রকম গন্ধ পাবে আর এমনকী এও ভেবে বসবে যে গন্ধটা বুঝি সত্যি।'

'কিন্তু আমরা তো নিজের নাকেই গন্ধটা পাচ্ছি,' বললে বুড়ো হাকোব।

'তাতে কিছু এসে-যায় না,' বললেন দোন সাবিনো গোমেস। 'যুদ্ধের সময়, বিপ্লব যখন হেরেই গিয়েছে, আমরা মনে-প্রাণে এমনভাবে একজন জেনারেলকে চাচ্ছিলাম যে আমরা দেখেছিলাম স্বয়ং ডিউক অভ মার্লবরো সশরীরে এসে হাজির। আমি নিজের চোখে তাঁকে দেখেছিলাম, হাকোব।'

তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। যখন একা হ'লো বুড়ো হাকোব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে বাতিটা নিয়ে গেলো শোবার ঘরে। জানলা দিয়ে—সমুদ্রের ফসফরের আলোয় রেখাস্বিত—সে দেখতে পেলে দূরের উত্তুঙ্গ পাহাড়চূড়া যেখান থেকে তারা মৃতদেহগুলো জলে ছুঁড়ে ফ্যালে।

'পেত্রা,' নরম স্বরে সে ডাক দিলে।

পেত্রা তাকে শুনতে পায়নি। সেই মুহূর্তে, সে প্রায় জলের ওপর দিয়েই ঝকঝকে মধ্যদিনের সূর্যের তলায় বঙ্গোপসাগর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলো। সে তার মাথা তুলেছিলো জলের মধ্য দিয়ে তাকাবে ব'লে, যেন কোনো অলৌকিক কাচে তৈরি প্রদর্শনীবাক্স, মস্ত একটা সাগরগামী জাহাজের দিকে। কিন্তু তার স্বামীকে সে দেখতে পায়নি, যে তখন জগতের অন্য প্রান্তে ফের শুনতে শুরু করেছে কাতারিনোর গ্রামোফোন।

'শুধু ভাবো একবার,' বুড়ো হাকোব বললে। 'ছ-মাসও কাটেনি তারা ভেবেছিলো তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, অথচ যে-গন্ধটা তোমার মরণ ডেকে আনলো তার উদ্দেশে তারা কিনা একটা উৎসব শুরু ক'রে দিয়েছে।'

আলো নিভিয়ে দিয়ে সে বিছানায় উঠে বসলো। খুব আস্তে-আস্তে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে, বুড়োদের ফোঁপানোর মধ্যে যে-রকম ছিরিছাঁদহীন কেমন-একটা কাৎরানির ভাব থাকে, সেইরকম। তবে একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

'পারলে এ-শহর ছেড়ে আমি চ'লে যেতাম,' ছটফট করতে-করতে সে ফোঁপায়। 'সোজা নরকেই চ'লে যেতাম, কিংবা অন্য-কোথাও, শুধু যদি কুললে কুড়িটা পেসো জোগাড় করতে পারতাম।'

সে-রাত্তির থেকে, কয়েক সপ্তাহ ধ'রে, গন্ধটা র'য়েই গেলো সমুদ্রে। গন্ধটা সেঁধিয়ে গেলো বাড়িঘরের কাঠ, খাবারদাবার, খাবার জলে: এই গন্ধের হাত থেকে

পালাবার কোনো উপায়ই ছিলো না। অনেকেই খাঁৎকে গিয়ে দেখলে তাদের ভয়ের তাপ থেকেও গন্ধটা উঠছে। যে-লোকগুলো আর মেয়েটি কাতারিনোর আখড়ায় এসেছিলো তারা এক শুক্রবারে চ'লে গেলো, কিন্তু শনিবারেই তারা ফিরে এলো সঙ্গে একটা ভিড় জমিয়ে। আরো-লোকজন এসে হাজির রোববারে। একেক জায়গায় একবার ঢুকছে একবার বেরুচ্ছে, পিঁপড়ের পালের মতো, কোথাও খেতে চায়, কোথাও চায় মাথা গোঁজার একটা আস্তানা, শেষটায় রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলাই অসম্ভব হ'য়ে উঠলো।

আরো লোক এলো। শহরটা যখন ম'রে গিয়েছিলো, তখন যে-মেয়েরা কেটে পড়েছিলো, তারা ফিরে এলো কাতারিনোর আখড়ায়। অনেক পৃথুলা তারা এখন, পুরু প্রলেপ লাগিয়েছে প্রসাধনে, তারা নিয়ে এসেছে একেবারে হাল আমলের অনেক রেকর্ড, যেগুলো কাউকেই কোনোকিছুর কথাই মনে করালো না। শহরের আগেকার বাসিন্দাদেরও কেউ-কেউ ফিরে এলো। তারা কুখ্যাত ও ক্রোড়পতি হ'তে গিয়েছিলো অন্যকোথাও, ফিরেও এলো তাদের ধনদৌলতের কথা বলতে-বলতে, তবে যে-পোশাক প'রে গিয়েছিলো সেই পোশাকেই তারা ফিরে এলো। এলো গানবাজনার দল, বাজিকর, খেলা দেখানেওলারা, ভাগ্যচক্রের পাক, ভাবীকথক আর বন্দুকবাজ, ঘাড়ে-গর্দানে পোষা সাপের পাক লাগিয়ে কেউ-কেউ বিক্রি করছিলো চিরযৌবনের অমৃতসালসা। অনেক সপ্তাহ ধ'রেই পর-পর এলো তারা, এমনকী প্রথম বৃষ্টি পড়বার পর সমুদ্র যখন ফুঁসে উঠেছে আর গন্ধ উধাও—তখনও তারা এলো।

শেষের দলে এসেছিলো এক পাদ্রে। সবখানে সে ঘুর-ঘুর করলে, সে রুটি খায় পাংলা কফিতে চুবিয়ে, আর একটু-একটু ক'রে সে—তার আগে যারা এসেছিলো তাদের সবকিছুর ওপর—জারি ক'রে দিলে নিষেধাজ্ঞা: ভাগ্যচক্র, নবগীতিকা, এবং তার সঙ্গে তাল রেখে যে-ভাবে নাচে লোকে তার ধরন, এমনকী খেলাভূমিতে গিয়ে শোবার নতুন অভ্যেসটা শুদ্ধ। একদিন সন্ধের, মেলচোরের বাড়িতে, সে সমুদ্রের গন্ধ নিয়ে কথামৃত শোনালে।

'শিশুগণ, তোমরা স্বর্গকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো,' সে বললে, 'কেননা ইহা স্বয়ং ঈশ্বরেরই সৌরভ।'

কেউ-একজন তাকে বাধা দিলে।

'তা আপনি কেমন ক'রে বলবেন, পাদ্রে? আপনি তো এখনও গন্ধটা শোঁকেনওনি।'

'বর্ণনায়,' পারে বললে, 'এই সৌরভ বিষয়ে অতীব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। আমরা একটি নির্বাচিত গ্রামে আছি।'

তোবিয়াস মেলায় এমনভাবে যাওয়া-আসা করছে যেন সে ঘুমের ঘোরে চলাফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে। একদিন সে ক্লোভিস্‌দেকে নিয়ে গেলো টাকা কাকে বলে দেখাতে। রুলেটের চাকা যখন ঘুরছে, তারা এলেবেলে ভান করলে যেন অনেক টাকা বাজি ধরেছে, তারপরে তারা অঙ্কগুলো সব যোগ ক'রে নিলে, আর নিজেদের মনে হ'লো বিরাট বড়োলোক—যে-টাকা তারা জুয়োয় জিতত্তে পা র তো, তার বলেই। কিন্তু একরাত্তিরে শুধু তারা নয় পুরো ভিড়টাই এক-জায়গায় এত টাকা দেখলে যে অত টাকা যে কোথাও থাকতে পারে তা-ই তারা কল্পনা করেনি।

সেই রাত্তিরেই এসেছিলেন মিস্টার হার্বার্ট। তিনি উদিত হলেন আচমকা, রাস্তার মাঝখানে একটা টেবিল পাতলেন, টেবিলের ওপর রাখলেন দুটি মস্ত তোরঙ্গ, যা থেকে তাড়া-তাড়া ব্যাঙ্কনোট উপচে পড়ছে। ওখানে যে অত টাকা ছিলো গোড়ায় তা কেউ খেয়ালও করেনি, এমন-যে কখনও সত্যি হ'তে পারে তা-ই তারা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু যখন মিস্টার হার্বার্ট একটা ঘণ্টা বাজাতে শুরু করলেন, তখন লোককে তা বিশ্বাস করতেই হ'লো, তারা তাঁকে শুনতে গেলো।

'পৃথিবীর মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড়োলোক,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'আমার এতই টাকা যে সে-টাকা রাখবার মতো জায়গাই পাচ্ছি না আমি। আর তা ছাড়া আমার দিলটাও এতই দরাজ যে আমার বুকে সে-টাকা রাখবার কোনো জায়গা নেই দেখে আমি ঠিক করেছি সারা জগতে ঘুরে-ঘুরে মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবো।'

মিস্টার হার্বার্ট লোকটা ঢ্যাঙা আর লালচে। তিনি কথা বলেন গাঁক-গাঁক ক'রে, তোড়ে, একবারও না-থেমে, সেইসঙ্গে তিনি নাড়েন ঈষদুষ্ণ নির্জীব একজোড়া হাত—দেখে মনে হয় এক্ষুনি যেন হাতের লোম কামানো হয়েছে। পনেরো মিনিট একনাগাড়ে কথা ব'লে তিনি জিরোলেন। তারপর তিনি ছোট্ট ঘণ্টাটি বাজিয়ে আবার কথা বলতে শুরু ক'রে দিলেন। তাঁর ভাষণের আদ্ধেক যখন হয়েছে, তখন ভিড়ের মধ্যে কেউ তার টুপি নেড়ে তাঁকে বাধা দিলে।

'শুনুন, মিস্টার, অত বুকনি না-ঝেড়ে টাকাটা বরং চটপট ছড়াতে শুরু ক'রে দিন।'

'অত তাড়া নয়,' মিস্টার হার্বার্ট জবাব দিলেন। 'কোনো যুক্তি-টুক্তির বালাই

না-রেখে শুধুশুধু টাকা ছড়ালেই কি হ'লো ? সে-যে শুধু বেআইনি কাজই হবে তা-ই নয়, তার কোনো মাথামুণ্ড মানেই থাকবে না।'

যে-লোকটা তাঁকে বাধা দিয়েছিলো তাকিয়ে তাকে বার ক'রে এগিয়ে আসতে ইশারা করলেন মিস্টার হার্বার্ট। ভিড় স'রে গিয়ে তাকে পথ ক'রে দিলে।

'অন্তদিক থেকে,' মিস্টার হার্বার্ট ব'লে চললেন, 'আমাদের এই ব্যগ্র ও অধীর বন্ধু নিশ্চয়ই আমাদের একটা সুযোগ দেবেন যাতে সম্পদের সমবণ্টন কী ক'রে সম্ভব সেটা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো যায়।' তিনি একটা হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে নিলেন।

'কী নাম তোমার ?'

'পাত্রিসিও।'

'আচ্ছা, পাত্রিসিও,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন, 'অন্য-সকলের মতোই তোমারও নিশ্চয়ই এমন-কোনো সমস্যা আছে তুমি অ্যান্দিনেও যার কোনো সুরাহা করতে পারোনি।'

পাত্রিসিও তার টুপিটা খুলে নিয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

'সেটা কী, শুনি ?'

'তো, আমার ক্যাসাদ হ'লো এটাই,' পাত্রিসিও বললে, 'যে আমার কোনো টাকা নেই।'

'কত চাই তোমার ?'

'আটচল্লিশ পেসো।'

মিস্টার হার্বার্ট একটা বিজয়ীর নিনাদ করলেন। 'আটচল্লিশ পেসো,' তিনি আওড়ালেন ফের। হাততালি দিয়ে। ভিড়ও তাঁর সঙ্গে হাততালি দিলে।

'খুব ভালো কথা, পাত্রিসিও,' মিস্টার হার্বার্ট ব'লে চললেন। 'এবার আমাদের একটা কথা বলো দেখি : তুমি কী করতে পারো ?'

'অনেক কিছু।'

'একটা-কিছু ঠিক ক'রে নাও,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন : 'এমনকিছু যা তুমি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারো।'

'বেশ,' পাত্রিসিও বললে। 'আমি অনেক পাখি করতে পারি।'

দ্বিতীয় দফা হাততালি দিয়ে মিস্টার হার্বার্ট ভিড়ের দিকে ফিরলেন।

'তাহ'লে, এবার, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান, আমাদের দোস্ত পাত্রিসিও, যে আশ্চর্য নকল করতে পারে পাখির ডাক, আমাদের এবার আটচল্লিশ রকম

ভিন্ন-ভিন্ন পাখির ডাক নকল ক'রে শোনাবে—আর এইভাবে তার জীবনের কঠিন মুশকিলটার আসান হ'য়ে যাবে।'

ভিড়ের চমকে-যাওয়া স্তব্ধতায় পাভ্রিদিও তখন তার পাখিদের নকল ক'রে শোনালে, কখনও শিস দিয়ে, কখনও গলা থেকে সব চেনা পাখিদের ডাক সে নকল করলে, তারপর শেষ করলে এমন-সব পাখির ডাক ডেকে কেউই যাদের শনাক্ত করতে পারলে না। যখন সে শেষ করলে, মিস্টার হার্বার্ট আরো একদফা হাততালির আহ্বান জানিয়ে, গুনে-গুনে আটচল্লিশটা পেসো দিলেন তাকে।

বললেন: 'আর এবার একজন-একজন ক'রে এসো। আগামী কাল এ-সময় অব্দি এখানে আমি থাকবো—সব মুশকিলই আসান ক'রে দেবো।'

বুড়ো হাকোব এই চাঞ্চল্য জানতে পারলে তার বাড়ির পাশ দিয়ে চলাফেরার সময় লোকের মন্তব্য থেকে। একেক টুকরো খবর পায় আর তার বুক ফুলে ওঠে—শেষটায় তার মনে হ'লো তার বুকটা বুঝি ফেটেই যাবে।

'এই গ্রিঙ্গোটি সম্বন্ধে আপনি কী ভাবছেন?' সে শুধোলে।

দোন মাহিমো গোমেস কাঁধ ঝাঁকালেন। 'নিশ্চয়ই কোনো দাতা-টাতা হবে।'

'ঈশ, আমি যদি একটা-কিছু করতে পারতাম,' বুড়ো হাকোব বললে। 'আমার ছোট্ট সমস্যাটার তবে এক্ষুনি সমাধান করতে পারতাম। খুব বেশি তো আর নয়—মাত্র কুড়ি পেসো।'

'আপনি তো চমৎকার চেকার খেলেন,' দোন মাহিমো গোমেস বললেন।

দেখে মনে হ'লো বুড়ো হাকোব বুঝি তার কথায় কোনোই কান দেয়নি, কিন্তু একা হবা মাত্র সে ছকটা আর শাদা-কালো খুঁটির বাক্সটা একটা খবর কাগজে জড়িয়ে মিস্টার হার্বার্টকে খেলায় চ্যালেঞ্জ করতে বেরিয়ে পড়লো। তার পালা আসার জন্যে সে মাঝরাত অব্দি অপেক্ষা ক'রে রইলো। শেষটায় মিস্টার হার্বার্ট তাদের দিয়ে তাঁর তোরঙ্গগুলো গুছিয়ে নিয়ে পরদিন সকাল অব্দি বিদায় জানালেন।

তিনি কিন্তু শুতে যাননি। যে-লোকগুলো তাঁর তোরঙ্গগুলো ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, আর যে-ভিড়টা তাঁর পেছন-পেছন সারাটা পথ তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আসছিলো, তাদের সবাইকে নিয়ে তিনি দেখা দিলেন কাতারিনোর আখড়ায়। একটু-একটু ক'রে তিনি সুরাহা ক'রেই চললেন সব সমস্যা, শেষটায় আখড়ার মধ্যে শুধু তারাই রইলো যে-সব লোকের সমস্যা আগেই মিটিয়ে দেয়া গেছে, আর রইলো কয়েকজন মেয়ে। আর ঘরের পেছনটায় একজন মেয়ে একা-একা ব'সে একটা কার্ডবোর্ডের বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেকে হাওয়া ক'রে যাচ্ছিলো।

'তোমার ব্যাপারটা কী?' মিস্টার হার্বার্ট তাকে লক্ষ্য ক'রে চ্যাচালেন। 'তোমার সমস্যাটা কী?'

মেয়েটি নিজেকে হাওয়া করা বন্ধ করলে।

'তোমার হুল্লোড়টার সঙ্গে আমাকে জড়াবার চেষ্টা কোরো না, মিস্টার গ্রিজো,' সে ঘরের ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে বললে। 'আমার কোনো সমস্যা নেই—আমি হচ্ছি বেশ্যা আর এ-সব আমার বিচি থেকে আসে।'

মিস্টার হার্বার্ট তাঁর কাঁধ ঝাঁকালেন। অন্য-সব সমস্যার জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে খোলা ভোরজগুলোর পাশে ব'সে তিনি ঠাণ্ডা বিয়ার খেয়ে চললেন। একটু পরে, পাশের টেবিলে মেয়েদের যে-দলটা বসেছিলো তাদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে উঠে এসে নিচু গলায় তাঁকে কী যেন বললে। তার একটা পাঁচশো পেসো বড়ো সমস্যা আছে।

'সেটা তুমি ভাগ করবে কী ভাবে?' মিস্টার হার্বার্ট তাকে জিগেশ করলেন।

'পাঁচ দিয়ে।'

'ভাবো একবার!' মিস্টার হার্বার্ট বললেন: 'সে তো একশোজন মরদ।'

'তাতে কিছু এসে-যায় না,' সে বললে। 'যদি সব টাকাটা তুলতে পারি তবে এরাই আমার জীবনের শেষ একশোজন মরদ হবে।'

মিস্টার হার্বার্ট তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। মেয়েটির কচি বয়েস, হাড়-গুলো যেন পলকা আর নরম, কিন্তু তার চোখে সরলসোজা একটা সিদ্ধান্তের ছাপ।

'ঠিক আছে,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি একজন একজন ক'রে পাঁচ পেসো দিয়ে তোমার ঘরে লোক পাঠাবো।'

রাস্তার দিকের দরজাটার কাছে গিয়ে তিনি তাঁর ছোট্ট ঘণ্টাটা বাজালেন।

সকালে, সাতটার সময়, তোবিয়াস দেখতে পেলে কাতারিনোর আখড়ার ঝাঁপ ওঠানো। সব আলো নেভানো। বিয়ারে ফুলে গিয়ে, আধো ঘুমের ঘোরে, মিস্টার হার্বার্ট মেয়েটির ঘরে লোকের ঢোকা নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তোবিয়াসও ভেতরে গেলো। মেয়েটি তাকে চিনতে পারলে: তাকে তার ঘরে দেখে ভারি অবাক হ'য়ে গেলো।

'তুমিও?'

'ওরা আমাকে বললে ভেতরে আসতে,' তোবিয়াস বললে। 'ওরা আমাকে পাঁচটা পেসো দিয়ে বললে বেশি সময় যেন না-নিই।'

মেয়েটি ভেজা চাদরটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে তোবিয়াসকে বললে অন্য

ধারটা ধরতে। একেবারে কেম্বিস কাপড়ের মতো ভারি হ'য়ে আছে চাদরটা। তারা দুটো কিনার ধ'রে সেটাকে পাকিয়ে নিংড়ে অবশেষে সেটার স্বাভাবিক ওজন ফিরিয়ে নিয়ে এলো। তারা জাজিমটাকে উলটে দিলে, আর জাজিম খুঁড়ে এ-পাশটাতেও ঘাম বেরিয়ে এলো। যতটা পারে ভালোভাবেই কাজগুলো সারলে তোবিয়াস। বেরিয়ে যাবার সময় সে বিছানার পাশে স্তূপ-ক'রে-রাখা নোটগুলোর ওপর পেসো পাঁচটা রাখলে।

'যত জনকে পারো পাঠিয়ে দিয়ো,' মিস্টার হার্বার্ট তাকে অনুরোধ করলেন। 'দেখি, দুপুরের আগেই ব্যাপারটার সুরাহা ক'রে চুকিয়ে ফেলা যায় কি না।'

মেয়েটি দরজাটা এক চিলতে ফাঁক ক'রে একটা ঠাণ্ডা বিয়ার চাইলো। তখনও কয়েকটি লোক অপেক্ষা ক'রে আছে।

'আর ক-জন বাকি?' মেয়েটি জিগেশ করলে।

মিস্টার হার্বার্ট উত্তর করলেন: 'তেষট্টি জন।'

বুড়ো হাকোব সারাটা দিন তাঁর অনুসরণ ক'রে বেড়ালো তার চেকার খেলার ছক নিয়ে। তার পালা এলো রাত্রি নামলে: সে তার জটিলতাটা সরাসরি টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলে, আর মিস্টার হার্বার্ট চ্যালেঞ্জটা নিলেন। রাস্তার মাঝখানে বড়ো টেবিলটার ওপর তারা দুটো চৌকি আর একটা ছোটো টেবিল পাতলো। আর প্রথম চালটা দিলে বুড়ো হাকোব নিজে। এটাই তার শেষ খেলা যেটা সে গোড়া থেকে নিজে ছ'কে নিয়েছিলো। সে হেরে গেলো।

'চল্লিশ পেসো,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'আর আমি আপনাকে দু-দুটো চালের হ্যাণ্ডিকাপ দেবো।'

মিস্টার হার্বার্ট আবারও জিতলেন। তাঁর হাত যেন ঘুঁটিগুলোকে ছোঁয়ই না। চোখ বেঁধে খেললেন তিনি, মনে-মনে অনুমান ক'রে নিলেন প্রতিপক্ষের সব চাল, আর তবু জিতলেন। দেখে-দেখে ভিড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। বুড়ো হাকোব যখন হাল ছেড়ে দিলে, তখন সে একুনে পাঁচ হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ পেসো ও তেইশ সেণ্ট ধার ক'রে ফেলেছে।

বুড়ো হাকোবের মুখের ভাবে কোনোই বদল হ'লো না। পকেটে তার যে একচিলতে কাগজ ছিলো তাতে সে-টাকার অঙ্কটা টুকে নিলে। তারপর সে ভাঁজ করলে তার শতরঞ্জের ছক, ঘুঁটিগুলো রাখলে তাদের বাক্সে, সবকিছু মুড়ে নিলে খবরকাগজে।

'আমাকে নিয়ে যা করতে মন চায়, করুন,' সে বললে, 'তবে এই জিনিশগুলো

আমায় রাখতে দিন। আপনাকে কথা দিচ্ছি ঐ পুরো টাকাটা জোগাড়ের ধান্দাতেই আমি আমার বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো।'

মিস্টার হার্বার্ট তাঁর ঘড়ি দেখলেন।

'আমি ভীষণ দুঃখিত,' বললেন তিনি। 'কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আপনার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে।' প্রতিপক্ষ যে সুরাহার কোনো পথ খুঁজে বার করতে পারেনি, সেটা নিশ্চিত বোঝবার জন্যে অপেক্ষা করলেন মিস্টার হার্বার্ট। 'বদলি হিশেবে দিতে পারেন, এমন আর-কিছু নেই আপনার?'

'আমার মান সম্মান। ইজ্জৎ।'

'আমি বলতে চাচ্ছি,' মিস্টার হার্বার্ট ব্যাখ্যা করলেন, 'আপনার কি এমন-কিছু আছে একটা রং-মাখা তুলি বোলাবামাত্র যার রং পালটে যায়?'

'আমার বাড়ি,' বুড়ো হাকোব এমনভাবে বললে যেন সে কোনো হেঁয়ালির জট ছাড়াচ্ছে। 'খুব-একটা দাম নেই তার, তবে তবু একটা বাড়ি তো।'

এইভাবেই মিস্টার হার্বার্ট বুড়ো হাকোবের বাড়িটার দখল নিয়ে নিলেন। অন্য যারা ধার শুধতে পারেনি তাদেরও বাড়ি-ঘর সম্পত্তির দখল নিয়ে নিলেন তিনি; তারপর এক সপ্তাহ ধ'রে গানবাজনা, রোশনি, আতশবাজি, বাজিকরদের খেলার আয়োজন করলেন তিনি, পুরো হল্লোড়টার দায়িত্বে রইলেন নিজে স্বয়ং।

মনে রাখবার মতো একটা সপ্তাহ সেটা। মিস্টার হার্বার্ট শহরের অলৌকিক ভবিতব্যের কথা বললেন, এমনকী নকশা এঁকে বুঝিয়ে দিলেন ভবিষ্যতের শহরটা কেমন হবে, মস্ত-মস্ত সব কাচের দালানকোঠা, ওপরে নাচমঞ্চ। ভিড়কে সেটা তিনি দেখালেনও। তারা তাজ্জব হ'য়ে তাকিয়ে দেখলো সব, চেষ্টা করলো মিস্টার হার্বার্টের রং-বেরঙে ঝলমলে যে-পথচারীদের দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে নিজেদের আবিষ্কার করতে, কিন্তু সেই পথচারীরা এমন শৌখিন সেজে আছে যে তারা নকশাটার মধ্যে নিজেদের আর শনাক্তই করতে পারলে না। তাঁকে এত কাজে লাগাতে তাদের ভারি কষ্টও হচ্ছিলো। যার তাড়ায় অক্টোবরে ফিরে কাঁদতে হবে, সেই তাড়াটা নিয়ে তারা হাসাহাসি করলে; এই আশার কুয়াশার মধ্যেই তারা বাঁচছিলো, এমন সময় মিস্টার হার্বার্ট তাঁর ছোট্ট ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষণা করলেন যে, ব্যাস, আসর খতম, হল্লোড় এখন শেষ। শুধু তখনই তিনি খানিকটা বিশ্রাম পেলেন।

'যেভাবে আপনি জীবন কাটাচ্ছেন, তাতে সেই জীবনই আপনার মরণ ঘটাবে,' বুড়ো হাকোব বললে।

'আমার এতই টাকা যে আমার ম'রে যাবার কোনো কারণই নেই,' বললেন মিস্টার হার্বার্ট।

ধপ ক'রে নেতিয়ে পড়লেন তিনি বিছানায়। একনাগাড়ে ঘুমিয়েই চললেন দিনের পর দিন, সিংহের মতো নাক ডাকছে; এইভাবে এতদিন কেটে গেলো যে লোকে শেষটায় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে কাঁকড়াদের বার ক'রে খেতে হ'লো তাদের। কাতারিনোর নতুন রেকর্ড-গুলো অবি এত পুরোনো হ'য়ে গেলো যে চোখের জল না-ফেলে কেউ আর এখন তাদের শুনতে পারে না—ফলে তাকে তার আখড়ার ঝাঁপ ফেলে দিতে হ'লো।

মিস্টার হার্বার্ট ঘুমিয়ে পড়বার অনেককাল পরে পাদ্রে এসে বুড়ো হাকোবের দরজায় ঘা দিলে। বাড়িটা ভেতর থেকে কুলুপ আঁটা। ঘুমন্ত লোকটার শ্বাসপ্রশ্বাস এতটাই হাওয়া নিয়ে নিচ্ছে যে জিনিশপত্তর সব তাদের ওজন হারিয়ে ভেসে বেড়াতে শুরু করেছে।

'তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই আমি,' পাদ্রি বললে।

বুড়ো হাকোব জানালে, 'আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'হাতে বেশি সময় নেই আমার।'

'বসুন, পাদ্রে, সবুর করুন,' বুড়ো হাকোব ফের জানালে। 'আর এই ফাঁকে বরং আমার সঙ্গেই কথা বলুন। জগতে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, আমি তা আর জানি না—অনেক দিন ধ'রেই জানতে পারিনি।'

'লোকেরা সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে,' পাদ্রে বললে। 'শহরটার আর আগের মতো হ'য়ে উঠতে খুব বেশি দেরি হবে না। সেটাই একমাত্র নতুন খবর।'

'সমুদ্র থেকে আবার যখন গোলাপের গন্ধ ছড়াবে তখন ওরা সবাই ফের ফিরে আসবে,' বুড়ো হাকোব বললে।

'কিন্তু এর মধ্যে, যারা থেকে গেছে তাদের মোহ-বিভ্রম জিইয়ে রাখবার জন্যে কিছু-একটা চাই তো,' পাদ্রি বললে। 'গির্জেটা বানানো এখন খুবই জরুরি।'

'সেইজন্যেই আপনি মিস্টার হার্বার্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?' বুড়ো হাকোব বললে।

'ঠিক,' বললে পাদ্রে। 'গ্রিঙ্গোরা ভারি দাতা হয়।'

'তাহ'লে, পাদ্রে, একটু সবুর করুন,' বুড়ো হাকোব বললে। 'উনি হয়তো এখুনি জেগে উঠবেন।'

তারা চেকার খেললো। ভারি দীর্ঘ আর জটিল হ'লো খেলাটা, বেশ কয়েক-

দিন ধ'রে একটানা খেলা চললো, তবু মিস্টার হার্বার্টের জাগবার কোনো লক্ষণই নেই।

হতাশায় মরিয়া, পাদ্রের মধ্যে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেলো। সে একটা তামার রেকাবি হাতে ক'রে সবখানে ঘুরে বেড়ালে, গির্জে বানাবার জন্যে দান চাই, কিন্তু খুব-একটা চাঁদা উঠলো না। এত ভিক্ষে চেয়ে-চেয়ে সে ক্রমেই আরো-বেশি স্বচ্ছ টলটলে হ'য়ে উঠছিলো, তার হাড়গোড়গুলো ভ'রে যাচ্ছিলো শব্দে-ধ্বনিতে, আর এক রোববারে সে মাটি থেকে দু-হাত ওপরে উঠে গেলো, কিন্তু কেউই সেটা খেয়াল করলে না। তারপর সে একটা স্যুটকেসে তার কাপড়-চোপড় আর আরেকটা স্যুটকেসে চাঁদার টাকা বোঝাই ক'রে চিরকালের মতো বিদায় জানালে।

'ঐ গন্ধ আর ফিরে আসবে না,' যারা তাকে বিরক্ত করতে চাচ্ছিলো তাদের বললে পাদ্রে। 'তোমাদের এই তথ্যটার মুখোমুখি হওয়া উচিত যে শহরটা চরম পাপে প'ড়ে আছে।'

মিস্টার হার্বার্ট যখন জেগে উঠলেন শহরটা আগে যেমন ছিলো তেমনি হ'য়ে উঠেছে। রাস্তায়-রাস্তায় ভিড় যে-আবর্জনা ছড়িয়েছিলো বৃষ্টি তা গাঁজিয়ে দিয়েছে; মাটি আবারও ইটের মতো কঠিন আর ঊষর।

হাই তুলে, মিস্টার হার্বার্ট বললেন: 'অনেকদিন ঘুমোলাম।'

'কয়েক শতাব্দী,' বললে বুড়ো হাকোব।

'খিদের ম'রে যাচ্ছি।'

'ম'রে যাচ্ছে অন্য সকলেও,' বললে বুড়ো হাকোব। 'সমুদ্রের তীরে গিয়ে মাটি খুঁড়ে কাঁকড়া বার করা ছাড়া আর-কোনো খাবার নেই।'

তোবিয়াস তাঁকে দেখতে পেলে দু-হাত দিয়ে বালি আঁচড়াচ্ছেন, মুখ থেকে ফেনা বেরিয়ে আসছে, আর সে অবাক হ'য়ে আবিষ্কার করলে যখন বড়ো-লোকেরা খিদের চোটে হ'য়ে যায় তখন তাদের ঠিক গরিবগুরবোদের মতোই দেখায়। মিস্টার হার্বার্ট যথেষ্ট কাঁকড়া পেলেন না। রাত্তিরে তিনি তোবিয়াসকে আমন্ত্রণ করলেন সমুদ্রের তলায় কোনো খাবার পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখতে তাঁর সঙ্গে যেতে।

'শুনুন,' তোবিয়াস তাঁকে হুঁশিয়ারি দিলে, 'ঐ তলায় কী আছে না-আছে তা শুধু মড়ারাই জানে।'

'বৈজ্ঞানিকরাও জানে,' বললেন মিস্টার হার্বার্ট। 'জলে-ডোবা মানুষদের

যে-সমুদ্র, তার তলায় থাকে কাছিমরা—চমৎকার তাদের মাংস, খোকা। কাপড় খোলো, আর চলো, ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

ঝাঁপিয়েই পড়লো দুজনে। গোড়ায় তারা সোজা নাকবরাবর সাঁৎরে গেলো, তারপর ডুব দিলে খুব গভীর জলে, যেখানে সূর্যের আলোই পৌঁছোয় না, তারপর যেখানে সমুদ্রের আলোও আর নেই, সবকিছু যেখানে দেখা যায় যার-যার আপন আলোয়। তারা একটা জলে-ডোবা গ্রাম পেরিয়ে গেলো, যেখানে ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে নরনারী, গানের শামিয়ানার চারপাশে। চমৎকার দিনটা, অলিন্দে পাত্তিওতে ঝলমলে সব ফুল ফুটে আছে।

'সকাল এগারোটা নাগাদ ডুবে গিয়েছিলো এই রোববারটা,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'নিশ্চয়ই কোনো মহাপ্লাবন হয়েছিলো।'

তোবিয়াস গ্রামটার দিকে যাবে ব'লে ঘুরেছিলো, কিন্তু মিস্টার হার্বার্ট ইশারায় বললেন আরো নিচে যেতে।

'গোলাপ ছিলো ওখানে,' তোবিয়াস বললে। 'আমি ক্লোতিল্‌দেকে জানাতে চাচ্ছিলাম, গোলাপ কাকে বলে।'

'অবসরমতো আবার তুমি এখানে এসো একদিন,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'এখন আমি খিদেয় ম'রে যাচ্ছি।'

তিনি নিচে নামলেন কোনো অক্টোপাসের মতো, হাত দিয়ে জল ঠেলছেন মন্থর চোরা ভঙ্গিতে। তোবিয়াস খুব চেষ্টা করছিলো তাঁকে চোখে-চোখে রাখতে, দৃষ্টি থেকে না-হারাতে, ভাবছিলো এইভাবেই নিশ্চয়ই বড়োলোকেরা সাঁতার দেয়। একটু পরে তারা পেছনে রেখে এলো সাধারণ সব সর্বনাশের সমুদ্রকে, এসে পৌঁছুলো মৃতদের সমুদ্রে।

সেখানে এত মড়া যে তোবিয়াস ভাবলে পৃথিবীতেও সে কখনও এত লোক ছাখেনি। তারা ভাসছে নিশ্চল, চিৎপাত, বিভিন্ন স্তরে, প্রত্যেককেই দেখাচ্ছে যেন হারিয়ে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া আত্মা।

'এরা খুবই পুরোনো মড়া,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'এই শান্ত-সমাহিত অবস্থায় এসে পৌঁছুতে এদের অনেক শতাব্দী লেগেছে।'

আরো নিচে, সাম্প্রতিক মৃতদের জলে এসে, মিস্টার হার্বার্ট থামলেন। যেই তোবিয়াস তাঁর নাগাল ধ'রে ফেললে অমনি তাদের সামনে দিয়ে পরমা রূপসী ভারি কচি একটি মেয়ে ভেসে চ'লে গেলো। সে ভাসছে একপাশ ফিরে, তার চোখ দুটি খোলা, পেছন-পেছন ভেসে আসছে ফুলে-ফুলে ভরা স্রোত।

যতক্ষণ-না শেষ ফুলটা ভেসে চ'লে গেলো, মিস্টার হার্বার্ট ঠোঁটে আঙুল তুলে রইলেন।

বললেন : 'জীবনে যত মেয়ে দেখেছি তার মধ্যে এই-ই হ'লো সবচেয়ে সুন্দরী।'

'বুড়ো হাকোবের বৌ ও,' তোবিয়াস বললে, 'তার চেয়ে অন্তত পঞ্চাশ বছরের কচি হবে—তবে এ-ই সে। আমি ঠিক জানি।'

'অনেক ভ্রমণ করেছে সে,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'পেছনে যে-ফুল নিয়ে এসেছে, সে-ফুল জগতের সব সমুদ্রের ফুল।'

তারা তলায় এসে পৌঁছুলো। ঝকঝকে মসৃণ স্লেটের মতো মাটিতে বার কয়েক ডিগবাজি খেলেন মিস্টার হার্বার্ট। তোবিয়াসও তাঁরই অনুসরণ করলে। যখন সে গভীরের অর্ধেক আলোয় অভ্যস্ত হ'য়ে গেলো শুধু তখনই সে আবিষ্কার করলে যে কাছিমরা সবাই আছে এখানে, হাজার-হাজার কাছিম, এই তলায় তারা চ্যাপটা হ'য়ে গিয়েছে, এমনই নিশ্চল যে মনে হচ্ছে তারা যেন পাথরের মতো অভিভূত হ'য়ে আছে।

'ওরা জ্যান্তই,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন, 'তবে কোটি-কোটি বৎসর ধ'রে ঘুমিয়ে আছে।'

একটাকে তিনি চিৎ ক'রে ফেললেন। হালকা একটা ঠেলা দিলেন তাকে ওপরমুখো আর ঘুমন্ত প্রাণীটি তাঁর হাত থেকে স'রে গিয়ে ওপরে ভেসে উঠতে লাগলো। তোবিয়াস তাকে যেতে দিলে। তারপর সে তাকিয়ে দেখলে ওপরতলটা, আর দেখতে পেলে পুরো সমুদ্রটাই যেন ডিগবাজি খেয়ে আছে।

'স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে,' সে বললে।

'তোমার নিজের ভালোর জন্তেই,' মিস্টার হার্বার্ট বোঝালেন, 'কাউকে এ-কথা বোলো না। লোকে যদি এ-সব কথা জেনে ফ্যালে তাহ'লে পৃথিবীতে কী-হুলুস্থুল প'ড়ে যাবে সেটা একবার ভাবো।'

যখন তারা গ্রামে ফিরে এলো তখন প্রায় মাঝরাত। স্রোতিলদেকে জাগিয়ে তারা একটু জল গরম করতে বললে। মিস্টার হার্বার্ট কাছিমটা কাটলেন কশাইয়ের মতো, কিন্তু হৃৎপিণ্ডটা তাড়া ক'রে গিয়ে দ্বিতীয়বার সেটা মারতে তাদের তিনজনকেই ছুটোপাটি করতে হ'লো, কারণ যখন তাকে কাটা হচ্ছিলো হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে চ'লে গিয়েছিলো উঠোনে। অনেকক্ষণ ধ'রে তারা গবগব ক'রে খেলে, তারপর এত খেয়ে আর দম নিতেও পারে না যেন।

'তোবিয়াস,' অতঃপর বললেন মিস্টার হার্বার্ট, 'এবার তো আমাদের বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।'

'নিশ্চয়ই।'

'আর বাস্তব বলে,' মিস্টার হার্বার্ট ব'লেই চললেন, 'যে গন্ধটা আর ফিরে আসবে না।'

'আসবে। ফিরবেই।'

'আর ফিরে আসবে না,' ক্লোতিল্‌দে বললে, 'অন্তকারণ বাদ দাও—এ তো এমনিতেই কোনোদিন সত্যি-সত্যি আসেনি। তুমিই শুধু সব্বাইকে তাতিয়ে তুলেছিলে।'

'তুমি নিজেও তো গন্ধটা পেয়েছো,' তোবিয়াস বললে।

'সে-রাতে আমি আদ্ধেক ঘোরের মধ্যে ছিলাম,' বললে ক্লোতিল্‌দে। 'কিন্তু এখন—এখন আমি ঠিক জানি না তার সঙ্গে সমুদ্রের কোনো যোগ ছিলো কি না।'

'তাহ'লে আমি আমার পথ দেখি,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'আর,' দুজনকেই লক্ষ্য ক'রে আরো জুড়ে দিলেন : 'তোমাদেরও এখান থেকে চ'লে-যাওয়া উচিত। এই শহরে না-খেয়ে মরার চাইতে, পৃথিবীতে তোমাদের কতকিছু করার আছে।'

মিস্টার হার্বার্ট চ'লে গেলেন। তোবিয়াস উঠোনেই থেকে গেলো, দিগন্ত অব্দি এক-এক ক'রে গুনলো তারাগুলো, আর আবিষ্কার করলো যে গত ডিসেম্বরের চাইতে এখন আকাশে তিনটে বেশি তারা। ক্লোতিল্‌দে তাকে শোবার ঘর থেকে ডাক দিলে, কিন্তু সে তাতে কোনো কান দিলে না।

'এখানে এসো, গাড়ল কোথাকার,' ক্লোতিল্‌দে চাপ দিলে। 'খরগোশের মতো করি না সে-যে কত বছর হ'য়ে গেলো!'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে তোবিয়াস। যখন সে শেষকালে ঘরে গেলো, ক্লোতিল্‌দে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আদ্ধেক জাগালে সে তাকে, কিন্তু ক্লোতিল্‌দে এতই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো যে দুজনেই সব কেমন যেন জট পাকিয়ে ফেললে—শেষটায় নিছক কেন্নোদের মতোই তারা আমোদ করতে পারলে।

'হাঁদার মতো ভাব করছো তুমি,' ঠোঁট ফুলিয়ে বললে ক্লোতিল্‌দে। 'অন্তকিছু ভাবার চেষ্টা করো।'

'আমি অন্তকিছুর কথাই ভাবছি।'

ক্লোতিল্‌দে জানতে চাইলো সেই অন্তকিছুটা কী, আর তোবিয়াস ঠিক করলে

তাকে সে বলবে তবে একটা শর্তে—সে আর-কাউকে সে-কথা বলবে না। জোভিনুনে কথা দিলে।

'সমুদ্রের তলায় না একটা গ্রাম আছে,' তোবিয়াস বললে, 'ছোটো-ছোটো শাদা-শাদা বাড়ি, অলিন্দে পাতিওর লক-লক ফুল।'

জোভিনুনে দু-হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরলে।

'ওহ্, তোবিয়াস,' সে যেন আর্তনাদ ক'রেই উঠলো, 'ওহ্, তোবিয়াস, ভগবানের দোহাই, আবার ঐ গণ্ডগোল পাকিয়ে বোসো না।'

তোবিয়াস আর-কিছুই বললে না। বিছানার একপাশে সে গড়িয়ে গেলো, চেষ্টা করলে ঘুমিয়ে পড়তে। তবে ভোরের আগে সে ঘুমোতেই পারলে না—শুধু যখন ভোরবেলায় হাওয়া দিক বদলালো শুধু তখনই কাঁকড়ারা তাকে শান্তিতে ঘুমোতে দিলো।

১৯৬১

জগতের সবচেয়ে-সুন্দর জলে-ডোবা পুরুষ

ছোটোদের গল্প

যে-বাচ্চারা প্রথম দেখেছিলো ঐ কালো আর চুপি-চুপি-আসা ফোলা-ফোলা জিনিশটা সমুদ্দুরের মধ্য থেকে আসছে, তারা গোড়ায় নিজেদের বুঝিয়েছিলো এ নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের কোনো জাহাজ। তারপর তারা দেখতে পেলে যে এর কোনো নিশেনও নেই কিংবা নেই এমনকী মাস্তলও, তখন তারা ভাবলে যে এ নিশ্চয়ই কোনো তিমিতিমি। কিন্তু ঢেউ যখন সেটা ধুক্তে-ধুক্তে আছড়ে এনে ফেললো বেলাভূমিতে, তারা সরালে শ্যাওলার আস্তর, জেলিমাছের সব কষিক আর মাছ আর জাহাজডুবির টুকিটাকি যা লেগে আছে গায়ে, আর তখনই তারা দেখতে পেলে এ-যে এক ডুবে-যাওয়া পুরুষমানুষ।

সারা বিকেলটা তারা তাকে নিয়ে খেলেছিলো, কবর দিচ্ছিলো তাকে বালিতে, ফের তাকে খুঁড়ে-খুঁড়ে তুলছিলো, এমন-সময় দৈবাৎ কে-একজন তাদের দেখতে পেলে আর গাঁয়ে গিয়ে বিপদের সংকেত ছড়িয়ে দিলে। যে-পুরুষরা তাকে ধরাধরি ক'রে সবচেয়ে কাছের বাড়িটায় নিয়ে এলো তারা খেয়াল করলে যে অ্যাদ্দিন তারা যত-সব মৃতদেহ দেখেছে তাদের সকলের চাইতেই এ-লাশটার ওজন অনেক বেশি, প্রায় কোনো-একটা ঘোড়ারই মতো ওজন, আর তারা পরস্পরকে বললে হয়তো সে অনেকদিন ধ'রেই জলে ভাসছিলো, আর তাইতে এমনকী তার হাড়ের মধ্যেও বোধহয় জল ঢুকে গিয়েছে। তারা তখন লাশটাকে মেঝের শুইয়ে দিলে আর তারা বলাবলি করলে সব লোকের চাইতেও এ-যে দেখছি লম্বা, ঘরটায় সে প্রায় আঁটেই না যে; তবে, তারা ভাবলে, হয়তো কোনো-কোনো ডুবে-মরা মানুষের প্রকৃতিই থাকে মৃত্যুর পরেও কেবলই বড়ো-হ'তে-থাকা। গায়ে তার দূর সিন্ধুর গন্ধ, শুধু তার আকৃতি দেখেই কেউ আন্দাজ ক'রে নিতে পারে যে সে এক মানুষেরই লাশ, কারণ চামড়াটা তার কাদা আর আঁশের একটা শক্ত আস্তরে ঢেকে গিয়েছে:

মৃত লোকটা যে অচেনা-কেউ, এটা জানবার জন্যে তাদের এমনকী তার মুখটাও ধুয়ে-মুছে সাফ করতে হ'লো না। গ্রামটা গ'ড়ে উঠেছে শুধুমাত্র বিশ-পঁচিশটা

কাঠের বাড়িতে ; সে-সব বাড়ির উঠোন শান-বাঁধানো, কিন্তু কোথাও কোনো ফুল নেই, আর গ্রামটা ছড়িয়ে গেছে কোনো-একটা অন্তরীপের মরুভূমির মতো ঊষর প্রান্তে। তারা এখানে এতই কম যে মায়েরা সবসময়েই ভয়ে-ভয়ে থাকে কখন হাওয়া এসে তাদের ছেলে-মেয়েদের উড়িয়ে নিয়ে যায়, আর বছরগুলো তাদের মধ্যে যে-কজনকে এখানে সাবাড় করেছে, তাদের তীরের পাহাড় থেকে জলে ছুঁড়ে ফেলতে হয়েছে, কিন্তু সমুদ্র এখানে শান্ত, নিস্তরঙ্গ ও সুন্দর, আর সাত-সাতটা নৌকোতেই গ্রামের সবাই এঁটে যায়। কাজেই যখন তারা এই ডুবন্ত লোকটাকে আবিষ্কার করলে, পরস্পরের দিকে শুধু একবার তাকিয়েই তারা নিশ্চিত হ'য়ে নিলে যে সকলেই তারা এখানে আছে।

সে-রাতে তারা আর সমুদ্রে কাজ করতে গেলো না। যখন লোকে হদিশ নিতে গেলো যে আশপাশের গাঁগুলো থেকে কেউ হারিয়ে গেছে কি না, মেয়েরা থেকে গেলো পেছনে, এই ডুবন্ত লোকটার যত্ন-আত্তি করবার জন্যে। ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঘ'লে-ঘ'লে তারা তার গা থেকে কাদা তুলে নিলে, তারা সরিয়ে দিলে জলের তলার যে-সব নুড়িপাথর তার চুলে জট পাকিয়ে ছিলো, আর যা দিয়ে তারা মাছের আঁশ ছাড়ায় তা-ই দিয়ে তারা তার গায়ের শক্ত আস্তরটা চেঁছে নিলে। এ-সব করতে-করতেই তারা খেয়াল ক'রে দেখলো যে উদ্ভিদ বা শ্যাওলা যা তার গায়ে লেপটে আছে সে-সব এসেছে দূর-দূরান্তরের সাগর থেকে, গভীর জল থেকে, তার জামাকাপড় সব ফালি-ফালি ছিলতে মাত্র, যেন সে প্রবালের গোলকধাঁধার মধ্য দিয়েই পাল খাটিয়ে গিয়েছিলো। তারা আরো-খেয়াল করলো যে সে মৃত্যু বহন করেছে সগর্বেই, কারণ অন্ত-যে-সব ডুবে-যাওয়া লোক আসে সমুদ্র থেকে সে-রকম কোনো নিঃসঙ্গ ভঙ্গি তার নেই, কিংবা নেই সেই কোটরে-বসা খ্যাপা কাতর চোখ যারা ডুবে মরে নদীতে। তবে শুধু যখন তারা তাকে আপাদমস্তক সাফ করলে তখনই আবিষ্কার করলে কেমনতর পুরুষ ছিলো সে আসলে, আর এই আবিষ্কার যেন তাদের দম আটকে দিলে। তাদের দেখা সব পুরুষের মধ্যে সে-যে শুধু সবচেয়ে লম্বা, বলবান, তেজস্বী আর সবচেয়ে সুঠাম সুগঠন পুরুষ ছিলো তা-ই নয়, আরো-কিছু-একটা ছিলো যেন তার মধ্যে ; তবে যদিও তারা তার দিকে হা ক'রে তাকিয়ে ছিলো তাদের কল্পনায় কিন্তু তার জন্যে কোনো ঠাঁই ছিলো না।

সারা গাঁ খুঁজে তারা এমন-একটা বড়ো বিছানা পেলে না যার ওপর তারা তাকে শোয়াতে পারে কিংবা কোনো শক্তপোক্ত টেবিলও মিললো না যেটা তারা

ব্যবহার করতে পারে মৃতদেহের নিশিজাগরের সময়। সবচেয়ে ঢ্যাঙা লোকের ছুটির দিনের পাৎলুনও তার গায়ে লাগে না, সবচেয়ে ধৌংকা লোকের রোববারের জামাও তার খাটো হয়, আর সবচেয়ে বড়োমাপের পায়ের জুতোতেও তার পা গলে না। তার এই অতিকায় আকৃতি আর রূপে মোহিত হ'য়ে, মন্ত্রমুগ্ধ মেয়েরা ঠিক করলে মস্ত একটা পালের কেম্বিস কাপড় দিয়ে তারা তার জন্যে একটা পাৎলুন বানাবে, আর একটা জামা বানাবে কারু বিয়ের মূল্যবান ক্ষৌম বস্ত্রে, যাতে সে মৃত্যুর মধ্যেও নিজের মর্যাদা বজায় রেখে শুয়ে থাকতে পারে। গোল হ'য়ে ঘিরে ব'সে তারা যখন সেলাই করছে, আর সেলাইয়ের ফোঁড়ের মাঝে-মাঝে লাশটার দিকে তাকাচ্ছে, তখন তাদের মনে হ'লো সে-রাত্রির মতো হাওয়া যেন কখনও এমন অস্থির ছিলো না অথবা সমুদ্রও এমন অশান্ত ছিলো না, আর তারা আন্দাজ করলে এই বদলের সঙ্গে এই মৃতদেহের কোনো সম্বন্ধ আছে নিশ্চয়ই। তারা ভাবলে যে যদি এই গরীয়ান পুরুষ তাদের গাঁয়ে থাকতো, তবে তার বাড়ির দরোজা হ'তো সবচেয়ে প্রশস্ত, ছাত হ'তো সবচেয়ে উঁচু, মেঝে হ'তো সবচেয়ে পোক্ত, তার খাট বানানো হ'তো কোনো জাহাজের পাটাতন দিয়ে যেটা লোহার বল্টু দিয়ে লাগানো থাকতো, আর তার স্ত্রী নিশ্চয়ই হ'তো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মেয়ে। তারা ভাবলে, তার নিশ্চয়ই এতটাই কর্তৃত্ব থাকতো যে সে সমুদ্র থেকে মাছ নিয়ে আসতে পারতো শুধু তাদের নাম ধ'রে ডেকে-ডেকেই আর সে তার জমিতে এতই কাজ করতো যে পাথরের মধ্য থেকেও নিশ্চয়ই ফেটে বেরুতো ফোয়ারা, যাতে সে তীরের শৈলশিরায় বুনে দিতে পারতো ফুলগাছ। গোপনে-গোপনে তারা তাদের নিজেদের পুরুষদের সঙ্গে তার তুলনা করলে, এ-কথাই ভাবলে যে সারা জীবন ধ'রে তারা যা করতে পারতো না সে নিশ্চয়ই সে-কাজ করতে পারতো মাত্র একরাত্রের মধ্যেই, আর তারা তাদের হৃদয়ের একেবারে গভীরে নিজেদের পুরুষদের খারিজ ক'রে দিলে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে তুচ্ছ ও হীন, সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় জীব হিশেবে। তারা তাদের স্বপ্নবিলাসের গোলকধাঁধাতেই এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে প্রবীণা, যে বয়সে বুড়ি হ'য়ে গিয়েছে ব'লেই ডুবে-যাওয়া পুরুষটির দিকে কামনার চাইতে সহানুভূতির সঙ্গেই তাকিয়েছিলো, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে :

'এর মুখটা যেন এস্তেবানের।'

সে-কথা সত্যি। বেশির ভাগই তার দিকে আরেকবার তাকিয়ে নিয়েই বুঝতে পারলে যে এস্তেবান ছাড়া অন্য আর-কোনো নামই তার হ'তে পারতো না।

তাদের মধ্যে যারা একটু বেশি জেদি আর একরোখা, তারা আবার বয়েসেও সবার ছোটো ; তারা তখনও কয়েক ঘণ্টার জন্তে এই মায়াবিভ্রমে কাটিয়ে দিলে যে যখন তারা তাকে পোশাক পরাবে আর পেটেন্ট চামড়ার জুতো পরিয়ে শোয়াবে ফুলের মধ্যে, তার নাম হয়তো হ'য়ে উঠবে লাউতারো। কিন্তু এ তো শুধু এক অলীক বিভ্রম। কেম্বিস কাপড় যথেষ্ট ছিলো না, বিচ্ছিরিভাবে কাটা আর শেলাই-করা পাৎলুনটা খুব আঁটো হ'লো, আর তার বুকের গোপন বল তার জামার বোতামগুলো পটপট ক'রে ছিঁড়ে ফেললো। মাঝরাতের পর হাওয়ার শিস ম'রে গেলো, সমুদ্র ঢুলে পড়লো তার বুধবারের ঘুমে। স্তব্ধতাই শেষ সন্দেহগুলোতে ইতি টেনে দিলে : এস্তেবানই ছিলো সে, এ স্তে বা ন। যে-মেয়েরা তাকে পোশাক পরিয়েছিলো, তার চুলে কাঁকই দিয়েছিলো, তার নোখ কেটে তার দাড়ি কামিয়ে দিয়েছিলো, তারা তাদের করুণার শিহরন চেপে রাখতে পারলে না যখন তাকে মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা মেনে নিতে হ'লো। তখনই তারা বুঝতে পারলে কতটা অসুখী ছিলো সে, নিশ্চয়ই অসুখী ছিলো, তার ঐ বিশাল বপুটা নিয়ে, কারণ মৃত্যুর পরেও সেটা তাকে জ্বালাতন করছে। তারা তাকে যেন দেখতে পারছিলো সজীব, হেলে মাথা নুইয়ে দরোজার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করবার দণ্ড পেয়েছে সে, মাথা ঠুকে-ঠুকে যাচ্ছে কড়িবরগায়, কারু সঙ্গে দেখা করতে গেলে দাঁড়িয়েই থাকতে হচ্ছে তাকে, তার নরম গোলাপি সী-লায়ন মাছের মতো হাত দুটি নিয়ে সে যে কী করবে ভেবেই পাচ্ছে না, বিশেষত যখন গৃহকর্ত্রী খুঁজছেন তাঁর সবচেয়ে দুর্মূল্য চৌকি, আর তাঁকে অনুনয় করছেন, এদিকে যদিও আতঙ্কে মরো-মরো, বসুন এখানে, এস্তেবান, একটু বসুন, অনুগ্রহ ক'রে, আর সে, দেয়ালে হেলান দিয়ে, মৃদু হেসে, আপনি মোটেই ব্যস্ত হবেন না সেনিওরা, আমি এই-তো বেশ আছি, এখানে, তার গোড়ালি ঘায়ে-ঘায়ে দগদগে, তার পিঠ পুড়ে ঝামা, সেই একই জিনিশ ক'রে-ক'রে, এত বার, এত জায়গায়, যখনই কারু সঙ্গে দেখা করতে যায়, আপনি ব্যস্ত হবেন না সেনিওরা, আমি এই-তো বেশ আছি, শুধু একটা চৌকি ভেঙে দেবার ভয়ে আর সংকোচে, কখনও এটা না-জেনেই যে হয়তো তাঁরা বলতো যাবেন না এস্তেবান, অন্তত কফি খেয়ে যান, এই-তো তৈরি হ'য়ে গেছে, হয়তো তাঁরাই পরে ফিশফিশ করে বলাবলি করতেন, যাক, অবশেষে মস্ত আপদটা বিদেয় হয়েছে, কী ভালো, কী-যে সুপুরুষ এই আকাটটা, কিন্তু অবশেষে চ'লে গিয়েছে। এইভাবেই মেয়েরা দেহটার পাশে ব'সে-ব'সে ভাব-ছিলো ভোরের একটু আগে। পরে, যখন তারা তার মুখ ঢেকে দিলে একটা

কপালে, যাতে চোখে আলো প'ড়ে তাকে বিরক্ত না-করে, তাকে এমন মৃত দেখালো, এমন চিরকাল-মৃত দেখালো, এত অসহায় আর প্রতিরোধহীন, এত তাদের নিজেদের পুরুষদের মতোই যে তাদের বুকে খাঁজ কেটে-কেটে বেরুলো প্রথম অশ্রুর কৌটাগুলো। অল্প বয়েসীদের মধ্যে একজন সরাসরি কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। অন্যরা, যোগ দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস থেকে বিলাপের পথে চ'লে গেলো, আর যত তারা কোঁপালো ততই তাদের গলা ছেড়ে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করলো, কারণ এই জলে-ডোবা পুরুষটি ক্রমেই তাদের কাছে আরো একেবারে হ'য়ে উঠছে, আর ফলে তারা এতই কান্নাকাটি করলে যে তার যেন শেষই নেই, কারণ সে যে ছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্ব, সবচেয়ে পরিত্যক্ত, সবচেয়ে শান্তিপ্রিয়, সবচেয়ে কৃতজ্ঞ, সবচেয়ে বাধ্য ও বশংবদ পুরুষ, বেচারা একেবারে। কাজেই পুরুষরা যখন খবর নিয়ে ফিরে এলো যে জলে-ডোবা এই লোকটা আশপাশের গ্রামেরও কেউ নয়, মেয়েরা তাদের দরোদরো চোখের জলের মধ্যেও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের একটা ফাঁক পেয়ে গেলো :

'ঈশ্বরই ধন্য,' দীর্ঘশ্বাস ফেললে তারা, 'এ শুধু আমাদেরই !'

পুরুষরা ভাবলে এই আদিখ্যেতা নেহাৎই মামুলি মেয়েলি খামখেয়াল। রাত্তির-জোড়া কঠিন খোঁজখবরের পর ক্লান্ত আর অবসন্ন, তারা শুধু চাচ্ছিলো এই নবাগত আপদটাকে এই ঊষর, হাওয়াবিহীন, দিনটায় রোদ তেতে-ওঠার আগেই বিদেয় ক'রে দিতে। তারা মুখমাস্তুল আর কোঁচের ঝরতি-পড়তি দিয়ে উদ্ভাবন করে নিলে এক খাটুলি, সব জড়ো ক'রে দড়িদড়া দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে, যাতে, যতক্ষণ-না তারা উপকূলের পাহাড়ে পৌঁছোয়, লাশটার ওজন সামলাতে পারে। তারা চেয়েছিলো এক মালের জাহাজের নোঙরও তার সঙ্গে বেঁধে দিতে যাতে সে গহন ঢেউয়ে সহজেই ডুবে যেতে পারে, যেখানে, গভীরে, মাছেরা সব অন্ধ আর ডুবুরিরা মরে পিছুটানে, আর মন্দ চোরাটানগুলো যাতে তাকে আর ফিরিয়ে না-আনে বেলাভূমিতে, যেমন ঘটেছিলো অন্য অনেক মৃতদেহের বেলায়। কিন্তু যতই তারা তাড়াহুড়ো করলে, ততই মেয়েরা সময় নষ্ট করার কৌশল বার করতে লাগলো। আঁৎকে-ওঠা মুরগিদের মতো হাঁটছিলো তারা, বুকের মধ্যে সমুদ্দুরের মাদুলি-তাবিজ ঠুকরে-ঠুকরে, কেউ তার কাঁধে সুবাতাসের অংসফলক বেঁধে দেবে ব'লে বাধা দিচ্ছে, অন্যপাশে কেউ তার মণিবন্ধে বেঁধে দিচ্ছে কম্পিদিশ্-দর্শিকা, আর বহুৎ, 'ওখান থেকে সরো তো মেয়ে, কই, দেখি, পথ থেকে সরো,' 'এই ভাখো, তুমি আমাকে এক্ষুণি লাশটার ওপর ফেলে দিচ্ছিলে,' কথাবার্তার পর,

পুরুষরা টের পেতে শুরু করলে নিজের জীবনেরই অবিশ্বাস অনাস্থা, আর ঘ্যান-ঘ্যান করতে শুরু ক'রে দিলে অচেনা একটা লোকের জন্যে কেন এমন আদিখ্যেতা, কেন প্রধান বেদীর এত-সব শোভাভূষণ, কারণ যত-খুশি ক্রুশের পেরেক বা দিব্য-জলের শিশিই তার সঙ্গে দেখা যাক-না কেন, হাঙররা তাকে একইভাবে চিবিয়ে খাবে। তবু মেয়েরা তার ওপর স্তূপ ক'রেই চললো অর্থহীন সব প্রত্নদর্শন, সাধু-সন্তের নখ-চুল ইত্যাদি, ছুটলো বারে-বারে সামনে-পেছনে, টাল-মাটাল, খুবড়ে পড়তে-পড়তে, যখন চোখের জলে যা তারা প্রকাশ করেনি তা প্রকাশ করতে শুরু করলে ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাসে; শেষটায় পুরুষরা সব ফেটে পড়লো এই ব'লে 'কবে থেকে, শুনি, ভেসে-যাওয়া কোনো মড়ার জন্যে কেউ এমন আদিখ্যেতা করেছে, জলে-ডোবা একটা কেউ-না, বুধবারের মাংসের একটা হিমঠাণ্ডা চাক আর-কিছুই সে নয়,' তখন মেয়েদের একজন, এত অযত্নে মরবে ম'রে গিয়ে, মরা পুরুষটির মুখ থেকে একটানে খুলে দিলে রুমাল, আর পুরুষদেরও তার মুখ দেখে দম আটকে গেলো।

এ যে এস্তেবান। তাকে চেনবার জন্যে নামটা ফিরে আওড়াবারও দরকার নেই। যদি তাদের বলা হ'তো এ হ'লো সার ওয়ালটার র‍্যালে, তার গ্রিঙ্গো উচ্চারণের ঝোঁকে তাদের ওপর ছাপ ফেললেও ফেলতে পারতো, কাঁধে ল্যাজ-ঝোলা সবুজ টিয়া, নরখাদক-মারা গাদাবন্দুক; কিন্তু জগতে শুধু একজনই এস্তেবান হ'তে পারে, আর এই-তো সে, হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ প'ড়ে আছে তিমিঙ্গিলের মতো, পায়ে জুতো নেই, প'রে আছে এক বাটকুল বাচ্চার পাৎলুন, আর হাত-পায়ের পাথুরে ঐ-সব নোখ যাকে কাটতে হ'লো একটা ছুরি দিয়ে। তার মুখ থেকে রুমালটা একবার সরাবামাত্র দেখা গেলো লজ্জায়-শরমে সে গুটিয়ে আছে, এ-তো আর তার দোষ নয় যে সে এমন অতিকায়, কিংবা এত ভারি, কিংবা এত সুন্দর, আর যদি সে জানতো যে সে তা-ই হ'তে চলেছে তবে জলে ডুবে মরবার জন্যে সে নিশ্চয় আরো-দূর কোনো গহনগোপন জল বেছে নিতো, সত্যি, আমি হ'লে গলায় ঝুলিয়ে নিতাম এস্পানিয়ার বৃহৎ রণতরীর নোঙরটাই, আর টলতে-টলতে আছড়ে পড়তাম কোনো সুদূর শৈলচূড়া থেকে সেই-তার মতো যে খামকা-খামকা ব্যস্তসমস্ত ক'রে তুলতে চায় না লোকজনদের নিজের এই বুধবারের লাশটা দিয়ে, যেমন বাপু তোমরা বলো, কাউকে এই নোংরা ঠাণ্ডা মাংসের চাকটা দিয়ে বিরক্ত করতে চাই না বাপু—এই মাংসের টুকরোর সঙ্গে আমার কিন্তু কোনো সম্পর্কই নেই। তার ভাবেভঙ্গিতে এতটাই সত্য ছিলো যে এমনকী সবচেয়ে অবিশ্বাসী সন্দেহপ্রবণ

পুরুষও—সেই যারা সমুদ্রের মধ্যে অন্তবিহীন রাত্রির তিক্ততা টের পায় হাড়ে-হাড়ে যখন ভাবে যে তাদের স্ত্রীরা তাদের সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ক্লান্ত হ'য়ে গিয়ে শেষটায় কোনো জলে-ডোবা পুরুষেরই স্বপ্ন দেখবে—এমনকী তারাও, আর অন্তরাও—যাদের বুক আরো ডাকাবুকো কঠিন—তারা শুদ্ধ তাদের অস্থি-র মধ্যে মজ্জায়-মজ্জায় শিউরে-শিউরে উঠলো এস্তেবানের এই অকৃত্রিমতায়।

এমনি ক'রেই তারা সবচেয়ে জমকালো সবচেয়ে চমৎকার সবচেয়ে আশ্চর্য এক অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করলে, যতটা তারা ভাবতে পারে ততটাই, আর তা কি না কোনো এক নিঃস্ব দুঃস্থ পরিত্যক্ত জলে-ডোবা পুরুষের জন্যে। কয়েকজন মেয়ে গেলো আশপাশের গ্রাম থেকে ফুল আনতে, ফিরে এলো আরো-অনেক মেয়ের সঙ্গে, যারা শুনেও বিশ্বাস করেনি তাদের কী বলা হ'লো, আর যখন তারা নিজের চোখে দেখলো মৃতদেহটা ফিরে গেলো আরো, আরো ফুল আনতে, আর তারা আনলো তো আনলোই, আরো আরো ফুল, কত-কত ফুল, শেষটায় সেখানে স্তূপ হ'য়ে রইলো এত ফুল আর জড়ো হ'য়ে গেলো এত লোকজন যে সেখানে এক-পা হাঁটাও মুশকিল হ'য়ে উঠলো। শেষ মুহূর্তে তাদের ভারি কষ্ট হ'লো তাকে অনাথের মতো জলে ফিরিয়ে দিতে, আর তারা সেরা লোকজনদের মধ্য থেকে তার জন্যে বেছে নিলে বাবা আর মা, আর মাসি-পিশি, মামা-খুড়ো, তুতোভাই, তুতোবোন যে এর মারফৎই গাঁয়ের সবাই হ'য়ে উঠলো একে-অপরের আত্মীয়। কয়েকজন খালাশি যারা দূর থেকে শুনলো কান্নার রোল, পথ ভুল করলো জাহাজের; আর লোকে শুনতে পেলো এমন-একজনের কথা যে নিজেকে বড়ো মাস্তলটায় বাঁধিয়ে নিয়ে মনে করলো প্রত্নপ্রাচীন মোহিনী মায়াবিনী সাইরেনদের কথা ও কাহিনী। কারা তাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাবে সেই গৌরবের অধিকারের জন্যে যখন তারা হাতাহাতি করলে—তারা যাবে উপকূলের শৈলচূড়ার খাড়া গড়খাই বেয়ে—নারীপুরুষ সকলেই প্রথম বারের মতো সচেতন হ'য়ে পড়লো তাদের পথঘাটের ঊষর নিরানন্দ অবস্থার কথা, কেমন শুষ্ক খরখরে তাদের উঠোন, কতটা সংকীর্ণ তাদের স্বপ্ন, যখন তারা মুখোমুখি দাঁড়ালে তাদের জলে-ডোবা পুরুষটির সুঠামসৌষ্ঠব আর সৌন্দর্যের সামনে। তারা তাকে যেতে দিলে কোনো নোঙর ছাড়াই যাতে সে ফিরে আসতে পারে, আবার যদি তার ইচ্ছে করে, আর তারা সবাই শতাব্দীর একটা টুকরোর জন্যে শ্বাস রোধ ক'রে রইলো যখন মৃতদেহ আছড়ে পড়লো পাতালের উদ্দেশে। পরস্পরের দিকে তাকাবারও কোনো দরকার হ'লো না তাদের এটা জানতে যে এখন আর তারা সকলে একসঙ্গে

উপস্থিত নেই, যে তারা কখনোই আর সবাই মিলে একসঙ্গে উপস্থিত থাকবে না। কিন্তু তারা এও জেনে গেলো যে সবকিছুই এখন থেকে অন্যরকম হ'য়ে যাবে, যে তাদের বাড়িঘরে থাকবে প্রশস্ত সব দরোজা, উঁচু-উঁচু কড়িবরগা, শক্তপোক্ত মেঝে যাতে এস্তেবানের স্মৃতি যে-কোনোখানেই ঘুরে বেড়াতে পারে থামে-ছাতে ঘা না-খেয়ে, যাতে কেউ পরে ফিশফিশ ক'রে বলতেও সাহস না-পায় যে মস্ত আপদটা অবশেষে টেঁসে গিয়েছে, খুবই খারাপ ব্যাপার, তবে সুপুরুষ হাঁদাটা অবশেষে ম'রেই গেলো, কারণ এখন তারা তাদের বাড়ি-ঘর রং ক'রে দেবে হাসিখুশির রঙে আর ছটায়, এস্তেবানের স্মৃতিকে শাশ্বত ক'রে তোলবার জন্যে ; আর তারা পাথর কাটিয়ে জলের ফোয়ারা বার ক'রে দেবার জন্যে অক্লান্ত খেটে-খেটে তাদের শিরদাঁড়া ভাঙবে, শৈলচূড়ায় রুইবে ফুলগাছ যাতে ভবিষ্যৎ বছরগুলোয় ঊষার সময় বড়ো-বড়ো যাত্রীজাহাজের লোকেরা বারদরিয়ায় জেগে যায় বাগানের ফুলের গন্ধে ঝিম ধ'রে গিয়ে আর কাপ্তেন নেমে আসে তার পোশাকি উর্দি গায়ে সাঁকো থেকে, তার নভশ্চরী, তার ধ্রুবতারা, উর্দিতে তার যুদ্ধপদকের সারি-সারি ভূষণ বসানো, দিগন্তের দিকে অন্তরীপের গোলাপি ভাঙা টুকরোটা দেখিয়ে কাপ্তেন ব'লে উঠবে চোদ্দটা ভাষায়, দ্যাখো-দ্যাখো, দ্যাখো ওখানে, যেখানে হাওয়া এখন এত শান্ত যে এ যেন উনপঞ্চাশ বিছানার তলায় ঘুমোতে গিয়েছে, ঐ ওখানে, যেখানে রৌদ্র এত উজ্জ্বল যে সূর্যমুখিরা জানেই না কোনদিকে মুখ ফেরাবে, হ্যাঁ, ঐ ওখানে, ওটা তো এস্তেবানের গ্রাম।

১৯৬৮

বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো

ছোটোদের গল্প

বৃষ্টির তৃতীয় দিনে ওরা বাড়ির ভেতরে এতই কাঁকড়া মেরেছিলো যে পেলাইওকে ভিজে-একশা উঠোন পেরিয়ে গিয়ে সেগুলোকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়েছিলো, কারণ সারা রাত ধ'রে নবজাত শিশুটির ছিলো জ্বর, আর ওরা ভেবেছিলো জ্বরটা হয়েছে ঐ পচা বদ গন্ধটার দরুন। মঙ্গলবার থেকেই সারা জগৎ কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে আছে। সমুদ্র আর আকাশ হ'য়ে উঠেছে একটাই ছাই-ধূসর বস্তু; আর বেলা-ভূমির বালি, মার্চের রাত্তিরে যা ঝকঝক করে গুঁড়ো-গুঁড়ো আলোর মতো, হ'য়ে উঠেছে কাদা আর পচা খোলকমাছগুলোর এক ভাপে-সেদ্ধ-হওয়া দগদগে স্তূপ। দুপুরবেলাতেই আলো এমন দুর্বল যে পেলাইও যখন কাঁকড়াগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো, তার পক্ষে দেখাই মুশকিল ছিলো উঠোনের পেছনকোণটায় কী-সেটা ছটফট ক'রে নড়তে-নড়তে কাৎরাচ্ছে। তাকে খুব কাছে গিয়ে তবেই দেখতে হয়েছিলো যে এক বুড়ো, খুবই থুরথুরে বুড়ো, কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে, আর, তার প্রচণ্ড সব চেষ্টা সত্ত্বেও, কিছুতেই উঠতে পারছে না, তার বিশাল দুই ডানায় কেবলই বাধা পেয়ে যাচ্ছে।

সেই দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠে, পেলাইও ছুটে চ'লে গেলো এলিসেন্দার কাছে, তার বৌ, যে তখন অসুস্থ বাচ্চাটির কপালে জলপট্টি দিচ্ছিলো, আর পেলাইও তাকে ডেকে নিয়ে গেলো উঠোনের পেছনকোণায়। প'ড়ে-থাকা শরীরটার দিকে তাকিয়ে তারা কেমন হতভম্ব হ'য়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। বুড়োর পরনে ন্যাকড়া-কুড়ুনির পোশাক। তার টাক-পড়া চকচকে মাথাটায় কয়েকটাই মাত্র বিবর্ণ চুল রয়েছে, ফোকলা মুখটায় খুবই কম দাঁত, আর এককালে যদি-বা তার কোনো জাঁকজমক থেকেও থাকতো এখন এই ভোজো কাকের প্র-প্রপিতামহের করুণ দশা সে-জাঁকজমক একেবারে উধাও ক'রে দিয়েছে। তার অতিকায় শিকারি পাখির ডানা—নোংরা, আদ্ধেকটাই পালক খসা—চিরকালের মতো কাদায় জট পাকিয়ে গিয়েছে। ওরা তার দিকে এতক্ষণ ধ'রে খুব কাছে থেকে হাঁ ক'রে তাকিয়েছিলো যে পেলাইও আর এলিসেন্দা খানিক বাদেই তাদের প্রথম চমকটা

জয় ক'রে নিলে, বরং শেষটায় একে বেশ চেনা-চেনাই ঠেকলো। তখনই সাহস ক'রে তার কথা কইবার একটা চেষ্টা করলে তারা, আর উত্তরে সে খালাশিদের যেমন গলা কাটিয়ে কথা বলার অভ্যেস থাকে তেমনি ঝিনঝিনে গলায় কী-এক দুর্বোধ্য বুলিতে জবাব দিলে। ঐ কারণেই ওরা ডানা দুটোর ঝামেলা-টামেলাকে বেমালুম কোনো পাত্তা না-দিয়েই বেশ বুদ্ধিধারীদের মতোই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো যে সে নিশ্চয়ই তুফানে উলটে-যাওয়া কোনো ভিনদেশী জাহাজের নিঃসঙ্গ ভরাডুবি নাবিক। অথচ তবু তাকে দেখাবার জন্তে ওরা এক পড়োশিনিকে ডেকে আনলে, সে আবার জীবনমৃত্যুর সব গলিঘুঁজিরই হদিশ রাখে; আর তার দিকে শুধু একবার তাকিয়েই সেই পড়োশিনির ওদের বোঝাতে দেরি হ'লো না যে ওরা একটা মস্ত ভুল করেছে।

'এ-যে এক দেবদূত,' পড়োশিনি তাদের বললে। 'নিশ্চয়ই বাচ্চাকে নিয়ে যেতে আসছিলো, কিন্তু বেচারা এমনই বুড়োহাবড়া যে এই মুষলবৃষ্টি তাকে একেবারে পেড়ে ফেলেছে।'

পরের দিনই সবাই জেনে গেলো যে পেলাইওদের বাড়িতে এক রক্তমাংসের জ্যান্ত দেবদূতকে কয়েদ ক'রে রাখা হয়েছে। জ্ঞানে ঋনো ঐ পড়োশিনির বিচার-বুদ্ধিকে কোনো পাত্তা না-দিয়ে—তার কাছে তখন দেবদূতমাত্রেই কোনো স্বর্গীয় ষড়যন্ত্রের পালিয়ে-বাঁচা নিদর্শন—ওরা তাকে মুগুর পেটা ক'রে মেরে ফেলতে কোনো সায় পেলে না। রান্নাঘর থেকে পেলাইও সারা বিকেল তার ওপর নজর রাখলে, তাদের পালের খাটো মুগুরটায় সে সশস্ত্র; আর রাত্তিরে শুতে যাবার আগে তাকে সে কাদা থেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে তারের জাল ঘেরা মুরগির খাঁচাটায় বন্ধ ক'রে রাখলে। মাঝরাত্তিরে, বৃষ্টি যখন থ'রে এলো, পেলাইও আর এলিসেন্দা তখনও একটার পর একটা কাঁকড়া মারছে। একটু বাদেই বাচ্চাটাও জেগে উঠলো মস্ত এক খাই-খাই নিয়ে, তার গায়ে আর জ্বর নেই। তখন ওরা একটু দরাজদিল হ'য়ে উঠলো, ঠিক করলে যে এই দেবদূতকে ওরা তিনদিনের উপযোগী টাটকা জল আর খাবারদাবার দিয়ে একটা ভেলায় ক'রে বারদরিয়ায় তার নিয়তির কাছে ছেড়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু উষার প্রথম আলো ফোটবামাত্র যখন ওরা উঠোনে গিয়ে হাজির হ'লো, ওরা দেখতে পেলে পুরো পাড়াটাই মুরগির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে দেবদূতকে নিয়ে মজা করছে, রঙতামাশা করছে, কারু মধ্যে কোনো সম্ভ্রমবোধ নেই, তারের মধ্যে দিয়ে তাকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিচ্ছে খাবার, যেন সে আদপেই কোনো অতিপ্রাকৃত জীব নয়—বরং যেন সে এক সার্কাসের জন্তু।

সকাল সাতটার আগেই পাদ্রে গোনসাগা এসে হাজির—এই অদ্ভুত খবরে বেশ শঙ্কিত হ'য়েই হন্তদন্ত হ'য়ে তিনি ছুটে এসেছেন। ততক্ষণে ভোরবেলাকার দর্শকদের মতো তত রংবাজ নয় এমন দর্শকরা এসে হাজির হয়েছে, আর তারা বন্দীর ভবিষ্যৎ নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সরল লোকটা ভেবে ফেলেছে যে একে সারা জগতের পুরপিতা নাম দেয়া উচিত। অপেক্ষাকৃত কঠিন হৃদয়ের লোকেদের মনে হ'লো একে এক পাঁচতারা সেনাপতির পদে উন্নীত ক'রে দেয়া হোক যাতে সব যুদ্ধবিগ্রহই সে জিতিয়ে দিতে পারে। কিছু-কিছু দূরদর্শীর মনে হ'লো তাকে দিয়ে যদি পৃথিবীতে কোনো ডানাওয়ালা জাতির জন্ম দেয়ানো যায় তবে সে-জাতি হবে জ্ঞানে-গুণে সবার সেরা, আর তারাই তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্ব নিয়ে নেবে। কিন্তু পাদ্রে গোনসাগা—যাজক হবার আগে ছিলেন এক হট্টাকট্টা কাঠুরে—তারের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে, মুহূর্তে জেরা করবার জন্যে প্রশ্নোত্তর সব ভেবে নিলেন, আর ওদের বললেন দরজাটা খুলে দিতে, যাতে ভেতরে গিয়ে কাছে থেকে তিনি এই হতশ্রী করুণ লোকটাকে দেখে নিতে পারেন—যাকে তখন এই ভ্যাবাচাকাখাওয়া মন্ত্রমুগ্ধ মুরগির ছানাগুলোর মধ্যে এক অতিকায় জরাজীর্ণ মুরগির মতো দেখাচ্ছিলো। সে শুয়ে আছে এক কোণায়, খোলা ডানাগুলো সে শুকোচ্ছে রোদ্দুরে, চারপাশে ছড়িয়ে আছে ফলের খোসা আর ছোটোহাজরির উচ্ছিষ্ট, ভোর-ভোর-ওঠা দর্শকরা এসে যে-সব তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে। পাদ্রে গোনসাগা যখন মুরগির খাঁচার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে তাকে লাতিনে সুপ্রভাত জানালেন, জগতের ধৃষ্টতা আর ঔদ্ধত্য তার অচেনা ব'লে সে শুধু তার প্রত্নপ্রাচীন চোখ তুলে গুনগুন ক'রে কী-একটা বললে তার ভাষায়। এ-যে এক জোচ্চোর ফেরেব্বাজ, এ-বিষয়ে এ-তল্লাটের যাজনপল্লির এই পুরুৎটির মনে প্রথম সন্দেহটা দানা বেঁধে উঠলো, বিশেষত যখন দেখতেই পেলেন যে এ ঈশ্বরের ভাষাই বোঝে না, কিংবা জানেও না কী ক'রে ঈশ্বরের উজির-নাজিরদের সম্ভাষণ করতে হয়। তারপর তিনি খেয়াল ক'রে দেখলেন যে খুব কাছে থেকে নজর করলে, তাকে বড্ড বেশি মানুষ-মানুষ দেখায়। তার গা থেকে বেরুচ্ছে খোলাবেলার এক অসহ্য গন্ধ, তার ডানাগুলোর পেছন দিকে গজিয়েছে নানারকম পরভৃৎ আর তার প্রধান পালকগুলোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে পার্থিব সব হাওয়া; দেবদূতদের সগর্ব মর্যাদার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন-কিছুই তার নেই। তারপর তিনি মুরগির খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ছোট্ট একটি কথামৃত আউড়ে কৌতূহলীদের হুঁশিয়ার ক'রে দিলেন ছলাকলাহীন সাদাসিধে অকপট লোক হবার

ঘুঁষি কতটা ; তিনি ওদের মনে করিয়ে দিলেন যে রোম্যান ক্যাথলিকদের হল্লোড়ে-উৎসবে এসে কৌশলে আচমকা ল্যাং মেরে দেবার একটা বিষম বদভ্যেস আছে শয়তানের যাতে অসাবধানীদের সে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে, বিপথে নিয়ে যেতে পারে। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে কোনো ডানা যদি কোনো বাজপাখি আর উড়োজাহাজের তফাৎ নির্ধারণ ক'রে দেবার কোনো আবশ্যিক উপাদান না-হয়, তবে দেবদূতদের শনাক্ত করবার বেলায় ডানার গুরুত্ব তো আরোই কম। তৎসত্বেও তিনি কথা দিলেন যে তিনি তাঁর বিশপকে একটি চিঠি দেবেন যাতে বিশপ তাঁর গির্জাশাসিত পল্লির আর্চবিশপকে লিখতে পারেন, আর তিনি তারপর লিখতে পারেন সর্বোচ্চ মোহান্তকে যাতে উচ্চতর আদালত থেকে সর্বাধিনায়কের চূড়ান্ত রায়টি পাওয়া যায়।

তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা সকলই গিয়ে পড়লো বন্ধ্যা-সব হৃদয়ে। বন্দী দেবদূতের খবর এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো যে কয়েকঘণ্টা বাদেই এক বড়ো হাটবাজারের ব্যস্ততা আর শোরগোল উঠলো উঠোনে, আর ভিড়কে সরিয়ে দেবার জন্যে ডাকতে হ'লো সঙিনসমেত সেনাবাহিনীকে, নইলে বাড়িটা তারা প্রায় ধসিয়েই দিতো। এই হাটবাজারের এত জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে-দিয়ে এলিসেন্ডার শিরদাঁড়া যেন দুমড়ে গিয়েছে ; শেষটায় তার মাথায় ফন্দিটা খেলে গেলো, আরে, উঠোনের চারপাশে বেড়া দিয়ে সকলের কাছ থেকেই তো দর্শনী বাবদ পাঁচ সেন্ট ক'রে চাওয়া যায়।

কৌতূহলীরা এলো দূর-দূরান্তর থেকে। এক ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দলও এসে পৌঁছুলো যার ছিলো এক উড়ন্ত দড়বাজিকর, সে ভিড়ের ওপর বার-কয় ভোঁ-ভোঁও করলে, কিন্তু কেউ তার দিকে কোনো পাত্তাই দিলে না—কারণ তার ডানাগুলো মোটেই কোনো দেবদূতের মতো ছিলো না—বরং সেগুলোকে দেখাচ্ছিলো কোনো নাক্ষত্র বাদুড়ের মতো। জগতের সবচেয়ে দুর্ভাগা ও অশক্তরা এলো স্বাস্থ্যের সন্ধানে : এলো এক বেচারি মেয়ে জন্ম থেকেই যে গুনে যাচ্ছিলো তার বুকের ধুকধুক, গুনতে-গুনতে এখন সে সব সংখ্যাই শেষ ক'রে ফেলেছে ; এলো এক পোর্তুগিস কিছুতেই যে কখনও ঘুমোতে পারে না, কারণ তারাদের কোলাহল তার ঘুম কেবলই চটিয়ে দেয় ; এলো এক ঘুমে-হাঁটা লোক, যে দিনে জেগে-থাকা অবস্থায় যা-যা করেছে সব রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে উঠে ভণ্ডুল ক'রে দেয় ; এ ছাড়াও কত-কত জন, তাদের অবশ্য অত ভয়াবহ-সব অসুখ নেই। পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিলো যে-জাহাজডুবির বিশৃঙ্খলা, তার মধ্যে পেলাইও আর এলিসেন্ডা অবশ্য তাদের ক্লান্তিতেই সুখী, কারণ হপ্তা শেষ হবার আগেই তারা তাদের সবগুলো ঘর ঠেসেছে

টাকাকড়িতে, আর ভেতরে ঢোকবার পালা কখন আসে তার জন্যে যে-তীর্থযাত্রীর সার অপেক্ষা করছে বাইরে, তা এমনকী দিগন্তও পেরিয়ে কোথাও চ'লে গিয়েছে।

এই দেবদূতই ছিলো একমাত্র যে তার নিজের এই হুলুস্থুল নাট্যে কোনোই ভূমিকা নেয়নি। তার এই ধার-করা নীড়ে কীভাবে সে একটু আরাম পাবে, তারই চেষ্টায় সে কাটায় সারা সময়—তেলের বাতি বা উপাসনার মোমবাতিগুলোর নারকীয় আলায় আর উত্তাপে তার প্রায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়, অথচ ওগুলো সারাক্ষণ ঐ তারের খাঁচায় জ্বলছে। গোড়ায় তাকে ওরা ন্যাপথালিন খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলো, সেই পরমজ্ঞানী পড়োশিনির প্রজ্ঞা অনুযায়ী তা-ই নাকি দেবদূতদের খাদ্য হিশেবে বিধানবিদিত। কিন্তু সে ও-সব ফিরিয়ে দিয়েছে, যেমন সে ফিরিয়ে দিয়েছে পোপের ভোজ, পাপীতাপীরা প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে মানৎ ক'রে এ-সব ভূরিভোজ তার কাছে নিয়ে এসেছিলো; আর তারা কখনও এটা বুঝে উঠতে পারেনি সে যে বেগুনভর্তা ছাড়া আর-কিছুই খায় না, সে কি সে একজন দেবদূত ব'লে না কি ফোগলা দাঁতের এক বুড়ো থুরথুরে ব'লে। তবে তার একমাত্র অতিপ্রাকৃত শক্তি মনে হ'লো তার ধৈর্য। বিশেষত প্রথম দিনগুলোয়, তার ডানায় যে-সব নাক্ষত্র পরভৃৎ অস্পেশ ক'রে গজিয়েছে তার খোঁজে যখন মুরগিরা তাকে ঠোকরাতো, আর পঙ্গুরা ছিঁড়ে নিতো তার পালক তাদের বিকল ঠুঁটো অঙ্গগুলোয় ছোঁয়াবার জন্যে, আর এমনকী যাদের প্রাণে অনেক দয়াধর্ম ছিলো তারাও যখন তাকে তাগ করে ঢিল ছুঁড়তো যাতে সে উঠে পড়ে আর দাঁড়ালে তাকে কেমন দেখায় সেটা দেখবার জন্যে—তখনও সে শান্তই থাকতো। একমাত্র যে-বার তারা তাকে উশকে তাতিয়ে দিতে পেরেছিলো সে তখনই যখন তারা তার পাশটা পুড়িয়ে ছিলো তপ্ত লোহায়, যা দিয়ে ছ্যাকা লাগিয়ে তারা বলদের গায়ে মার্কা দিতো—কারণ সে এতক্ষণ কেমন ঝিম মেরে নিশ্চল পড়েছিলো যে তারা ভেবেছিলো সে বুঝি ম'রেই গিয়েছে। আঁৎকে জেগে উঠেছিলো সে তখন, তার ঐ রুক্ষ দুর্বোধ্য অচেনা ভাষায় চেঁচিয়ে প্রলাপ বকেছিলো, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিলো তার, আর সে তার ডানা ঝাপটেছিলো বার-দুই, যা মুরগির বিষ্ঠা আর চাঁদ গুলোর এক ঘূর্ণিহাওয়া তুলে দিয়েছিলো, আর এমন একটা দমকা ঝাপটা তুলেছিলো আতঙ্কের যাকে কিছুতেই এই জগতের ব'লে মনে হয়নি। যদিও অনেকে ভেবেছিলো তার সাড়াটা ঠিক ক্রোধের নয়, বরং জ্বালায়, ব্যথায়। আর সেই থেকে তারা হুঁশিয়ার হ'য়ে যায় যাতে তাকে আর এমন চটিয়ে দেয়া না-হয়, কারণ বেশির ভাগ লোকই বুঝেছিলো তার এই নিষ্ক্রিয়

উদাস্ত মোটেই কোনো বীরনায়কের বিলাপ নয়, বরং কোনো মহারাবণের পূর্বমুহূর্তের থমথমে ছমছমে সুর।

বাড়ির ঝি-চাকরানিদের প্রেরণা-পাওয়া সব সূত্র দিয়েই পাত্রে গোলগাপ্পা ভিড়ের ছ্যাবলামিটা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। বন্দীর প্রকৃতি সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় কী আসে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু রোম-থেকে-আসা চিঠিতে কোনো তাড়াই দেখা গেলো না। তারা তাদের সময় কাটিয়ে দিলে এইসব প্রশ্নে বন্দীর কোনো নাভি আছে কি না, তার কথাবার্তার সঙ্গে সিরিয়ার প্রাচীন ভাষার কোনো সম্পর্ক আছে কি না, একটা ছুঁচের ডগায় তার মতো ক-টা মাথা এঁটে যায়, অথবা সে কি নিছকই নরওয়ের কোনো লোক, গায়ে ডানা লাগিয়ে নিয়েছে। ঐ-সব তুচ্ছ অতি-সংক্ষিপ্ত চিঠিগুলো হয়তো সময়ের শেষ অব্দিই যাতায়াত করতে থাকতো, যদি-না এক দৈব ঘটনা পাত্রে গোলসাপার সব নাজেহাল বিপত্তিতে একটা ইতি টেনে দিতো।

ঘটেছিলো কী, ঐ দিনগুলোয়, আরো-সব কত-কত উৎসব মেলা আর সার্কাসের হরেকরকম আকর্ষণের মধ্যে, শহরে এসে পৌঁছেছিলো একটি মেয়ের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী, যে তার বাবা-মার কথার অবাধ্য হয়েছিলো ব'লে মাকড়সা হ'য়ে গিয়েছে। দেবদূতকে দেখতে যত পয়সা দিতে হয়, একে দেখতে যেতে তার চেয়ে যে কম পয়সা দর্শনী বাবদ দিতে হয়, শুধু তা-ই নয়, তার এই অসম্ভব দশার জন্যে লোককে যা-খুশি প্রশ্ন করবারও সুযোগ দেয়া হয়, এমনকী তাকে আগা-পাশতলা খুঁটিয়েও দেখতে দেয়া হয় যাতে তার এই বিভীষিকার সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কারু মনেই কোনো সন্দেহ না-থাকে। সে-এক ভয়ংকর তারানতুলা, একটা মস্ত ভেড়ার মতো বড়ো, আর তার মাথাটা এক বিষাদময়ী কুমারী মেয়ের। যা ছিলো সবচেয়ে হৃদয়-বিদারক, তা কিন্তু তার এই তাজ্জব আকৃতি নয়, বরং তার অকৃত্রিম-দুঃখী করুণ গলা, যে-গলায় সে তার দুর্ভাগ্যের সব খুঁটিনাটি বর্ণনা করতো। যখন সে একেবারেই ছেলেমানুষ, এক নাচের আসরে যাবে ব'লে কাউকে কিছু না-জানিয়ে সে তার বাবা-মার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলো, আর অনুমতি না-নিয়ে সারা রাত ধ'রে নাচবার পর সে যখন এক বনের মধ্য দিয়ে ফিরছিলো তখন হঠাৎ এক ভয়ংকর বজ্রপাত আকাশকে দু-ভাগে কেঁড়ে দিয়েছিলো আর ফাটলের মধ্য দিয়ে নেমে এসেছিলো জ্বলন্ত গন্ধকের এক বিদ্যুৎশিখা যা তাকে বদলে দিয়েছিলো এই আজব মাকড়সায়। যাদের প্রাণে দয়াদাক্ষিণ্য আছে তারা তার মুখে মাংসের বড়া ছুঁড়ে দেয়—একমাত্র তা-ই তাকে অ্যাদ্দিন ধ'রে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ-রকম এক দৃশ্য, যার মধ্যে এতই মানবিক সত্য আর এমন-এক ভয়ংকর শিক্ষা

আছে, যে তা চেষ্টা না-ক'রেও হারিয়ে দিতে পারে কোনো উদ্ধত দেবদূতের প্রদর্শনী, যে-দেবদূত কি না কচিৎ-কখনও নাক সিঁটকে তাকায় মর্তবাসীদের দিকে। তাছাড়া, দেবদূতের নামে যে-ক-টা অলৌকিক অঘটনের দায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো তা শুধু এক ধরনের মানসিক বিশৃঙ্খলাই বোঝাচ্ছিলো। যেমন: এক অন্ধ আতুর, সে তার দৃষ্টি ফিরে পায়নি বটে, তবে তার তিনটে নতুন দাঁত গজিয়ে গিয়েছিলো; কিংবা এক পঙ্গু বেচারি যে হেঁটে-হেঁটে গিরিলঙ্ঘন করতে পারেনি বটে তবে একটা লটারি প্রায় জিতেই যাচ্ছিলো; কিংবা এক কুষ্ঠরোগী যার ঘাগুলো থেকে গজিয়েছিলো সূর্যমুখী ফুল। কোনো সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো এ-সব অলৌকিক কাণ্ড আসলে প্রায় বিসদৃশ সব মশকরা বা কৌতুকের মতোই—আর এ-সবের ফলেই দেবদূতের মানসম্ভ্রম খ্যাতি ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিলো। তারপর মাকড়শায়-বদলে-যাওয়া মেয়েটি আসতেই তার সব নামডাক একেবারেই ধ'সে পড়লো। এইভাবেই পাদ্রে গোনসাগা তাঁর অনিদ্রা রোগ থেকে চিরকালের মতো রেহাই পেয়ে গেলেন আর পেলাইওদের উঠোন সেইরকমই ফাঁকা হ'য়ে গেলো তিনদিন তিনরাত্তির যখন একটানা ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি পড়েছিলো আর কাঁকড়ারা হাঁটছিলো তাদের শোবার ঘরে।

বাড়ির মালিকদের অবশ্য বিলাপ করার কোনোই কারণ ছিলো না। যে-টাকা তারা কামিয়েছিলো তা দিয়ে তারা এক চকমেলানো দোতলা বাড়ি বানিয়ে নিলে, সে বাড়ির ছিলো অলিন্দ আর বাগান আর উঁচু তারের জাল শীতের সময় যাতে কাঁকড়ারা আর ভেতরে ঢুকতে না-পারে, আর জানলায় ছিলো লোহার গরাদ যাতে কোনো পথহারা দেবদূতও ঢুকে পড়তে না-পারে আচমকা। শহরের কাছেই পেলাইও একটা খরগোশ পালন করবার ঘিঞ্জি গোলকধাঁধা বানিয়ে নিলে, চিরকালের মতো ইস্তফা দিলে তার সান্ত্রীপালের কাজে, আর এলিসেন্দা কিনে নিলে কতগুলো উঁচু খুরওয়ালা ঢাকা জুতো আর রামধনু-রঙা রেশমি কাপড়ের অনেক প্রস্থ পোশাক, তখনকার দিনে রোববারে-রোববারে যে-সব পোশাক পরতো সবচেয়ে অভিজাত ও কাঙ্ক্ষিত মহিলারা। যা-যা তাদের কোনো মনোযোগ পায়নি, তার মধ্যে মুরগির খাঁচাটাই একমাত্র জিনিশ ছিলো না। যদি তারা রাসায়নিক দিয়ে তা ধুয়ে দিয়ে থাকে আর তার ভেতরে বার-বার মস্তকির অশ্রু পুড়িয়ে থাকে, সে কিন্তু মোটেই এই দেবদূতের অর্চনায় নয়, বরং সেই গু-গোবরের স্তূপের দুর্গন্ধ তাড়িয়ে দিতেই—ভূতের মতো এখনও যা ঝুলে আছে সবখানে, আর নতুন দালানটাকে বানিয়ে দিচ্ছে পোড়োবাড়ি। গোড়ায়, যখন তাদের বাচ্চা

হাঁটতে শিখলো, তারা খুবই সাবধান ছিলো যাতে সে কখনও মুরগির খাঁচাটার খুব কাছে না-যায়। কিন্তু তারপর তারা ক্রমে-ক্রমে তাদের ভয় হারাতে শুরু করলে আর গন্ধটার অভ্যস্ত হ'য়ে গেলো। বাচ্চার দ্বিতীয় দাঁতটি বেরুবার আগেই সে মুরগির খাঁচার ভেতর খেলতে চ'লে যেতো, খাঁচার তারগুলো ততদিনে অবহেলায় অযত্নে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে গিয়েছে। অন্য-কোনো মর্তবাসীর সঙ্গে কোনো মাখামাখিই করেনি দেবদূত, বরং দূরে-দূরেই থাকতো, এখনও সে তেমন-একটা মাখামাখি করে না; তবে সব ভুল ধারণা হারিয়ে বসবার পর কোনো কুকুর যেমন বাচ্চাদের যাবতীয় যাচ্ছেতাই অপমান ও নিগ্রহ পরম ধৈর্যভরে সহ্য করে, তেমনি ধৈর্যের সঙ্গে দেবদূত এই বাচ্চাটিকে সহ্য করতো। একই সঙ্গে দুজনকেই পেড়ে ফেললো জলবসন্ত। যে-ডাক্তার বাচ্চাটির রোগ দেখতে এসেছিলো সে অবশ্য দেবদূতের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শোনবার লোভ সামলাতে পারলে না, আর সে তার বুকে এত শিস শুনতে পেলে আর এতই গোলমাল শুনতে পেলে তার বুকে যে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব ব'লে ডাক্তারের মনে হ'লো না। যেটা তাকে সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দিলে সেটা এই ডানা দুটোর যুক্তি ও প্রকৃতি। এ-দুটি এমনই স্বাভাবিক যে পুরোপুরি কোনো মানুষেরই আবশ্যিক অঙ্গ ব'লে মনে হয়, আর তার অবাক লাগলো এই ভেবে যে অন্য-সব মানুষদেরই বা কোনো ডানা নেই কেন।

বাচ্চা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করলে, সেটা রোদে-বৃষ্টিতে মুরগির খাঁচার সম্পূর্ণ ধ্বংসের কিছুকাল পরে। দেবদূত এখন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, পথহারা দিকভোলা কোনো মুমূর্ষুর মতো। ওরা তাকে ঝাঁটা মেরে বার ক'রে দেয় শোবার ঘর থেকে, কিন্তু পরক্ষণেই তাকে ভাখে রান্নাঘরে। একই সঙ্গে তাকে এত বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় ব'লে মনে হয় যে তারা অবাক হ'য়ে ভাবে এর আবার আরো-কতগুলো সংস্করণ হ'য়ে গেলো নাকি—সে কি নিজেকেই তৈরি করছে বাড়ির সকল কোণায়-খামচিতে? আর বিপর্যস্ত ও ভিতিবিরক্ত এলিসেন্দা ডুকরে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলতে লাগলো দেবদূতে-দেবদূতে থৈ-থৈ-করা কোনো নরকে বাস করা কী যে অদ্ভুত কাণ্ড! দেবদূত এখন খেতেই পারে না কিছু, তার প্রত্নপ্রাচীন চোখও এখন এত ঘোলাটে হ'য়ে গেছে যে সবসময় সে জিনিশপত্তরে ধাক্কা খায়, তার শেষ পালকগুলোর নিছক শূন্য জালের মতো দাঁড়গুলোই এখন আছে তার। পেলাইও একটা কম্বল ছুঁড়ে দেয় তার ওপর, তাকে করুণা ক'রে একটা আটচালার নিচে শুতে দেয়। আর শুধু তখনই তারা আবিষ্কার করলে যে রোজ রাত্তিরে তার জ্বর আসে, আর কোনো বুড়ো নরওয়েবাসীর জিভজড়ানো

ভাষায় সে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকে। যে-কয়েকবার তারা বিষম ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, এ তারই একটা, কারণ তারা ধ'রেই নিয়েছিলো যে এ বুঝি মরতে বসেছে, আর তাদের জ্ঞানীগুণী পড়োশিনি অব্দি তাদের বলতে পারলে না কোনো মরা দেবদূতকে নিয়ে তারা কী করবে।

অথচ তবু যে সে তার সবচেয়ে অসহ্য শীতকালটাই টিকে গেলো তা-ই নয়, প্রথম রোদ্দুরে ভরা দিনগুলো আসতেই মনে হ'লো সে ক্রমেই সেরে উঠছে। উঠোনের সবচেয়ে দূর কোণায় সে কয়েকদিন নিশ্চল প'ড়ে থাকে, যেখানে কেউই তাকে দেখতে পায় না; আর ডিসেম্বরের গোড়ায় তার ডানায় মস্ত কতগুলো আড়-ধরা পালক গজিয়ে ওঠে, কোনো কাকতাড়ুয়ার পালক যেন দেখলো, তার জরার আরেকটা দুর্ভাগা লক্ষণ ব'লেই মনে হ'লো এই পালকগুলোকে। কিন্তু সে নিজে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলো এ-সব বদলের আসল কারণ, কেননা কেউ যাতে তা না-দেখতে পায় এ-বিষয়ে সে খুবই সজাগ ছিলো, সে খুবই সাবধান ছিলো কেউ যাতে শুনতে না-পায় আকাশভরা ঝিকিমিকি তারার তলায় সে যখন সিন্ধুরোলের গান গুনগুন করে। একদিন সকালে এলিসেন্দা যখন পেঁয়াজকলির গুচ্ছ কাটছে, তখন আচমকা মনে হ'লো হঠাৎ যেন দূর বারদরিয়ার এক ঝলক হাওয়া এসে ঢুকেছে রান্নাঘরে। তখন সে জানলায় গিয়ে দেখতে পেলে দেবদূত এই প্রথম তার ডানা ছড়িয়ে ওড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমনই অগোছালো ও অনভ্যস্ত তার এই অপচেষ্টা যে তার নখগুলো সবজিবাগানের মধ্যে গভীর সব খাঁজ কেটে দিচ্ছে। আর সে হয়তো তার অবুথবু উলটোপালটা ডানা ঝাপটানিতে আটচালাটাও ধসিয়ে দিতো, বিশেষত বারে-বারে সে যে-রকম হড়কে যাচ্ছিলো, কিছুতেই আঁটো ক'রে চেপে ধরতে পারছিলো না হাওয়া। তবু অবশ্য কেমন নড়বোড়েভাবে সে একটু উঠতে পারলে ওপরে। দেখে এলিসেন্দা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে—নিজের জন্যে স্বস্তি আর দেবদূতের জন্যেও স্বস্তি যখন সে দেখতে পেলে যে দেবদূত এখন শেষ বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, কোনোরকমে সে নিজেকে ধ'রে রেখেছে উড়ালটায়, কোনো বয়োজীর্ণ জরাগ্রস্ত শকুনের ঝুঁকিতে-ভরা ডানাঝাপটানি দিয়ে। পেঁয়াজ কাটা সারা হ'য়ে যাবার পরও এলিসেন্দা তাকে দেখতেই থাকে তাকিয়ে। দেখতেই থাকে যখন তাকে আর দেখাই সম্ভব ছিলো না—কারণ সে তো আর তখন তার জীবনের কোনো উৎপাত বা জ্বালাতন নয়, বরং সমুদ্রের দিকচক্রবালে নিছকই কাল্পনিক একটা ফুটকিই যেন।

১৯৬৮

পরিশিষ্ট ১

উইলিয়াম ফকনারের নোবেল পুরস্কার ভাষণ

কোনো ব্যক্তিমানুষ হিশেবে এই পুরস্কার আমাকে দেয়া হয়েছে ব'লে আমার মনে হয়নি, বরং দেয়া হয়েছে আমার কাজকে—মানবাত্মার মর্মযন্ত্রণা ও স্বেদরক্ত নিয়ে এক সারাজীবন-জোড়া কাজ, কোনো গৌরব জুটবে ব'লে যে-কাজ করা হয়নি, আর কোনো-কিছু লাভ করবার জন্যে তো নয়ই ; কাজটা ছিলো এই : মানবাত্মার বিভিন্ন উপাদান নিয়ে এমন-কিছু সৃষ্টি করতে হবে আগে যার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। কাজেই পুরস্কারটি যে আমার তা শুধু এই অর্থে যে আমি নিছক তার অছি মাত্র। এটা আমি বলতে পারি এর উৎসমুহূর্তের অভিপ্রায় বা তাৎপর্যের সঙ্গে মানানসই কোনো উদ্দেশ্যে এই অর্থ উৎসর্গ করা কোনো কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু আমি এই জয়ধ্বনির বেলাতেও সেই একই কাজ করতে চাই : এই মুহূর্তটিকে আমি ব্যবহার করতে চাই একটি শিখর হিশেবে যেখান থেকে [কথা বললে] হয়তো আমার কথা [আজকের সেই] তরুণতরুণীরা শুনতে পাবেন যাঁরা এর মধ্যেই নিজেদের উৎসর্গ করেছেন সেই একই মর্মযন্ত্রণা ও সৃষ্টিবেদনায় : এঁদের মধ্যে হয়তো এখনই এমন-কেউ আছেন যিনি, এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, [ভবিষ্যতে] একদিন সেখানে এসে দাঁড়াবেন।

আজ আমাদের ট্র্যাজেডি একটি বিশ্বজোড়া সর্বব্যাপক এক শারীরিক আতঙ্ক—এতদিন ধ'রে এই আতঙ্ক আমরা বহন ক'রে এসেছি, কিন্তু এখন তা একেবারেই অসহনীয় হ'য়ে উঠেছে। আত্মার কোনো সমস্যাই আমার নেই। এখন শুধু এই প্রশ্নই আছে : কখন আমাকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়া হবে। এইজন্যেই আজ যে-তরুণতরুণীরা লিখছেন তাঁরা ভুলেই গিয়েছেন নিজের ভেতরকার সমস্যায় মানব-হৃদয় কী-রকম জট পাকিয়ে গিয়েছে—অথচ তা-ই শুধু ভালো লেখার জন্ম দিতে পারে, কেননা শুধু তা-ই লেখার যোগ্য, সব মর্মযাতনা আর স্বেদরক্তের যোগ্য।

তাঁকে আবার ফিরে শিখতে হবে সব। নিজেকে তাঁকে শেখাতে হবে সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে অধম হ'লো আতঙ্কে-ঝুঁকড়ে-গুটিয়ে-যাওয়া ; আর নিজেকে তা শেখাবার পর, বরাবরের জন্যে তা ভুলে যেতে হবে, তাঁর কারখানাঘরে হৃদয়েরই

পুরোনো সব সত্য আর বিধান ছাড়া আর-কিছুই যেন না-থাকে, সেই পুরোনো বিশ্বব্যাপক সত্যগুলো—যা না-থাকলে সব গল্পই হয় ক্ষণস্থায়ী আর নরকগামী—ভালোবাসা আর ইজ্জৎ আর মর্যাদাবোধ আর দয়া ও দরদ আর গর্ব আর আত্মত্যাগ। যতদিন-না তিনি তা করছেন, তিনি পরিশ্রম ক'রে চলবেন এক অভিশাপের মধ্যে। তিনি লিখছেন—না, ভালোবাসার কথা নয়, কামের তাড়নার কথা; লিখছেন এমন পরাজয়ের কথা যেখানে একফোঁটাও মায়ামমতা বা দয়াদরদ নেই। তাঁর শোক কোনো বিশ্বব্যাপী অস্থিপঞ্জর নিয়ে আর্ত নয়—কোনো ঘা কোনো ক্ষতই তিনি রেখে যান না। তিনি হৃদয়ের কথা লেখেন না, লেখেন গ্রন্থি ও গ্রন্থিরসের কথা।

যতদিন-না এ-সব জিনিশ তিনি ফিরে শিখছেন তিনি এমনভাবে লিখবেন যেন তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কেবলই দেখে চলেছেন মানুষের সংহার, মানুষের অবসান। আমি মানুষের অবসান মেনে নিতে অ স্বী কা র করি। এটা বলা খুবই সহজ যে মানুষ অমর কেননা সে টিকে থাকবে: যখন সর্বনাশের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠবে ঢং ঢং ঢং আর শেষ মূল্যবিহীন শিলাখণ্ড ঝুলে থাকবে শেষ রক্তিম ও মুমূর্ষু সন্ধ্যায়, এমনকী তখনও সেখানে আরো-একটা ধ্বনি থাকবে: সেটা তার ক্ষীণ কিন্তু অফুরন্ত কণ্ঠস্বর, সে কিন্তু তখনও কথা ব'লে যাবে। আমি এটা মেনে নিতে প্র ত্যা খ্যা ন করি।

আমার বিশ্বাস মানুষ শুধুই টিকে থাকবে না—সে সফলতা পাবে। সে অমর—কিন্তু সেটা এই কারণে নয় যে প্রাণীদের মধ্যে শুধু তারই এক অফুরান কণ্ঠস্বর আছে; বরং এই কারণে যে তার আত্মা আছে—সেটা এমন-এক সত্তা যেটা মায়ামমতা ও আত্মত্যাগ ও ধৈর্যসহিষ্ণুতায় ভরপুর। কোনো কবির, কোনো লেখকের, কর্তব্য শুধু এই নিয়েই লেখা। তাঁর যে-বিশেষ অধিকার আছে, মানুষের হৃদয়কে উন্নীত ক'রে তিনি যে ধৈর্যসহিষ্ণুতায় বাঁচতে সাহায্য করতে পারেন, তাকে তিনিই মনে করিয়ে দিতে পারেন স্পর্ধা আর সাহস আর সম্মান আর আশা আর অহমিকা আর মায়ামমতা আর আত্মত্যাগ যা ছিলো তার অতীতমহিমা। নিছক মানবস্বরের প্রতিলিপি হ'য়ে-থাকার তো দরকার নেই কবির স্বরের, সেটা নানা কৃৎকৌশলের একটা হ'তে পারে, বরং আসল খুঁটিকৌশল একটাই হ'তে পারে—যা অসীম সহিষ্ণুতায় তাকে টিকিয়ে রেখে সাফল্য অর্জন করতে তাকে সাহায্য করবে।

স্টকহোম, ডিসেম্বর ১০, ১৯৫০

লাতিন আমেরিকার নিঃসঙ্গতা

গার্সিয়া মার্কেসের নোবেল পুরস্কার ভাষণ

আন্তোনিও পিগাফেত্তা—তিনি ফ্লোরেন্সের এক নাবিক, মাগেলানের প্রথম বিশ্বভ্রমণে তিনি ছিলেন তাঁর সহযাত্রী—লিখেছেন, আমাদের মধ্যরেখাসংলগ্ন আমেরিকা মহাদেশ দিয়ে যাবার সময়, এক প্রখর-যথাযথ কালপঞ্জি, যেটা মনে হয়, তাঁর [যথাযথ হবার দাবি সত্ত্বেও] কল্পনায় এক তুলকালাম লাগামছেঁড়া অভিযান। তিনি বর্ণনা করেছেন তিনি নাকি এমন শুওর দেখেছেন যাদের নাভিকুণ্ডলি ছিলো তাদের পিঠে _ পেটে নয়], নাকি দেখেছেন এমন অনেক পাখির প্রজাতি যাদের পা নেই, মেয়েগুলো ডিম পেড়ে তা দিচ্ছে তাদের পুরুষগুলোর পিঠে, আর এমন কোনো-কোনো পাখি যাদের দেখতে অ্যালবাট্রসের মতো, দেখেছেন এমন পাখি যাদের জিভ নেই, যাদের চঞ্চুগুলো যেন একেকটা শান-দেয়া ছুরির ফলা; পিগাফেত্তা বলেছেন তিনি দেখেছেন স্থগিতবৃদ্ধি সব প্রাণী—তাদের মুণ্ড আর কানগুলো খচ্চরের মতো, শরীরটা উটের, পাগুলো হরিণীর, আর মৃদু হ্রেষাধ্বনিগুলো ঘোড়ার। তিনি বলেছেন পাতাগোনিয়ায় প্রথম যে-বাসিন্দাটির সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিলো তাকে তাঁরা একটা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন, আর তার নিজের প্রতিরূপ দেখে নাকি আতঙ্কে উত্তেজিত সেই মানুষটির বুদ্ধিশুদ্ধি সব অমনি লোপ পেয়ে গিয়েছিলো।

এই ছোট্ট দুর্ধর্ষ মনোমুগ্ধকর পুথিটি—এরই মধ্যে সে তো একটু-আধটু দেখাতে শুরু করেছে আমাদের আজকের সব আখ্যায়িকার বীজগুলো—আমাদের বাস্তবতারই একটি অতীব বিস্ময়কর স্বীকৃতিপত্র, এবং তা ঐ সময়ের বাস্তবতারও দলিল। ইণ্ডিয়াগুলোর কালপঞ্জিলেখকরা আমাদের আরো-অগুনতি [লেখা] উত্তরাধিকার হিসেবে দিয়ে গিয়েছেন। এল দোরাদো, আমাদের সেই অলীক এবং বিপুলভাবে গূঢ়-লেখাঙ্কিত দেশটি, বহু-বহু দীর্ঘ বছর জুড়ে অগুনতি মানচিত্রে দেখা দিয়েছে—মানচিত্রআঁকিয়েদের কল্পনা অনুযায়ী সে অবশ্য তার আকৃতি আর অবস্থান বারে-বারে পালটেছে। চিরযৌবনের ফোয়ারার খোঁজে বেরিয়ে পৌরাণিক আলভার নুনিয়েস

কাবেসা দে ভাকা ন-বছর ধ'রে অন্তত ক'রে সন্ধান চালিয়েছিলেন মেহিকোর উত্তরে খ্যাপাটে এক অভিযানে যার শেষে অভিযাত্রীরা পরস্পরকে খেয়ে ফেলেছিলো—যে-ছশো জন অভিযানে বেরিয়েছিলো তার মধ্যে শেষটায় মাত্র পাঁচজন বেঁচে ফিরেছিলো। অনেক যে-সব রহস্যের কোনো সমাধান করা যায়নি তার মধ্যে একটা হ'লো এগারো হাজার খচ্চরের রহস্য, যাদের প্রত্যেকের পিঠে চাপানো ছিলো একশো পাউণ্ড ক'রে সোনার তাল : তারা একদিন বেরিয়েছিলো কুস্কো থেকে, আতাউআলপার মুক্তিপণ পৌঁছে দেবে ব'লে, অথচ কোনোদিনই যারা তাদের গন্তব্যে এসে পৌঁছোয়নি। পরে, উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া যখন পুরোদমে চলেছে, দ্বীপের মধ্যে পালন করা হয়েছিলো কিছু মুরগি, যাদের বিক্রি করা হয়েছিলো কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াসে, আর তাদের পাকস্থলির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিলো খুদে-খুদে সোনার ঢেলা। সোনা সম্বন্ধে আমাদের প্রতিষ্ঠাতাদের এই তীব্র লালসা ও আবেশ আমাদের পেছন-পেছন ধেয়ে এসেছে এই কিছুকাল আগে অব্দি। এই-তো, গত শতাব্দীতেও, এক আলেমান শিবির—তাদের ওপর দায়িত্ব ছিলো পানামার যোজকের মধ্য দিয়ে রেলপথ তৈরির সম্ভাবনা কতটা খতিয়ে দেখা—শেষটায় এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলো যে প্রকল্পটি কাজে পরিণত করা যেতেই পারে, তবে একটাই শর্ত : রেলপথগুলো যেন লোহায় বানানো না-হয়, সে-ধাতু এ-অঞ্চলে দুর্লভ, বরং যেন বানানো হয় সোনায়।

এস্পানি অধীনতা থেকে মুক্তিলাভও কিন্তু আমাদের এই অস্থির বিকার থেকে রেহাই দেয়নি। হেনেরাল আন্তোনিও লোপেস দে সান্তানা, তিন-তিনবার যিনি মেহিকোর একনায়ক বা ডিক্টেটর হয়েছিলেন, কবর দিয়েছিলেন, বেজায় জমকালো এক অন্ত্যেষ্টি উৎসবে, তাঁর ডান পা—যেটা তিনি খুইয়েছিলেন তথাকথিত 'পিঠে-পার্বণের যুদ্ধে' [ওয়ার অভ দি কেকস]। হেনেরাল গাবরিয়েল গার্সিয়া মোরেনো ষোলো বছর শাসন করেছিলেন একুয়াদোর, পরম ভট্টারক একচ্ছত্র অধিপতি হিশেবে, আর তাঁর মৃতদেহ, বর্মখচিত পদকভূষিত, পুরো জমকালো উর্দির কাফনে সাজিয়ে, বসানো ছিলো রাষ্ট্রপতির সিংহাসনে। হেনেরাল মাক্সিমিলিয়ানো এরনান্দেস মার্তিনেস—এল সালভাদোরের সেই দিব্যজ্ঞানী স্বৈরাচারী শাসক—যিনি এক বর্বর নৃশংস নির্বিচার তাণ্ডবে বধ করেছিলেন তিরিশ হাজার চাষীকে—একটা ঘড়ি উদ্ভাবন করেছিলেন যেটা ব'লে দিতো তাঁর খাবারে কোনো বিষ দেয়া হয়েছে কিনা, স্কারলেট ফিভারের মহামারীর প্রকোপ থেকে লোককে বাঁচাবার জন্যে তিনি নিদান দিয়েছিলেন আলোগুলো সব লাল কাগজে মুড়ে রাখতে হবে।

জেনেরাল ফ্রানসিস্কো মোরাসান-এর স্মৃতিস্তম্ভ, তেগুসিগালপার প্রধান স্কোয়ারে সেটা বসানো হয়, আসলে ছিলো মার্শাল নেই-এর একটা প্রতিমূর্তি, প্যারীর এক সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ভাস্কর্যশিল্পের দোকান থেকে সেটা কিনে আনা হয়।

এগারো বছর আগে, আমাদের কালের একজন অতি সুপ্রসিদ্ধ কবি, চিলের পাবলো নেরুদা, এই সীমান্ত [স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া] আলো ক'রে তুলেছিলেন তাঁর ভাষণে। ইওরোপের সুবিবেককে—কখনো-কখনো অবশ্য তার নৃশংস বিবেকদংশনেও—সেখানে ফেটে পড়েছিলো, আগের চাইতেও অনেক বেশি আবেগতাড়নায় ও প্রেরণায়, লাতিন আমেরিকার মায়ামূর্তির বার্তা—লাতিন আমেরিকা, সেই বিশাল ভূখণ্ড—দিব্যভ্রষ্টা পুরুষ ও ইতিহাসখ্যাত নারীদের সেই দেশ যাদের অনিঃশেষ প্রতিরোধে জট পাকিয়ে গেছে সব ব্যাপারটা—সব পুরাণ-কিংবদন্তি-পুরাবৃত্ত। কখনও একটিও শান্ত সুস্থির মুহূর্ত ছিলো না আমাদের।

একজন প্রমেথিউসকল্প রাষ্ট্রপতি [চিলের সালভাদোর আইয়েন্দে] তাঁর শিখাদাউদাউ প্রাসাদে নিহত হয়েছেন একটা আস্ত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে একা লড়াই করতে-করতে, আর দুটি ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা—সন্দেহ প্রচণ্ড হ'লেও কখনও যদিও তার কোনো স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা হয়নি—ছিনিয়ে নিয়েছিলো আরো-একটি মহান হৃদয় এবং সেই সঙ্গে সামরিক গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বকেও যিনি তাঁর দেশের মানুষের হৃত সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছিলেন। ঘটেছে পাঁচ-পাঁচটা যুদ্ধ এবং সতেরোটা কু দে'তা, উঠে এসেছে এক লুসিফারপ্রতিম একনায়ক, যে ঈশ্বরের নাম ক'রে প্রথম নির্বিচার জাতিহত্যা চালিয়েছে আমাদের কালের লাতিন আমেরিকায়। এদিকে দু-বছর বয়েসে পড়বার আগেই কুড়ি লক্ষ লাতিন আমেরিকায় শিশু ম'রে যাচ্ছে, ১৯৭০ থেকে ইওরোপে যত শিশু জন্মেছে তাদের মোট যোগফলের চাইতেও বেশি। দমননীতির ফলে যারা উধাও হ'য়ে গিয়েছে তাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার, এ যেন আজকে যদি উপসালা নগরীর সব মানুষ কোথায় মিলিয়ে গেলো তা-ই কেউ জানতে পেলো না। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক গ্রেফতার হয়েছে পোয়াতি অবস্থায়, আর্হেন্তিনার জেলে-হাজতে জন্ম দিয়েছে তাদের শিশু, কিন্তু মায়েরা কেউ জানেও না কোথায় গেছে তাদের সন্তান অথবা কী-ই বা এখন তাদের পরিচয়—গোপনে, চোরাগোপ্তাভাবে, তাদের বেচে দেয়া হয়েছে যারা ছেলেপুলে দত্তক নিতে চায় তাদের কাছে অথবা তাদের অন্তরীণ ক'রে রাখা হয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষের অনাথ আশ্রমে। ঘটনাটা যাতে এই পথে আর না-এগোয় সেজন্যে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এই মহাদেশে প্রায় দু-লক্ষ

নারী-পুরুষ নিহত হয়েছেন—আর একলক্ষরও বেশি মানুষ তিনটে ছোট্ট স্বেচ্ছাচারী দেশে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হ'য়ে চলেছেন: নিকারাগুয়া [সান্দিনিস্তারা তখন কোন্ত্রাদের সঙ্গে মরণপণ লড়ছে], এল সালভাদোর আর গুয়াতেমালায়। এ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হ'তো তবে সমানুপাতিক সংখ্যা হ'তো মাত্র চার বছরে একলক্ষ ষাটহাজার মৃত্যু।

চিলে, সেই দেশ যার ঐতিহ্য অতিথিবৎসল, সেই দেশ থেকে দশ লক্ষেরও বেশি লোক পালিয়ে গিয়েছেন: তার জনসংখ্যার দশ শতাংশ। উরুগুয়াই, খুদে একটা দেশ, জনসংখ্যা পঁচিশ লক্ষ, যাকে মনে করা হ'তো এই মহাদেশের সবচাইতে সুসভ্য দেশ, সেখানে প্রতি পাঁচজনে একজন ক'রে নির্বাসনে আছেন। ১৯৭৯ থেকে এল সালভাদোরে যে-গৃহযুদ্ধ চলেছে, সেখানে প্রায় প্রতি কুড়ি মিনিট পর-পর একজন ক'রে শরণার্থী দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন। যদি লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের নির্বাসিতদের নিয়ে একটা দেশ গড়া হয় তবে তার জনসংখ্যা নরওয়ের সমগ্র জনসংখ্যাকেও বহুগুণ ছাপিয়ে যাবে।

আমার [অন্তত] এটা ভাবতে সাহস হয় যে এই বিশাল বাস্তবতাই—শুধু তার সাহিত্যিক অভিব্যক্তিই নয়—এ-বছর [১৯৮২] সুইডেনের সাহিত্য অ্যাকাডেমির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটা এমন-এক বাস্তবতা যেটা শুধুমাত্র কাগজের পাতাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যেটা সবসময় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে বাঁচে, প্রতি মুহূর্তে নির্ধারণ করে অগুনতি দৈনন্দিন মৃত্যু, যেটা খাদ্য জোগায় এক চিরঅতৃপ্ত সৃষ্টির প্রবাহকে, লাঞ্ছনা নির্যাতনে দুর্ভাগায় ভরা, সেইসঙ্গে সৌন্দর্যময়, দীপ্ত, এই পলাতক ও স্মৃতিমেদুর কোলোম্বিয়ার মানুষটি নিছক ভাগ্যের বদান্যতা পাওয়া মানুষ ছাড়া আর-কিছু নয়। কবি ও ভিক্ষুক, সংগীতস্রষ্টা ও প্রবক্তা, যোদ্ধা ও বদমায়েশ—সেই ঘোর দৌরাত্ম্যেভরা বাস্তবতার সমস্ত জীব, কল্পনার কাছে আমাদের অতি অল্প অনুদানই চাইতে হয়, কারণ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধ এটাই যে আমাদের চাই নতুন কৃৎকৌশল—আমাদের জীবনকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলবার জন্যে প্রচলিত কৃৎকৌশলে মোটেই কুলোয় না। এটাই, কোম্পানিয়েরোগণ, আমাদের নিঃসঙ্গতার সবচাইতে জটিল ঘোঁট।

যদি, তাহ'লে, এই-যে-সব অসুবিধে আমাদের পদে-পদে বাধা দেয়, আমরা যারা তারই নির্যাস, আমাদের এটা বুঝতে মুশকিল হয় না যে কেন জগতের এ-প্রান্তে যুক্তিশৃঙ্খলার প্রতিভা, নিজেদের সংস্কৃতির দিগ্বিজয়ের উল্লাসে যা ভরপুর, আমাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করবার জন্যে নির্ভরযোগ্য কোনো পদ্ধতি বার করতে

পারেনি। এটাও বোঝা যায় যে কেন তারা আমাদের মাপতে চায় সেই একই গজকাঠি দিয়ে যেটা দিয়ে তারা নিজেদের মাপে, এটা তারা ভুলে যায় যে জীবনের যে-অপূরণীয় ক্ষতি তা মোটেই সকলের জন্যে সমান [বা একরকম] নয়, কারু নিজের তারুণ্যের সমান তেমনি দুঃসাধ্য ও রক্তাপ্লুত যেমন একদিন সেটা তাদের নিজেদের ছিলো। অন্য লোকের নকশা বা সংহিতা দিয়ে আমাদের বাস্তবতার আকার-আখ্যান দেবার চেষ্টা প্রতিবারই কেবল আমাদের ব্যবধান ও অপরিচয়ই বাড়িয়ে যায়, প্রতিবারই আরো-বেশি রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে তা, প্রতিবারই আরো-বেশি নিঃসঙ্গ। হয়তো মাননীয় ইওরোপ আমাদের একটু বুঝতে পারতো যদি সে আমাদের দেখতে চেষ্টা করতো তার নিজের পুরাবৃত্তের মধ্য দিয়ে। যদি এটা মনে করা যায় যে লণ্ডনের প্রথম গড়পরিখা তৈরি করতে তার তিনশো বছর লেগেছিলো, আর আরো একশো বছর লেগেছিলো নিজেদের একজন বিশপ পেতে, যদি মনে করতো যে কোনো এট্রুস্কীয় নরপতি তাকে ইতিহাসে রোপণ করার আগে রোম কুড়িটি শতাব্দী কাটিয়েছিলো অনিশ্চয়তার তমসায়, যদি মনে করতো যে এমনকী ষোড়শ শতাব্দীতেও আজকের 'শান্তিপ্রিয়' সুইৎজারল্যাণ্ডের মানুষ যারা আমাদের লোমহর্ষ বাড়িয়ে দেয় তাদের স্নিগ্ধ পনীর আর তাদের দুর্মর সব ঘড়ি দিয়ে, সারা ইওরোপ লণ্ডভণ্ড তোলপাড় ক'রে বেড়িয়েছিলো লুণ্ঠনপ্রিয় দস্যু হিশেবে। এমনকী রেনেশাঁসের অপরাহ্ণ-তেও সম্রাটের বাহিনীর বারো হাজার ভাড়াটে ধনুর্ধর অবাধ লুঠতরাজ চালিয়ে সর্বনাশ ঘটিয়েছিলো রোমের, আর ছুরির ঘায়ে জবাই করেছিলো তার আট হাজার বাসিন্দাকে।

আমি টোনিও ক্রোগারের বিভ্রমকে মূর্তিমন্ত ক'রে তুলতে চাচ্ছি না — অপাপবিদ্ধ উত্তর আর ইন্দ্রিয়াসক্ত দক্ষিণের মধ্যে মিলনের যে-স্বপ্ন সে দেখেছিলো, তা তিয়াত্তর বছর আগে টোমাস মানকে এখানে রোমাঞ্চিত ক'রে তুলেছিলো। তবে আমি বিশ্বাস করি আলোকপ্রাপ্ত সত্তার ইওরোপীয়েরা, যাঁরা এখানেও সংগ্রাম ক'রে চলেছেন আরো-মানবিক আরো-ন্যায়পরায়ণ কোনো মাতৃভূমির জন্যে, তাঁরা আমাদের অনেকবেশি সাহায্য করতে পারতেন যদি তাঁরা গভীরভাবে পরিমার্জিত ক'রে নিতে পারতেন আমাদের দিকে তাকাবার ধরনটাকে। আমাদের স্বপ্নগুলোর সঙ্গে সংহতির বোধ আমাদের যে কম নিঃসঙ্গতা অনুভব করাবে তা নয় — যদি-না বৈধ অনুমোদনের ক্রিয়াকলাপ মারফৎ তাঁরা তাকে মূর্ত ক'রে তুলতে না-পারেন, জনতার সঙ্গে ব্যাবহারিক সম্পর্ক মারফৎ অলীক আশার উদ্দেশে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

লাতিন আমেরিকা চায় না, তার সে-সংগতি বা উপায়ও নেই, পশ্চিমের খেলার ছকে সেই বিশপ হ'তে যেখানে তার নিজের ইচ্ছা ব'লে কিছু থাকবে না—তার স্বাধীনতার পরিকল্পনা ও মৌলিকতা বিষয়ে এমন অদ্ভুত দানবীয় কিছুও তার নেই যে সে পশ্চিমের প্রত্যাশায় নিজেকে দীক্ষিত করবে। তৎসত্ত্বেও, নৌযাত্রার অগ্রগতি আমাদের আমেরিকাগুলো আর ইওরোপের মধ্যে অনেক দূরত্বই কমিয়ে ফেলেছে, অন্যদিকে আবার মনে হয় বাড়িয়েও দিয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক দূরত্ব। এটা কেন হবে যে সর্বান্তঃকরণে আমাদের যে-মৌলিকতা স্বীকার করা হয়েছে, সামাজিক পরিবর্তনের কাজে সেই আমাদেরই কঠিনপ্রখর সংগ্রামকে সন্দেহের চোখে দেখা হবে—কেন সমাজবদলের চেষ্টায় তার মৌলিকতাকে অস্বীকার করা হবে? কেন ভাবা হবে যে যে-সামাজিক ন্যায়বিচার, যা অগ্রসর ইওরোপীয়রা নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠা করেছে, তা লাতিন আমেরিকী লক্ষ্য নয়—ভিন্ন অবস্থায় স্পষ্ট ভিন্ন পদ্ধতি সমেত তার ন্যায়বিচারের দাবি কেন মানা হবে না? নাঃ, আমাদের ইতিহাসের হিংসাহিংস্রতা আর দুঃখবেদনা তো সেই চিরপুরাতন ও তিক্ত অন্যায় বিচারেরই ফল সংখ্যা যাদের অপরিমেয়—এমনকী যে-পলাবদ্ধযন্ত্র হিংসা-হিংস্রতা তা দিয়ে ডিম ফুটিয়ে বার করা হয়েছে আমাদের ভবন থেকে সাড়ে-তিন হাজার লিগ দূরে। কিন্তু অনেক ইওরোপীয় নেতা ও চিন্তাবিদ বিশ্বাস ক'রে এসেছেন দুই বিরাট প্রভুর দয়া ছাড়া অন্য-কোনো সম্ভাব্য ভবিতব্য আমাদের নেই। এইই হ'লো, কোম্পানিয়েরোগণ, আমাদের নিঃসঙ্গতার আকৃতি।

তৎসত্ত্বেও, সমস্ত দমনপীড়ন, নির্যাতন, লুঠতরাজ, আত্মবিক্রয় সত্ত্বেও, আমাদের উত্তর হচ্ছে: জীবন। না বন্যা না মহামারী, না বুভুক্ষা না প্রলয়-ঝড়, এমনকী শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে চিরকাল-চলা যুদ্ধবিগ্রহেও মৃত্যুর ওপর জীবনের নাছোড় প্রাধান্যকে হ্রাস ধ'রে দিতে পারেনি। এ এমনই এক সুযোগ বা অধিকার যে তা ক্রমবৃদ্ধি পায়, দ্রুত হারে বাড়ে: প্রতিবছর সেখানে মৃত্যুর চাইতেও, বেশি হয় নবজন্ম ৭৪,০০০,০০০—নব-জীবনের এ এক এমন পরিমাণ যা নিউ-ইয়র্কের জনসংখ্যাকে প্রতিবছর সাতগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। তাদের বেশির ভাগই জন্মায় এমন-সব দেশে যাদের বিত্তসম্পদ খুবই কম, আর তাদের মধ্যে বলাই বাহুল্য আছে লাতিন আমেরিকা। অন্যদিকে, অধিকতর সমৃদ্ধ দেশগুলো যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করার ব্যাপারে এমনই সাফল্য লাভ করেছে যে তার একশোগুণ লোককে তারা মুহূর্তে নির্মূল ক'রে দিতে পারে, শুধু-যে আজকের পৃথিবীর সব

মানুষকেই নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে তা নয়, এই দুর্ভাগা গ্রহে এ-যাবৎ যত মানুষ জন্ম নিয়েছে সাকুল্যে তাদের সকলকেই ধ্বংস ক'রে দিতে পারে।

আজকেরই মতো অন্য-একটি দিনে আমার গুরু, মায়েস্ত্রো, উইলিয়াম ফকনার এখানে বলেছিলেন : 'মানুষের অবসান মেনে নিতে আমি অস্বীকার করি।' যে-আসন একদিন তাঁর ছিলো সে-আসনে বসবার যোগ্য ব'লে আমি নিজেকে মনে করতাম না যদি-না আমার বিবেকে এই সত্য অবিচল থাকতো যে মানুষের জন্ম হবার পর এই প্রথম যে অতিকায় মহাপ্রলয় তিনি বত্রিশ বছর আগে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন তা আজ সহজ সরল বৈজ্ঞানিক সত্য [ও সম্ভাবনা]। এই করাল বাস্তবতার সামনে—সমস্ত মানুষী কালে যাকে মনে হয়েছিলো নিছক কোনো কল্পলোক ব'লেই, আমরা যারা কথা বানাই, কাহন গড়ি, আমরা তবু কিন্তু বিশ্বাস করি সবকিছু, বিশ্বাস করবার দাবি ও অনুভূতি রাখি যে এখনও এক বিকল্প / বিরুদ্ধ কল্পরাজ্য গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করার সময় আছে—এখনও সময় চ'লে যায়নি। এক নূতন ও সব-সমান-করা কল্পরাজ্য—জীবনেরই কল্পরাজ্য—যেখানে অন্যদের কাছে আর-কেউ এসে ঠিক ক'রে দেবে না তার মৃত্যুর রূপ কী হবে, যেখানে, সত্যিই, ভালোবাসা হয়ে উঠবে নিশ্চয় আর সুখ হ'য়ে উঠবে সম্ভব, যেখানে যে-সব দেশ একশো বছরের নিঃসঙ্গতার দণ্ড পেয়েছে, শেষটায়, চিরকালের জন্যে, পাবে পৃথিবীতে এক দ্বিতীয় সুযোগ।

১৯৮২

সরলা এরেন্দিরা আর তার সঙ্গীসাথীরা

নিবেদন

'সরলা এরেন্দিরা আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী' (লা ইনক্রেইব্‌লে ই ত্রিস্তে ইস্তোরিয়া দ্য লা কান্‌দিদা এরেন্দিরা ই দে সু আবুয়েলা দাল্‌মাদা) বেরিয়েছিলো ১৯৭২ সালে। 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' (সিয়েন আনিওস দে সোলেদাদ, ১৯৬৭) আর 'কুলপতির হেমন্ত' (এল্ ওতোনিয়ো দেল্ পত্রিয়ার্কা, ১৯৭৫) মধ্যবর্তী সময়ে, প্রথমে চিত্রনাট্য হিশেবেই "সরলা এরেন্দিরা"র কাহিনীকে ভেবেছিলেন গার্সিয়া মার্কেস — কিন্তু তাঁর কাছে আরো জরুরি ছিলো 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র রচনাকৌশল ও শৈলী পালটে ফেলে 'কুলপতির হেমন্ত'র জন্যে নতুন-কোনো কৃৎকৌশল আবিষ্কার করা : 'সরলা এরেন্দিরা' বইয়ের সাতটি গল্পের মধ্যে ছটি গল্প ("হারানো সময়ের সমুদ্র" প্রকাশিত হয়েছিলো 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র আগে, ১৯৬২তে) সেই নতুন রচনাভঙ্গি আবিষ্কার করার চেষ্টা হিশেবেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্য যে-ছটি গল্প তাদের রচনাকাল এইরকম : "বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো" ১৯৬৮, "বিশ্বের সবচেয়ে-সুন্দর-জলে-ডোবা পুরুষ" ১৯৬৮, "ভুতুড়ে জাহাজের শেষ পাড়ি" ১৯৬৮, "অলৌকিকের ফিরিওলা সাধু ব্লাকামান" ১৯৬৮, আর "মৃত্যুই ধ্রুব প্রণয়ের পরপারে" ১৯৭০। কোনো-এক অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে, পাঠকদের ধাঁধায় ফেলে, ইংরেজি তর্জমায় অবশ্য 'সরলা এরেন্দিরা'র এই গল্পগুলোর বদলে গ্রথিত হয়েছে অন্য-আরো গল্প, প্রধানত তাঁর প্রথম যৌবনে লেখা, যে-সব এতদিন নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো আর গার্সিয়া মার্কেসও যাদের ভুলে যেতে চাচ্ছিলেন, পরে সম্ভবত বোম্বেটেদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই গার্সিয়া মার্কেস এগুলো ইংরেজিতে ছাপাবার অনুমতি দেন; প্রথম যখন ঐ-সব প্রথম দিককার গল্প নিয়ে এস্পানিওলে বোম্বেটে সংস্করণ বেরোয়, তখন গার্সিয়া মার্কেসের পরামর্শ ছিলো : 'ও গল্পগুলি পড়বেন না। যদি একান্তই পড়তে ইচ্ছে করে তবে কিনবেন না—বইয়ের দোকান থেকে চুরি ক'রে নেবেন।' পুরোনো সেই গল্পগুলোকে গার্সিয়া মার্কেস

আবর্জনার ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলতে বললেও সেটা মানবার কোনো কারণ নেই—কারণ এদের মধ্য দিয়ে একজন তরুণ লেখক কী-ক'রে বিশ্বের সর্বাগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিকদের একজন হ'য়ে উঠলেন, সে-ইতিহাস অনুসরণ করা সম্ভব। এখানে শুধু এটা মনে রাখা উচিত আমাদের এই 'সরলা এরেন্দিরা' সংকলন তৈরি হয়েছে মূল এস্পানিওল সংস্করণটিকে অনুসরণ ক'রেই—শুধু অনুবাদকের আলোচনাটি ছাড়া আমরা করনার ও গার্সিয়া মার্কেসের নোবেল পুরস্কার ভাষণ দুটি এখানে জুড়ে দিয়েছি, যা, মনে হয়, গার্সিয়া মার্কেসকে বোঝবার জন্যে অনেক দিক দিয়েই জরুরি।

এই অনুবাদগুলো বিভিন্ন সময়ে নানা সাময়িকপত্রে বেরিয়েছিলো, যেমন: 'বিভাব', 'যুগান্তর' রবিবাসরীয়, 'সাহিত্য রবিবাসর' ইত্যাদি। এই সুযোগে সম্পাদকদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না'-র মতো এ-বই প্রকাশের ব্যাপারে ভূর্জপত্র প্রকাশনসংস্থা যে-আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়েছেন তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। প্রুফ দেখার সময় শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহাস্য সহায়তার কথাও এখানে কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করি।

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সরলা এরেন্দিরা আর তার সঙ্গীসাথীরা

সংবাদ মূলত কাব্য

জিরাফ আবার ফিরে এলো

এখন আর কোনোই সন্দেহ নেই যে গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস আজকের পৃথিবীর সর্বাগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম। তাঁর প্রধান বইগুলোর মধ্যে শুধু-যে গল্প-উপন্যাসই আছে তা নয়, আছে সাংবাদিকেরা খবরকাগজে যে-'গল্প' ছাপেন তারও সংগ্রহ। অর্থাৎ গার্সিয়া মার্কেস কেবল কাল্পনিক আখ্যানই রচনা করেননি, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে সংবাদ-আখ্যানও রচনা করেছেন—আমরা পরে দেখতে পাবো তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার সময় সেই সংবাদ-আখ্যানগুলোর কথা মনে রাখা কেন এত জরুরি। 'জাহাজডোবা নাবিকের কাহিনী', 'আমি যখন সুখী ছিলাম আর যখন দলিলভুক্ত হইনি', 'চিলের রাস্তায় চোরাগোপ্তা : মিগেল লিত্তিনের রোমাঞ্চকর অভিযান'—শুধু এ-সব বইই যে সে-দিক থেকে স্মরণযোগ্য তা নয়, নিচের এই সংবাদ-আলেখ্যগুলোও মনে রাখা উচিত : 'সালভাদোর আইয়েন্দের মৃত্যু', 'ভিয়েৎনাম যুদ্ধ', 'অ্যাঙ্গোলায় বিজয়-অভিযান', 'লা ভিওলান্দিয়ার উপন্যাসগুলো নিয়ে দুটি কি তিনটি বিষয়', আর্নেস্ট হেমিংওয়ের আত্মহত্যা বিষয়ে লেখা 'স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে একজন মানুষের' ইত্যাদি রচনা নিছকই সাময়িকপত্রের অস্থায়ী বা সাময়িক চাহিদা মেটায়নি। সাংবাদিক গার্সিয়া মার্কেস কয়েক বছর আগে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিলেন—জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিবেদন দেবার জন্যে। সাংবাদিক বা কথাসাহিত্যিক গার্সিয়া মার্কেসকে আলাদা ক'রে দেখার কোনো দরকার নেই—কারণ দুজনেরই কাজ আখ্যানরচনা। আখ্যায়িকার রূপ ভিন্ন হ'তে পারে, ভিন্ন হ'তে পারে অভিপ্রায় ও লক্ষ্য, কিন্তু গার্সিয়া মার্কেস তাঁর অসংখ্য সাক্ষাৎকারে একাধিক-বার বলেছেন কল্পনার মধ্যে বাস্তবের অনুপ্রবেশ কীভাবে ঘটে, সেটা কাগজে-কলমে বোঝবার জন্যে কোনো লেখক সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি নিলে ভালো করবেন : বিশুদ্ধ কল্পনা আসলে সোনার পাথরবাটির মতোই অপ্রাপ্ত ও অলীক।

এস্পানিওল ভাষায় গার্সিয়া মার্কেসের বই আজ যেকোনোবারই লক্ষ-লক্ষ কপি বিক্রি হয়, পৃথিবীর নানা ভাষায় তাঁর লেখা তর্জমা হয়, তাঁর জনপ্রিয়তা যে অভূতপূর্ব তা-ই নয়, তিনি সৎসাহিত্য ও বেস্টসেলারের মধ্যকার ভেদরেখাও আশ্চর্যভাবে ঘুচিয়ে দিতে পেরেছেন। অথচ একসময় তাঁরও কোনো প্রকাশক জোটেনি। ১৯৫৫ সালে বোগোতায় তাঁর প্রথম উপন্যাসের মাত্র একহাজার কপি ছাপা হয়েছিলো—কোলোম্বিয়ায় তখন তাঁকে চিনতো বিশিষ্ট একজন সাংবাদিক হিশেবে ; গার্সিয়া মার্কেস নিজেই পরে বর্ণনা করেছেন তাঁর জীবনের সেই সময় : 'পাঁচ বছর ধ'রে আমাকে খুঁজে বেড়াতে হয়েছিলো প্রকাশক, যে আমার প্রথম উপন্যাস ছাপতে রাজি। শেষ অব্দি বেরিয়েছিলো একটি অপেশাদার গরিব সংস্করণ—তা থেকে একটি পেসোও মেলেনি। প্রকাশককে শেষটায় পাওনাদারদের হাত এড়াবার জন্যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়।' নোবেল পুরস্কার (১৯৮২) পাবার পর কোলোম্বিয়ার খবরকাগজ 'এল এস্পেক্তাদোর'-এ তাঁর নিয়মিত লেখস্তম্ভে গার্সিয়া মার্কেস এইভাবেই পঞ্চাশের দশকের দিনগুলো স্মরণ করেছিলেন। কিন্তু এখন আর কেউই তাঁর লেখা নিয়ে এমন-কোনো আলোচনারই সূত্রপাত করতে পারবে না যদি-না লেখক হিশেবে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতির কথা উল্লেখ করে। কিন্তু আরো-একটি কথাও বোধহয় বলা ভালো। এখন তিনি রাজনৈতিক কারণে তাঁর স্বদেশ কোলোম্বিয়ায় থাকেন না বটে, কিন্তু তবু কোলোম্বিয়ার মানুষ তাঁকে জানে এমন-একজন মানুষ হিশেবে, যিনি—নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়—সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যে আজীবন লড়াই চালিয়ে এসেছেন। 'কোনোদিনই আমি ভুলতে পারিনি যে আমি আরাকাতাকার এক তারবাবুর ছ-জন ছেলেমেয়ের একজন—আমার সাফল্য বা ব্যর্থতায় কোনোদিনই এ-তথ্যটা আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব হয়নি। আমার জন্মের প্রতি এই বিশ্বস্ততা থেকেই বাকি-সবকিছু উৎসারিত হয়েছে—আমার বেঁচে-থাকার ধরন, আমার সাহিত্যিক নিয়তি আর আমার রাজনৈতিক সত্তা—সবই এই উৎস থেকেই এসেছে,' ১৯৮১-র ৫ এপ্রিল এই কথা লিখেছিলেন তিনি—তখন তাঁর সময় খুব-একটা ভালো যাচ্ছিলো না।

সাংবাদিকতা চিরকালই ছিলো গার্সিয়া মার্কেসের জীবিকা, আর আজও এই পেশাকে তিনি ভুলে যাননি। এমনকী যখন তিনি তাঁর সাহিত্য নিয়ে সবচেয়ে ব্যস্ত, তখনও সাংবাদিকতাই তাঁকে বান্ধব, অর্থকরী, সাহায্য মারফৎ জিইয়ে রেখেছে। তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা হয় ২১ মে ১৯৪৮, যখন তাঁর বয়েস মাত্র ২০, কার্তাহেনার এক দৈনিকে, যার নাম ছিলো 'এল উনিভের্সাল'—সেখানে

১৮ মাস কাজ করেছিলেন তিনি, কোনো লেখার সঙ্গেই তাঁর নাম ছাপা হ'তো না। ১৯৪৯-এর শেষে তিনি বাররানকিয়ার 'এল হেরাল্‌দো' পত্রিকায় 'সেপ্তিমুস' এই ছদ্মনামে নিয়মিত একটি লেখস্তম্ভে লিখতে শুরু করেন, শ্লেষে পরিহাসে রসিকতায় ভরা এক লেখস্তম্ভ, যার নাম ছিলো অদ্ভুত : জিরাফ। 'জিরাফ'-এর প্রথম কিস্তি বেরোয় ৫ জানুয়ারি ১৯৫০। ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ অব্দি প্রায় প্রত্যেক দিন এর কিস্তি বেরুতো—তারপর আবার তিনি কার্তাহেনায় ফিরে আসেন। সে-সময়ে খবরকাগজে তাঁর লেখা ক্রমশ অনিয়মিত হ'য়ে উঠছিলো। ২ জুলাই ১৯৫১-তে 'জিরাফ' হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যায়—তার পুনঃপ্রকাশ শুরু হয় ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, যখন গার্সিয়া মার্কেস আবার বাররানকিয়াতে ফিরে এসেছেন। তখন থেকে অবশ্য কেবল মাঝে-মাঝেই 'জিরাফ'-এর কিস্তি বেরুতো—অবশেষে ১৯৫২-র ডিসেম্বরে এর প্রকাশ তিনি পুরোপুরি বন্ধ ক'রে দেন। আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরেও 'জিরাফ'-এর হাসি ও শ্লেষ অব্যর্থ ও লক্ষ্যভেদী ব'লে মনে হবে—কিন্তু তা ছাড়াও এই কিস্তিগুলোর মস্ত গুরুত্ব আছে—তাঁর পরবর্তী সাহিত্যকর্মের অনেক-গুলো সূত্র ও সম্ভাবনা এই লেখাগুলোয় বীজের আকারে ছড়িয়ে আছে।

১৯৫৩-তে তিনি কিছুকাল ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা হিশেবে কাজ করেছিলেন ("সরলা এরেন্দিরা"য় অকস্মাৎ এইভাবেই উদয় হবে তাঁর, উত্তম পুরুষের, কথকের), মাত্র কয়েক মাস, তারপর সে-বছরই অক্টোবর মাসে বাররানকিয়ার আরেকটি দৈনিক কাগজ 'এল নাসিওনাল'-এর প্রধান সম্পাদক হিশেবে যোগদান করেছিলেন। 'এল নাসিওনাল' ছিলো যত-সমস্ত কেলেঙ্কারি তথ্য- ও দলিল- সমেত ফাঁস ক'রে দেবার কাগজ ('মৃত্যুর ছবিওলা এল নাসিওনাল,' শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ফিরিওলারা এই ব'লেই চ্যাঁচাতো)। এই অভিজ্ঞতা অবশ্য ছিলো অতীব ক্ষীণজীবী—মাত্র তিন মাস তিনি এ-কাগজের সম্পাদক ছিলেন, আর সে-সময় তিনি কোনো লেখাতেই নিজের নাম স্বাক্ষর করেননি।

১৯৫৪-তে গার্সিয়া মার্কেস কোলোম্বিয়ার সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র 'এল এস্‌পেক্তাদোর'-এর সম্পাদক হিশেবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি কোনো লেখাই স্বনামে ছাপেননি, তবু 'দিনের পর দিন' নামে এক বিশেষ লেখস্তম্ভের অনেক-গুলোতেই তাঁর রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাবে।

সেই সময়েই তিনি চলচ্চিত্র বিষয়ে একটি সাপ্তাহিক কাগজ বার করেন—কোলোম্বিয়ায় সেটাই ছিলো প্রথম সিনেমার কাগজ। সেখানকার লেখাগুলোয় তিনি শুধু তাঁর নামের আগ্যক্ষরগুলো দিতেন—পুরো নাম কখনোই নয়। তারপর

জুলাই ১৯৫৫তে বেরুলো তাঁর প্রথম প্রতিবেদন—'জাহাজডুবি নাবিকের কাহিনী'—আজও যাকে সাংবাদিকতার একটি অতীব উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিশেবে নবীনদের কাছে তুলে ধরা হয়। চলচ্চিত্রের সমালোচনা তখনও তিনি ছাড়েননি, কিন্তু কোলোম্বিয়ার সাংবাদিকদের মধ্যে তাঁর খ্যাতি তখন তুঙ্গে। 'জাহাজডুবি নাবিকের কাহিনী' যে সারা দেশে হুলুস্থুল তুলবে, তৎকালীন সরকারের পতন ঘটাবে, সেটা তখনও কেউ বুঝতে পারেনি। তাঁর খ্যাতির কথা মনে রেখেই ১৯৫৫-র জুলাই মাসে 'এল এস্‌পেক্তাদোর' তাঁকে ইওরোপ পাঠায়। তখনকার সামরিক হুন্‌তার সঙ্গে পর-পর বিরোধ বাধায় যখন ১৯৫৬-র এপ্রিলে 'এল এস্‌পেক্তাদোর' বন্ধ ক'রে দেয়া হয়, গার্সিয়া মার্কেস আঁৎকে উঠে আবিষ্কার করলেন তিনি চালচুলোহীন অবস্থায় পারীর রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'য় আমরা যখন আউরেলিয়ানো বাবিলোনিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মেলকিয়াদেসের লেখা পার্চমেন্টে বুয়েন্দিয়া পরিবারের কালপঞ্জি পড়ছি, তখন হঠাৎ চমকে গিয়ে আবিষ্কার করি গাব্রিয়েল মার্কেস নামে এক যুবক—যে কিছুকাল আগে তার মেয়েবন্ধু মের্সেদেস-এর (পরে তাঁর স্ত্রী হবেন মের্সেদেস) সঙ্গে পারীতে পাড়ি জমিয়েছিলো—শেষ দেখা দেয় তার বন্ধু আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কল্পনায় 'যেখানে রোকামাদুর পরে মারা যাবে সে-ঘরে সেদ্ধ ফুলকপির গন্ধের মধ্যে ব'সে-ব'সে [গাব্রিয়েল মার্কেস] খিদের প্রকোপ ভুলিয়ে দেবার জন্যে সারা রাত ধ'রে লিখছে।' কী লিখছিলেন তখন গাব্রিয়েল মার্কেস, আর কেমন ক'রেই বা কল্পনায় আউরেলিয়ানো বাবিলোনিয়া দেখতে পাবে রোকামাদুর-এর ভবিষ্যৎ মৃত্যু, যে আসলে হুলিও কোর্তাসারের 'একাদোকা' উপন্যাসের একটি চরিত্র বৈ আর-কিছু নয়? কিন্তু 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'য় অন্য-অনেক লেখকের সৃষ্ট চরিত্র বারে-বারে দেখা দিয়েছে, তৈরি করেছে নিগূঢ় অন্তর্পাঠের জটিল বুনোন—ঠিক যেমন 'সরল এরেন্দিরা'য় গার্সিয়া মার্কেস দেখা দেবেন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা হিশেবে, তাঁর বন্ধু কথাসাহিত্যিক আলভারো সেপেদা সামুদিওর সঙ্গে, যাঁর চেহারা দেখে মনে হ'তো তিনি বুঝি ট্রাকড্রাইভার হবার জন্যেই জন্মেছেন।

শেষটায় সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে তিনি ভেনেজুয়েলার এক খবরকাগজে বিশেষ সংবাদদাতা হিশেবে কিছু-কিছু প্রতিবেদন পাঠাতে শুরু করেন—না-হ'লে ঐ বিদেশ-বিভুঁয়ে তাঁকে না-খেতে পেয়ে মরতে হ'তো: সারা রাত ধ'রে লিখে-লিখেও হামলাবাজ খিদের পরিকল্পনা তিনি ভুলিয়ে দিতে পারতেন না। কিছুদিন লণ্ডনে কাটিয়ে গার্সিয়া মার্কেস অবশেষে ১৯৫৭-র ডিসেম্বরে লাতিন আমেরিকায়

ফিরে আসেন, এবং কারাকাসের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মোমেন্তো'র সাংবাদিক হিশেবে কাজ করতে থাকেন। কুবার ঔপন্যাসিক আলেহো কার্পেন্তিয়ের (কুহকে-ভরা বাস্তবের কথা তিনিই প্রথম বলেছিলেন) বাতিস্তার জেল থেকে বেরিয়ে কারাকাসে তখন নির্বাসনে জীবন কাটাচ্ছিলেন।

১৯৫৯-এ কুবার বিপ্লবের পর কার্পেন্তিয়ের যেমন 'লা হাবানা' ফিরে গিয়েছিলেন, গার্সিয়া মার্কেসও তেমনি বোগোতায় ফিরে আসেন—এবং 'প্রেন্সা লাতিনা' নামে স্বাধীন কুবার সংবাদসংস্থার শাখা-দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। সাংবাদিক হিশেবে খবরকাগজে কাজ করা ছাড়াও চিরকালই তিনি গণমাধ্যমগুলোর নূতন-নূতন সৃষ্টিশীল পদ্ধতিতে আগ্রহ নিচ্ছিলেন। মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর থেকেই তিনি স্থানীয় কাগজে টুকিটাকি প্রতিবেদন লিখতেন, আর সিপাকিরায় কলেজে ঢুকে তিনি নিজেই একটি কাগজ বার করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে বোগোতার একটি দৈনিকের বিশ্ববিদ্যালয় ক্রোড়পত্রেও তিনি কাজ করেছিলেন—নিজে যদিও কিছুই লেখেননি। ১৯৫০ সালে বারানকিয়ায় বন্ধুদের সঙ্গে মিলে বার করেছিলেন একটি লিটল ম্যাগাজিন—'ক্রোনিকা'—তিনি নিজে যার প্রধান সম্পাদক ছিলেন আট মাস। সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে 'কোম্প্রিমিদো' নামে একটি কাগজ বার করতে শুরু করেছিলেন, যাকে তিনি বলতেন 'পৃথিবীর সবচেয়ে খুদে পত্রিকা'—যেটা মাত্র দু-তিন সংখ্যা বেরুবার পর শেষটায় 'ইন্দ্রিয়াতীত' পত্রিকায় পরিণত হয়। কিন্তু কুবার সংবাদসংস্থা 'প্রেন্সা লাতিনা' তাঁকে অন্য ধরনের সাংবাদিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো—শুধু যার জন্যেই তিনি 'আকসিওন লিবেরাল' নামে চমৎকার একটি ছোটো ত্রৈমাসিকের সম্পাদনার ভার নেননি: 'আকসিওন লিবেরাল' চেয়েছিলো কোলোম্বিয়ার বামপন্থী সংগঠনগুলোর মধ্যে সংহতি জাগাতে, ঐক্য আনতে। জুন ১৯৬১তে অবশ্য লা হাবানা ও নিউ-ইয়র্ক সফরের পর 'প্রেন্সা লাতিনা' ছেড়ে দিয়ে তিনি মেহিকো চ'লে যান—সাংবাদিক এবং চলচ্চিত্র সমালোচক হিশেবে। সাহিত্য এবং রাজনীতির মতোই চলচ্চিত্রেও তাঁর আগ্রহ ছিলো অপরিসীম। 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' ও 'কুলপতির হেমন্ত' উপন্যাস দুটির সাফল্য ও খ্যাতির পর গার্সিয়া মার্কেস পুরোপুরি রাজনৈতিক মানুষ হিশেবেই আত্মপ্রকাশ করেন। অবশ্য এর আগেই বেরিয়ে গিয়েছে 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না', 'অশুভ লগ্ন' আর 'বড়ো মায়ের অন্ত্যেষ্টি'র মতো বই—যেগুলো 'লা ভিওলান্সিয়া'রই সৃষ্টি ছিলো—কিন্তু 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি না-পেলে এ-সব বইয়ের প্রচার কতটা হ'তো, আজ তা নিয়ে জল্পনা করা যায়। গোড়া থেকেই

তাঁর স্বভাবে ছিলো সাধারণ মানুষের জন্যে সহানুভূতি আর মমতা—তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস, ব্যাবহারিক বোধ এবং প্রবল প্রাণশক্তিও তাঁকে বামপন্থী আদর্শ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। ১৯৫৯-এর ১ জানুয়ারি চে গেভেরা আর ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কুবা থেকে একনায়ক বাতিস্তাকে উচ্ছেদ করার পর তাঁর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছিলো। যে-সাংবাদিক ১৯৫৪-৫৫ সালে কোলোম্বিয়ার আণ্ডারগ্রাউণ্ড কমিউনিস্টদের সক্রিয় সহযোগী ছিলেন, তিনি এখন হ'য়ে উঠলেন লাতিন আমেরিকার ও তৃতীয় বিশ্বের মানবিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনগুলোর 'অনির্বাচিত রাষ্ট্রদূত'—চাইলেন স্বদেশের বামপন্থী আন্দোলনকে নতুনভাবে গ'ড়ে তুলতে—যার পুনর্জন্ম হ'লো ১৯৭৮-এ প্রতিষ্ঠিত 'ফির্মেস' আন্দোলনে। এই সময়েই তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত হ'লো সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিকল্প' (আলতের্নেতিভা)—যাকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন নিজের টাকায় আর লেখায় (১৯৭৪-৭৯)। তাঁর এবারকার সাংবাদিকতা ছিলো তদন্ত অনুসন্ধান আর সাক্ষাৎকারের সমাহার—বিশ্বের নানা দেশে এ-সব লেখা ছাপা হ'তে শুরু করে, এই সময়েই তাঁর সঙ্গে দেখা ও বন্ধুতা হয় ফিদেল কাস্ত্রো, তোরিহোস, আগস্তিনিউ নেতো, ফ্রাঁসোয়া মিতের্াঁর। এই সময়েই তাঁর নাছোড় একগুঁয়ে জেহাদ শুরু হয় কোলোম্বিয়ার সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে—তিরিশ বছর ধ'রে যে-সামরিক শাসন জরুরি অবস্থার নাগপাশে বন্দী ক'রে রেখেছিলো কোলোম্বিয়ার মানুষকে।

ভিয়েৎনাম, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি, জিমি কার্টার, রনাল্ড রেগন, জেনারেল আউগুস্তো পিনোচেৎ—সবাই (এবং এ-সবকিছুই) গার্সিয়া মার্কেসের ধারালো লেখাগুলোর আক্রমণের লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করেন না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকায় শান্তিপ্রতিষ্ঠায় উৎসুক। তাহ'লে মধ্য-আমেরিকায় কোন্ত্রাদের অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নিকারাগুয়া, এল সালভাদোর, গুয়াতেমালা বা অনডুরাসে মার্কিনরা এ-রকম সর্বগ্রাসী আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারতো না।

মার্চ ১৯৮১ থেকে কোলোম্বিয়ার দক্ষিণপন্থী সামরিক হুন্তার আক্রমণের লক্ষ্য হ'য়ে ওঠবার পর গার্সিয়া মার্কেস যখন সরকারিভাবে স্বদেশ ত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ ক'রে নিলেন তখন সেটা কোলোম্বিয়ার জাতীয় দুর্ঘটনা ব'লে বর্ণনা করা হয়েছিলো। কিন্তু নির্বাসন সত্ত্বেও কোলোম্বিয়ায় তিনি এখনও কোনো-না-কোনোভাবে উপস্থিত—সে শুধু তাঁর বিতর্কিত শেষ উপন্যাস 'এল হেনেরাল এন সু লাবেরিন্তো'র (১৯৮৯ 'গোলকধাঁধায় সেনাধিনায়ক'—যার বিষয়বস্তু সিমোন বোলিভারের জীবনের শেষ কয়েকমাস—৮ মে থেকে ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৩০)

অত্যাশ্চর্য সাফল্যেই নয়, আবারও তিনি পুনঃপ্রকাশিত 'এল এস্‌পেক্তাদোর'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হ'লে। আগস্ট ১৯৮০ থেকে প্রতি রবিবার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বেরোয় 'গাবোর কলাম', যাতে সবকিছু নিয়ে মন্তব্য থাকে—(সাহিত্য ও রাজনীতি, ব্যক্তি ও ঘটনা, বস্তু ও নিসর্গ—কিছুই সেখানে বাদ যায় না) যাতে আরো থাকে সত্যি-মিথ্যে নানা কাহিনী, হাসির আর দুঃখের—দুইই—কিন্তু মানবিকতার প্রখর বোধে যা কবিতার মতো আবেগে কম্পিত হয়। যেন 'জিরাফ'-এরই প্রত্যাবর্তন আবার ; কিন্তু এখন এ-লেখাগুলোর পেছনে থাকে তিরিশ-চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা—সাহিত্যের আর জীবনের অভিজ্ঞতা। প্রতি সপ্তাহে 'গাবোর কলাম' পড়া যে-কারু কাছে এক পরম উপভোগ্য অভিজ্ঞতা—আর এস্পানিয়া আর লাতিন আমেরিকার সংবাদপত্রে এর পুনর্মুদ্রণ লেখাগুলোকে আজ কোটি-কোটি লোকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আন্তর্জাতিক ঘটনা ও রটনা, সংঘাত ও টানাপোড়েন সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে। কথাসাহিত্যিক আর সাংবাদিক গার্সিয়া মার্কেস—আবারও বলা ভালো—একই মানুষ, কোনো দ্বিধাবিভক্ত চৈতন্যের লোক নন। এ-কথাটাই পরে আমরা আশা করি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো।

. . .

ক্যারিবিয়নের নিষবাদী

গার্সিয়া মার্কেসের রচনা তাঁর জন্মভূমির (তাঁর জন্ম আরাকাতাকায়, কোলোম্বিয়ার যেটা ক্যারিবিয়ন উপকূল) মানবিক মূল্যবোধগুলিকে বিশ্বজনীন ক'রে তোলে—বিশেষত তার আফ্রো-এস্পানিওল সংস্কৃতি ও ক্যারিবিয়ন জগতের আন্তর্জাতিকতাকে। আঞ্চলিকতার মধ্যে বিশ্বজনীনতার টান ও ঔৎসুক্য—এটা চল্লিশের দশকেই তৃতীয় বিশ্বের বিবেকের মধ্যে ছাপ ফেলেছিলো—বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলনে। গার্সিয়া মার্কেস 'কোস্তেনিয়ো' অর্থাৎ উপকূলের মানুষ—নিজেই সেটা তিনি বার-বার ঘোষণা করেছেন, অথচ তাঁকে আন্দিয়েসের কোলোম্বিয়ার কথাও বলতে হয়, বোগোতার কথা বলতে হয় (যাকে কেউ-কেউ বলে লাতিন আমেরিকার আথেন্স) আর তাঁকে লিখতে হয় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা-বোধ নিয়ে। যদিও তাঁর প্রথম গল্প বেরোয় যখন তাঁর বয়েস মাত্র ১৮, ('সরলা এরেন্দিরা আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী'র ইংরেজি সংস্করণে তাঁর গোড়ার দিকের কিছু গল্প ছাপা হয়েছে), তবু গার্সিয়া মার্কেস তাঁর ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে লেখা গল্প-উপন্যাস-

গুলোকে তাঁর আদি রচনা ও পরবর্তী সাহিত্যকর্মের মধ্যবর্তী যোগসূত্র হিশেবে বর্ণনা করেন—বিশেষত 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না', 'অশুভ লগ্ন' বা 'বড়ো মায়ের অন্ত্যেষ্টি'র গল্পগুলোকে। তাঁর মতে, এ-গল্পগুলোর কাঠামো 'যুক্তিশৃঙ্খলের ওপর প্রতিষ্ঠিত,' 'পূর্বকল্পিত,' 'ছকে ফেলা'। তিনি বলেন, 'কোনো দুঃসাহসী লেখক কেবল বাস্তবতার সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলোই খুলে দেখায় না—তার মধ্য দিয়ে এই জগতের তো বটেই—অন্য-কোনো জগতেরও—সব বাস্তবতাকে প্রকাশ করে—কোনোকিছুতেই তার বিশেষ সমর্থন বা বীতরাগ থাকা উচিত নয়।' তাঁর এই আত্মসমালোচনা ও 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না'-র প্রতি তাঁর এই অবিচার অবশ্য লেখক হিশেবে তাঁর তীব্র সচেতনতাকেই ফুটিয়ে তোলে। অনেকদিন ধ'রে তিনি ভাবতেন তাঁর এই পর্যায়ের লেখাগুলোর মধ্যে 'মঙ্গলবারের সিয়েস্তা' গল্পটাই সর্বশ্রেষ্ঠ—যেটা তাঁর মতে তাঁর রচনাশৈলীর শুদ্ধতম নিদর্শন। যদি তাঁর সমগ্র রচনাকর্মের কথা মনে রাখা যায়, তবে এই গল্পগুলোকে বলতে হয় 'অস্বীকারের গল্প', 'প্রতিবাদের গল্প'—আর তা হ'লেই হয়তো তাঁর তিরিশ বছরের সাহিত্যকর্মকে বুঝতে সুবিধে হবে আমাদের। তারা, কিন্তু, সত্যি-বলতে, অন্য লেখাগুলোর মধ্যে কোনো স্বতন্ত্র অধ্যায় নয়। কেউ যদি গার্সিয়া মার্কেসের রচনার বিকাশ ও বিবর্তন লক্ষ করতে চায়, অথবা তাঁর নন্দনতত্ত্বের মূল লক্ষণগুলোকে শনাক্ত করতে চায়, তবে অবশ্য আলাদা কথা। পাঠকের প্রতিক্রিয়া লেখকের চেয়ে ভিন্ন হ'তেই পারে : অনেকেই হয়তো 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না' গল্পটিকে 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতার' চেয়েও ভালো বলতে চাইবেন, একসময় তিনি নিজেও যা বলতেন।

নিজের লেখার মধ্যে এই বিশেষ অধ্যায়টিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে গিয়ে গার্সিয়া মার্কেস এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক বিবর্তনের পক্ষে তর্কাতীত ও অপরিহার্য। এমন কতগুলো গভীর প্রসঙ্গের সফল উত্থাপন ঘটেছে এইসব গল্পে, যা তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিগুলোর মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। তাঁর প্রথম গল্পগুলোতেই ছিলো লেখক হিশেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়—ছিলো মৃত্যুর হানাদার উপস্থিতি আর অতিপ্রাকৃতের অবিরল সংক্রাম (যা পাঠককে ফ্রানৎস কাফকার 'রূপবদল' গল্পের কথা মনে পড়িয়ে দেয়)। 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র যেটা অন্যতম প্রধান প্রসঙ্গ—অভিশপ্ত বংশ, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে মানিয়ে চলার ক্ষমতা যার নেই, অবশেষে সময় যাকে উৎখাত ক'রে যায়—সেটা তাঁর আগের লেখাতেও অবিরল ছড়িয়ে আছে। তাঁর দ্বিতীয় গল্পটাই এ-ধরনের লেখায় সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ : 'এভা, তার বেড়ালের ভেতরে'।

এক তরুণী—অভিজাত, সুন্দরী, অসুখ—'বিশুদ্ধ সত্তা'য় রূপান্তরিত হ'য়ে যায়—এক অনিদ্রায়-আক্রান্ত ছটফটে রাতে—পরিবারের বিরাট প্রাসাদে যে-রাতটি সে কাটিয়েছিলো একেবারে একা, যখন সে তার যৌবনের মধ্যে পুনর্জন্ম চায়, যাতে সে এই জগতেই বেঁচে থাকতে পারে, সেটা পুরোপুরি অসম্ভব হ'য়ে ওঠে, কারণ একমুহূর্তে, তার রূপবদলের পরেই, তিন হাজার বছর কেটে যায়, আর তার বিশাল বাড়ি ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়—পরিণত হয় বিষাক্ত ধুলোবালির একটা স্তূপে। কোনো পরিবারের বিভিন্ন প্রজন্ম যে চেষ্টা ক'রেও ইতিহাসের গতিকে রোধ করতে পারে না—এটা বারে-বারেই ফিরে আসে তাঁর গোড়ার দিকের রচনায়।

...

সময়ের অপ্রতিরোধ্য গতি

দৈনন্দিন বাস্তবের বিভিন্ন ঘটনার প্রতি টীকাটিপ্পনী পরিহাস ছাড়াও, সে-সময় তিনি এমন-সব রচনায় হাত দিচ্ছিলেন, যাকে আমরা বলি সাহিত্যিক রচনা, যেগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই হ'তো তাকলাগানো ও চমকপ্রদ—যেগুলো এটাও দেখাচ্ছিলো ভবিষ্যতে কোন্-কোন্ দুর্গম, দুরধিগম্য দিকে গার্সিয়া মার্কেস তাঁর রচনাকে চালিত করবেন। কার্তাহেনার 'এল উনিভের্সাল' কাগজে যে-লেখাগুলো বেরিয়েছিলো, সেগুলো বারে-বারেই হাৎড়াচ্ছিলো এই সমস্যাটা—কোনো বংশ কোনো পরিবার কেমন হতভম্ব দাঁড়িয়ে আছে পরিবর্তমান সময়ের মুখোমুখি। কিন্তু 'এল হেরাল্দোর' 'জিরাফ' সিরিজেই সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায় পরিবার, তার আশ্রয়, তার রীতিনীতি কেমন ক'রে সময়ের গতির কাছে নতি স্বীকার করছে। সত্যি-বলতে, এ-সময় গার্সিয়া মার্কেস একটা উপন্যাসেও হাত দিয়েছিলেন, যার নাম ছিলো 'লা কাসা' ('বাড়ি')—যার প্রাথমিক খসড়াগুলো পরে 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র মধ্যে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। অন্য যে-সব গল্প তখন লিখছিলেন তাতেও নিরন্তর ঘুরে-ঘুরে এসেছে এই প্রসঙ্গ।

'জিরাফ'-এর মধ্যে আরো-একটা উপাদান ছিলো, একটা গ্রামের বর্ণনা, যা আস্তে-আস্তে 'পাতার ঝড়' আর 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' বইতে মাকোন্দোয় রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। এই গ্রামও সময়কে রোধ করতে পারেনি। সে হ'য়ে ওঠে বদ্ধ, পরিবর্তনবিমুখ, অচল এক জনপদ, আর তার অনড়তাই ডেকে আনে তার সর্বনাশ আর ধ্বংস। কোনো-কোনো গল্পে গ্রামটি বদলাতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি—কোনো গ্রামের শহরে রূপান্তরণ শেষ অব্দি প্রাক্-মাকোন্দোর প্রলয়-ঝড়ে শেষ হ'য়ে যায়, যখন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ ছড়িয়ে দেয় তার শোষক

ভয় ও রক্তপাত। আর এটাই স্পষ্ট ক'রে দেখায় কেন কোনো সজীব বিবর্তন গোড়া থেকেই ছিলো অসম্ভব—কেননা তার মানুষজনের না-ছিলো কোনো রাজনৈতিক চেতনা, না-বা কোনো স্বচ্ছ পরিস্ফুট কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা।

আর, কোনো কুলপতির ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ—সেটাও ১৯৫০-এর পর থেকে লেখা তাঁর গল্পগুলোয় হানা দিতে শুরু করেছে—'জিরাফ'-এর কোনো-কোনো আখ্যানেও যার উপস্থিতি সহজলক্ষ্য। এতক্ষণ আমরা 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র পূর্বসূত্রগুলোর কথাই উল্লেখ করেছি—কিন্তু পিতৃতান্ত্রিকতার বা 'কুলপতির' প্রসঙ্গও তারই সঙ্গে জড়ানো—আর এটাও যে-কারু চোখে পড়বে যে গার্সিয়া মার্কেসের দুটি প্রধান উপন্যাস এই সূত্রেই গ্রথিত—একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা লেখাই হ'তে পারতো না।

১৯৫০-এর পর থেকে তাঁর লেখায় আরো-একটা প্রসঙ্গ দেখা যায়: আগন্তুক, বহিরাগত কোনো অচেনা লোকের হঠাৎ আগমন। সম্ভবত তিনি এইসব গ্রাম ও পরিবারের লোকজনদের মুক্তির একটা রাস্তা হাৎড়াচ্ছিলেন—আর সেইজন্যেই বাইরের কেউ এসে এই কাহিনীগুলোয় হাজির হয়। 'নাথানিয়েল কেমন ক'রে এলো' (লে. ১৯৫০) থেকে 'ধ্বংসের মধ্যে এক মানুষের আবির্ভাব' (লে. ১৯৫৪) পর্যন্ত—সেই সঙ্গে 'জিরাফ'-এরও কোনো-কোনো কিস্তিতে—এই আগন্তুকের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে—যে পরিত্রাতা হ'লেও হ'তে পারে। অনেক সময়েই এই আগন্তুকের চেহারার বর্ণনা জেনারেল উরিবে-উরিবের সঙ্গে মিলে যায়। কোলোম্বিয়ার শেষ গৃহযুদ্ধগুলোয় তিনিই ছিলেন লিবারেলদের নেতা। অন্য সকলের মরীয়া হতাশাই আগন্তুকের মধ্যে মুক্তিদাতার লক্ষণগুলোকে বার ক'রে আনে। অন্তত গোড়ার দিকে এই সম্ভাবনাটার কথাই গার্সিয়া মার্কেস ভেবেছিলেন, কিন্তু পরের দিকের লেখাগুলো এটাই দেখিয়েছিলো যে এই রাস্তায় মুক্তি নেই, আগন্তুক বরং আরো হতাশাই ডেকে আনবে। যে-আগন্তুকরা শেষ অব্দি এসে পৌঁছোয়, তারা সব আন্তর্জাতিক ছদ্মপয়গম্বর—উপনিবেশবাদের প্রতিনিধি, 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র যেমন জন ব্রাউন। সে একদিক থেকে সেই করাল কুক্কুরেরও প্রতিমূর্তি, দেশবাসী যাকে 'কুলপতির হেমন্ত'তে রূপান্তরিত করেছে স্বৈরাচারী একনায়কে।

গার্সিয়া মার্কেস তাই শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছোন ইতিহাসেরই এক সজীব সংজ্ঞার্থে। ১৯৫৫ পর্যন্ত তাঁর লেখায় দেখা মিলতো অশক্ত অক্ষম একদল মানুষের, যাদের সামনে কোনো আশা নেই, কেউ যাদের ইতিহাসের ধারার মধ্যে টেনে

আনতে পারবে না, শুধু এই কারণেই যে তাদের কোনো স্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা বা বিশ্ববোধ নেই। এটাই প্রতিফলিত হয়েছে 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'য় বা 'কুলপতির হেমন্ত'তে। 'কুলপতির হেমন্ত' বইয়ের শেষ পঙ্‌ক্তি ঘোষণা করে 'অসীম সময়ের সমাপ্তি,' যা থেকে আমাদের ধ'রে নিতে হবে যে এখন থেকেই সূচনা হ'লো ইতিহাসের—ঐতিহাসিক সময়ের। উপন্যাসটি আমাদের নিয়ে আসে ইতিহাসের গোরগোড়ায়—যেমন এনেছিলো 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র শেষ দীর্ঘ অনুচ্ছেদটি, এমনকী 'বড়ো মায়ের অন্ত্যেষ্টি'রও শেষ অনুচ্ছেদ (যা বেরিয়েছিলো ১৯৫৯তে)।

কিন্তু ১৯৫৫-র আগে থেকেই গার্সিয়া মার্কেস ভাবতে শুরু করেছিলেন এমন-এক সম্ভাবনার কথা, যেখানে ইতিহাস আর মানবতা দুয়ে মিলে-মিশে মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেবে। ১৯৫৬-৫৯ সালের মধ্যে লেখা গল্পগুলোতেও এই সম্ভাবনার কথাই ছিলো—আজ যে-লেখাগুলোকে তিনি খানিকটা তাচ্ছিল্যই করেন; তাঁর ধারণা এই লেখাগুলোয় তিনি খানিকটা পথ ভুল করেছিলেন—শুধু 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'তেই সবগুলো প্রসঙ্গকে তিনি একযোগে সামলাতে পেরেছেন—এবং হয়তো 'কুলপতির হেমন্ত'তেও। ঐ লেখাগুলোয় তিনি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঐ প্রসঙ্গগুলোর মধ্যেই এই পথ হারাবার সম্ভাবনা লুকিয়েছিলো—অন্তত এটাই তাঁর ধারণা এখন। তাঁর জগতে নাকি 'দৃঢ় কঠোর প্রতিজ্ঞা'র অভাব ছিলো—সে-প্রতিজ্ঞাকে তিনি ১৯৫৬-র পরেই 'কোলোম্বিয়ার হিংসাহিংস্রতা'র ['লা ভিওলেন্সিয়ার'] প্রশ্নের সঙ্গে জুড়ে দিতে পেরেছিলেন—এটাই ছিলো তাঁর মতে কোলোম্বিয়ার সর্ববৃহৎ জাতীয় সমস্যা।

তাঁর গোড়ার দিকের লেখাগুলোকে আজ যদি কেউ আবার খুঁটিয়ে প'ড়ে ভাখে, এমনকী 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না'কে হিশেবে নিয়েও, তাহ'লে বোঝা যায় সে-সময় তিনি ইতালীয় নয়া বাস্তববাদে বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন। ১৯৫২তে 'জিরাফে'র একটা ছোট্ট কিস্তিতে বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে তিনি এমন-একটা রচনা-রীতি (বা রচনাপদ্ধতি) খুঁজে বেড়াচ্ছেন, যাতে তাঁর 'কাল্পনিক' কথাসাহিত্যে কোলোম্বিয়ার জীবনের এই 'হিংসাহিংস্রতা'কে ভেতর থেকে মিলিয়ে দিতে পারেন। ১৯৫৪তে চমৎকার একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছিলো তাঁর: কোরিয়ার যুদ্ধে যে-সব কোলোম্বিয়াবাসী অংশ নিয়েছিলো তাদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি সেইসব যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিকদের কথাই তুলেছিলেন, যে-কোনো যুদ্ধ শেষ হবার পর দেশে ফিরে এসে যারা কেমন বিমূঢ় আর অসহায় হ'য়ে যায়। সেই বছরেই, এর কিছুপরেই,

তিনি ধার করেছিলেন বহু নব্য বাস্তববাদী চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা—আর ১৯৫৫তে 'উমবের্তো-ডি' চলচ্চিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দ্ব্যর্থহীনভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিলো যে এখন তিনি 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না' লিখবার জন্যে প্রস্তুত। পরে অবশ্য—যেমন আগেই বলেছি—এই চমৎকার লেখাটি তাঁর নিজের তেমন পছন্দ হয়নি, বরং তিনি একটা মস্ত ভুল করেছিলেন ব'লেই তাঁর মনে হয়েছিলো। যদিও লেখা হিশেবে, শিল্প হিশেবে নানা সাক্ষাৎকারে এটাকে তিনি শ্রেষ্ঠ ব'লে বর্ণনা করেছেন।

প্রথম থেকেই তাঁর লেখায় ছিলো সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে তন্ন-তন্ন ক'রে হাৎড়ানো—একের পর এক প্রশ্ন তুলে তাকে জর্জরিত করা। আলেহো কার্পেন্তিয়েরের গল্পগুচ্ছ 'সময়ের যুদ্ধ'র কথা মনে প'ড়ে যায় আমাদের—সেখানে তিনিও সময়কে একটা বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র ব'লে দেখিয়েছেন—ইতিহাসের আগের সময়কে। প্রথম দিকে গার্সিয়া মার্কেস অবশ্য ইতিহাস নিয়ে ততটা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না—সময় কেটেই যায়, আর প্রাথমিক স্বর্ণযুগের পর অনিবার্যতই আসে সবকিছুর ধ্বংস—সময় সব চুরমার ক'রে দেয়, মেরে ফ্যালে। সময় সম্বন্ধে এই নঞর্থক নেতিবাচক ধারণা এমনকী তাঁর সাংবাদিক প্রতিবেদনগুলোতেও তখন প্রতিফলিত হচ্ছিলো। স্মর্তব্য, তাঁর প্রথম লেখাই জরুরি অবস্থা সম্বন্ধে—'ভিও-লেন্সিয়া কোলোম্বিয়ানা'—আর তাতে তিনি গত শতাব্দীর গৃহযুদ্ধগুলোর কথাও তুলেছিলেন। কারু মনে হ'তে পারে যে গার্সিয়া মার্কেস কোলোম্বিয়ার দিকে তাকিয়ে এটাই ভাবেন যে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে অতীতের সমস্যাগুলো মোটেই পালটায়নি, দেশে সব এমনভাবে চলেছে যেন ইতিহাসের কোনো অস্তিত্বই নেই। এই বিশ্লেষণ কোলোম্বিয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনে এই ধারণাও আছে যে চাকার অক্ষ ভেঙে যাবেই একদিন, যদি কেউ ইতিহাসের পেছনমুখেই সময়কে চালাতে চায়, আর—সত্যি-তো—'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র প্রধান তাৎপর্য তো তা-ই।

১৯৫০-এ যখন 'বাড়ি-পরিবার/সময়ের নিষ্ঠুর স্রোত' প্রসঙ্গটি তাঁর নানা লেখায় বিচ্ছুরিত হ'তে শুরু করেছে, তিনি তখন তাঁর প্রথম উপন্যাসের সংস্কার ও পরিমার্জনা নিয়েও ব্যস্ত। এই উপন্যাস, 'পাতার ঝড়', খুব-একটা সাবলীলভাবে এগুচ্ছিলো না—তার প্রধান কারণই ছিলো এটা যে তিনি 'বাড়ি' উপন্যাসটাকে শেষ করতে পারছিলেন না। বাড়ি, পরিবার, গ্রাম—এমনকী সেই প্রলয়ের হাওয়া যা একদিন ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে নেবে সবকিছু—এমনকী পুরো মাকোন্দোকেও—সবকিছুই ছিলো

'পাতার ঝড়'-এ—কিন্তু ধ্বংসের দিকে এই অপ্রতিরোধ্য দৌড়টাকে তিনি তেমন পরিপূর্ণভাবে ধরতে পারছিলেন না। এই উপন্যাসটা তাঁর ভাবনার ছোট্ট এক সংকটেরই স্মারক—অচলাবস্থা কেমন ক'রে সমাজ ও গোষ্ঠীর এই মারাত্মক নিয়তিকে ডেকে নিয়ে আসে, সেটা তখনও তেমন স্পষ্ট ও বিশদভাবে তিনি মূর্ত ক'রে তুলতে পারেননি।

তাছাড়া, উইলিয়াম ফকনারের 'অ্যাজ আই লে ডাইং' উপন্যাসটির নিরীক্ষামূলক রচনার ছাপ—যেটা তখন এস্পানিওল-আমেরিকী সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে দারুণ একটি দুঃসাহসী প্রচেষ্টা—স্পষ্টই খুঁজে পাওয়া যাবে 'পাতার ঝড়'-এ : তার কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে তিনটি চেতনাপ্রবাহমূলক অন্তর্লীন স্বগতোক্তির ওপর, আর তাদের আপাত-অসংলগ্ন চিন্তার কেন্দ্র এক আত্মহত্যা—মাকোন্দোর বাসিন্দাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যাকে কবর দিতে হবে। এর আগেই তাঁর ষষ্ঠ গল্প "এই অনিদ্রারোগীদের কপালে কোন তিক্ততা"র এই কাঠামোটা লক্ষ করা গিয়েছিলো—সেখানেও ছিলো তিনটেই চরিত্র/কথক। পরে 'হেমন্তের কুলপতি'-তেও যা দেখতে পাবো আমরা—এ যেন পরবর্তী উপন্যাসটির সুদূর, কিন্তু পূর্বঘোষণা।

সময়ের প্রশ্নটাই আসল—কেমন ক'রে বাঁচে মানুষ সময়ের এই চৌহদ্দির মধ্যে, সময়ের এই ঘেরাটোপের মধ্যে—কতটাই বা থাকে তাদের ঐতিহাসিক চৈতন্য—ইতিহাসের বোধ? 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না', 'বড়ো মায়ের অন্ত্যেষ্টি' আর 'অশুভ লগ্ন' বইগুলোতে এ-প্রশ্নেরই সদর্থক সমাধান মিলবে।

...

মৃতদেহের উপস্থিতি

গার্সিয়া মার্কেস যদিও এ-গল্পগুলোর সার্থকতা সম্বন্ধে এখন সন্দিহান, তবু কিন্তু তেমন-কোনো বড়ো মাপের ব্যবধান বা বৈপরীত্য সৃষ্টি করেনি এ-সব লেখা। সময় যে থেমে নেই, কিন্তু বাড়ি-পরিবার-গ্রাম সব থেমে গিয়েছে, এই প্রশ্নটা এ-সব লেখাতেও প্রতিধ্বনিত—কিন্তু সমাধানগুলো আপাতত অন্যরকম। আর এই বড়ো প্রশ্নটারই সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে ইতিহাসবোধ—যেটা আরো গভীর প্রসঙ্গ, আরো অবিচল প্রসঙ্গ, যেটা এমনকী সব মেনে নেবার হতাশা বা ইচ্ছাশক্তির বিরোধিতার কদর্যতাকেও ছাপিয়ে যায়। 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না' বইতে আমরা একবার শুনেছি, 'একটা জিনিশই অব্যর্থভাবে অনিবার্যভাবে এসে পৌঁছোয়—সে মৃত্যু।' জীবন আর মৃত্যুর এই কানামাছি খেলাটাই বিপুলভাবে, সৃষ্টিশীলভাবে, বিচিত্রভাবে তাঁর রচনার মধ্যে আরো-একটা আয়তন, আরো-একটা মাত্রা এনে দেয়।

তাঁর অনেকগুলো গল্পতেই গ'ড়ে থাকে মৃতদেহ, আর চরিত্ররা কোনো এক সময়ে তার মুখোমুখি হয়—এমনকী মৃতদেহ যখন বাস্তবভাবে উপস্থিত নেই, তখনও সে হানা দেয় জীবিতের জগতে (গোড়ার দিকের গল্পে, কোনো তরুণী বা কোনো স্ত্রীলোক প্রায়ই 'ভূত' হ'য়ে ওঠে—হ'য়ে ওঠে জ্যান্ত-মড়া)। 'পাতার ঝড়', 'বড়ো মায়ের অন্ত্যেষ্টি', 'কুলপতির হেমন্ত', এমনকী 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি'-তেও এই প্রসঙ্গটিকে নানানভাবে দেখা যাবে। মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে আখ্যান—নানা রকম তার গড়ন ও ধরন—আর চরিত্রদের মনের টানাপোড়েন ছাড়া আর-কোনো স্পষ্ট ঘটনা বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও থাকে না। আর তা থেকেই এটা মনে হ'তে পারে যে মৃতদেহ—বা, এককথায়, মৃত্যুই—সম্ভবত গার্সিয়া মার্কেসের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর ৩১টি গল্পের মধ্যে অন্তত ২০টি গল্পে এই বিষয় পাওয়া যাবে—তাছাড়া সবগুলো উপন্যাসেও এই মৃতদেহের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এমন গল্পের দেখা মিলবে, যার আখ্যান অতি অনড়, 'গতিহীন', স্থাণু—এমনকী মৃত ব্যক্তিই হয়তো গল্পটা শোনাচ্ছে আমাদের, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাও হয়, যেমন হয়েছিলো মেহিকোর লেখক হুয়ান রুলফোর (১৯১৮-৮৬) 'পেদ্রো পারামো' উপন্যাসে।

মৃত্যু (—সে বাস্তব, বা আধ্যাত্মিক, যা-ই হোক-না কেন—) অথবা মৃত ব্যক্তি অনেক সময়েই প্রধান বক্তব্য জানিয়ে যায়—'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'য় যেমন পার্চমেন্টের মধ্যে বুয়েন্দিয়া বংশের কাহিনী আগে থেকেই লিখে গিয়েছিলো বেদে মেলকিয়াদেস—মৃত্যুর পরেই। এ-সব চরিত্রের বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে নিশ্চয়ই—তারাই তাকিয়ে ভাখে—বা আগে থেকেই টের পায়—কোনো বংশ-ক্ষয়ের ধ্বংস, যারা মৃত্যুর আগেই বিলম্বিত-প্রলম্বিত মরণ-প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজে পায় জীবন্মৃত্যুর বা জড়দশার সমান্তর।

এটা ঠিক যে তাঁর কিছু গল্প আছে, প্রচলিত ধরনে লেখা; কী কাঠামো, কী লেখার ভঙ্গি—দুয়েতেই হয়তো আপাতদৃষ্টিতে তেমন-কোনো নতুনত্ব চোখে পড়বে না—এবং এখানে 'আপাতদৃষ্টিতে' কথাটার ওপরই বেশি জোর দেয়া হচ্ছে। গল্প ব'লে যাচ্ছে উত্তম পুরুষ, চরিত্রদের ভাব-ভঙ্গি কথাবার্তা থেকে নিংড়ে নিচ্ছে—উদ্দেশ্যময়ভাবে—বাস্তবতার একটি রূপ—কোনো সমস্যা বা সংকটের অস্বস্তিকর, ভয়াবহ চেহারা। এই পদ্ধতিটা অন্য ধরনের গল্পেও এই অর্থে উপস্থিত যে, ঘটনা-সংঘাত কোনোখানেই প্রায় নেই, আর গল্পের যেটা কেন্দ্রবিন্দু—অর্থাৎ মৃত্যু—সেটাকে বসানো হয়েছে কোনো চরিত্রের ভাবনায় বা কথায়। "মৃত্যুর অন্যদিক",

"আয়নার সঙ্গে বৈতালাপ", "ছ-টার সময় এলো যে-মেয়ে"—(শেষোক্ত গল্পটিতে একটি গণিকা তার শেষ খদ্দেরকে খুন ক'রে ফ্যালে), অথবা "বৃষ্টির মধ্যে এলো যে-লোক"—এই গল্পগুলো, তা-ই, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

...

সময়ের দু-রকম ধারণা

আর ১৯৫৬ থেকে ৫৯-এ লেখা গল্পগুলোই এই আখ্যানরীতিকে নতুন আয়তন দেয়—শুকাতের মধ্যে এখন ঘটনা ও ঘাতপ্রতিঘাত (সেই অর্থে, এখন তাঁর লেখায় তাকে স্পষ্ট একটা 'কাহিনী') এই প্রলম্বিত মরণের অভিজ্ঞতার মধ্যেই ধীরে-ধীরে রূপ পেতে থাকে। এটা সবচেয়ে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে "মঙ্গলবারের সিয়েস্তা", "এই রকমই একদিনে", "শনিবারের একদিন পরে"—এইসব গল্পে। আর তাকে ফিরে পাওয়া যায় 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না'-তে : এক খাবি-খেতে-থাকা রাজনৈতিক চৈতন্যের কাহিনী এটা, গল্প যখন শুরু হয় তখনই কর্নেলের শেষ দশা, কিন্তু গল্পের আরম্ভেই আছে পুলিশ কেমন ক'রে তাঁর ছেলেকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। অগুনতি মৃতদেহের পচা গন্ধে 'অশুভ লগ্ন' উপন্যাসের আবহাওয়া আচ্ছন্ন, ভারি, দম-আটকানো—সারা গ্রাম অপেক্ষা ক'রে আছে কখন আসবে প্রতিশোধের মুহূর্ত, আর তিক্ততা শুধু বেড়েই চলে, আর এক স্ত্রীলোক জানায় 'যাদের তুমি খুন করেছো, তুমি এখন তাদের কাছেই ফিরে গেছো।' তিক্ত, মরীয়া, অক্ষম এক হতাশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে এইসব গল্প। দুপুরবেলার তীব্র তাপ, সবকিছু ধুলোয় ভ'রে যাচ্ছে, সবকিছু প'চে যাচ্ছে—আর তার ওপর ভনভন করছে মাছি—'বড়ো মায়ের অন্ত্যেষ্টি' বইয়ের গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য তো এটাই। "এই শহরে কোনো চোর নেই" গল্পে দামাসো সারাক্ষণ একটা চাপের মধ্যে আছে—কেননা এখানে তার কিছুই করার নেই, বিলিয়ার্ড বল চুরি করলে অবস্থা আরো সঙ্গিন হ'য়ে যায়, তার সন্ধেগুলো এখন কাটবে কী ক'রে?

গার্সিয়া মার্কেস নিজে তাঁর কোনো-কোনো লেখা সম্বন্ধে সন্দিহান হ'লে কী হবে, বিশেষ কতগুলো আখ্যানরীতি সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য আর শ্রদ্ধা কিন্তু মোটেই অগোচর থাকে না। কেননা এ-সব গল্পে আখ্যানরীতির আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরেও থেকে যায় তাঁর মূল প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কঠোর জটবহুল এক বিতর্ক—যেখানে শেষ অব্দি তিনি আশ্রয় নেন মার্ক্সীয় চিন্তায়।

স্বপ্নে আর কুহকে মেশা বাস্তব

আমি বলবো, নারী ও পুরুষ দুয়ের ক্ষেত্রেই, 'মাচিসমো' আসলে অন্য-কারু অধিকারকে আত্মসাৎ ক'রে নেবারই ব্যাপার শুধু। এমনই সহজ সরল ব্যাপারটা।

…

[কাজে-লাগতে-পারে এমন-সব কৃৎকৌশল কি লেখককে শেখাতে পারে চলচ্চিত্র—এই প্রশ্নের উত্তরে :] আমি সঠিক জানি না পারে কি না। আমার বেলায়, চলচ্চিত্র একই সঙ্গে সহায় আর বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। চলচ্চিত্র আমাকে শিখিয়েছিলো কী ক'রে ছবির পর ছবিতে কিছু ভাবতে হয়। কিন্তু, একই সঙ্গে আবার, এখন আমি দেখতে পাই চরিত্র বা দৃশ্যকে চাক্ষুষ ক'রে তোলবার জন্যে একটা বাড়াবাড়িরকম উৎসাহ এসে গিয়েছিলো, এমনকী কোন কোণ থেকে ক্যামেরা কোন ফ্রেমে ছবি তুলবে তা নিয়ে যেন একটা বাতিকই তৈরি হ'য়ে গিয়েছিলো… [যেমন, 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না'] শৈলীর দিক থেকে এই উপন্যাস প্রায় একটা চিত্রনাট্যেরই মতো। চরিত্ররা এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন ক্যামেরা তাদের পেছন-পেছন চলেছে; এখন যখন আবার আমি বইটা পড়ি আমি ক্যামেরাকেই দেখতে পাই। এখন [কিন্তু] আমি বিশ্বাস করি সাহিত্যিক কৃৎকৌশল সিনেমার কৃৎকৌশলের চাইতে অনেক আলাদা।

…

পঁচিশ বছর আগে ডোমিনিকার লেখক হুয়ান বশকে কারাকাসে বলতে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন লেখার শিল্পের দিকটা—কৃৎকৌশল, কাঠামো তৈরির উপায়, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গোপন ও লুকোনো তথ্য জুড়ে দেবার কায়দা—সব কেউ ছেলেবেলাতেই শিখে ফ্যালে। আমরা লেখকরা টিয়ের মতো, বুড়ো হ'য়ে গেলে আমরা কেউ আর কথা বলতে শিখি না।

…

নির্বিকার মুখে, দিদিমা আমায় সারাক্ষণ আশ্চর্য ও আজগুবি সব গল্প শোনাতেন, অথচ মাথার চুল খাড়া হ'তো না, মনে হ'তো যা বর্ণনা করছেন তা যেন তিনি এইমাত্র দেখতে পেয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর ঐ অবিচল নির্বিকার ভঙ্গি আর তাঁর চিত্রকল্পগুলোর ঐশ্বর্যই তাঁর গল্পগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলতো। আমি 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' লিখেছিলাম আমার দিদিমার [গল্প বলার] কৌশল ব্যবহার ক'রেই।

—'পেয়ারার গন্ধ' (১৯৮৩)তে গার্সিয়া মার্কেস

…

গোলকধাঁধার রাস্তা কোথায় ?

'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' বেরুবার পাঁচ বছর পর, ১৯৭২-এ, সাতটি গল্প নিয়ে

বেরিয়েছিলো 'সরলা এরেন্দিরা আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী'; তার মধ্যে একটি, "হারানো সময়ের সমুদ্র" (যেটা গার্সিয়া মার্কেস ছোটোদের গল্প হিশেবেই লিখেছিলেন, কেননা তাঁর ইচ্ছে ছিলো ছোটোদের জন্যে একটি ছোটো-গল্পের বই বার করবেন—আর এই গল্পটা সেই বইতে যাবে) যদিও লেখা হয়েছিলো ১৯৬১-তে ছাপা হ'য়ে বেরিয়েছিলো কিন্তু ১৯৬২-তে। অন্য গল্পগুলোর ভেতর চারটির রচনাকাল ১৯৬৮, একটির ১৯৭০, আর "সরলা এরেন্দিরা…" (ছোটো উপন্যাস? দীর্ঘ ছোটোগল্প?) লেখা হয়েছিলো ১৯৭২-এ; এই সাতটি গল্পের মধ্যে মাত্র তিনটিই এই গল্পসংগ্রহ বেরুবার আগে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বেরিয়েছিলো। এই গল্পগুলোর পটভূমি মাকোন্দো নয়, অথবা সেই পুয়েব্লো বা জনপদ নয় যা ছিলো 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না', 'অশুভ লগ্ন', 'বড়ো মায়ের অন্ত্যেষ্টি' বা 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি'র পটভূমি—তবে কোনো-কোনো, খুঁটিনাটি রচনাকৌশলের কোনো-কোনো আশ্চর্য বা অপ্রত্যাশিত কায়দা, কোনো-কোনো ঘটনা বা অনুষঙ্গ বা প্রচ্ছন্ন উল্লেখ কিন্তু কালানুক্রম অনুসারে ধারাবাহিকভাবে প'ড়ে গেলে আমাদের চেনা লাগবে—এমনকী ১৯৭২-এর পরেও তাঁর অনেক রচনায় এদের গুপ্ত ও পৌনঃপুনিক উল্লেখ থাকবে, কেউ-কেউ ইচ্ছে করলে তাকে বলতে পারেন *leitmotif*, তবে এই 'লাইটমোটিফ' রচনা থেকে রচনায় বিস্তৃত। গার্সিয়া মার্কেস যখন 'বোগোতাসি'র (দ্র. 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না', কলকাতা, ১৩৯৭) পর বাররানকিয়ায় 'এল উনিভের্সাল' কাগজের জন্যে কাজ করবেন ব'লে চ'লে যান তখন তাঁর সঙ্গে যাঁদের বন্ধুতা হয়েছিলো তাঁদের একজন আলভারো সেপেদা সামুদিও, বয়েসে গার্সিয়া মার্কেসের চাইতে চার বছরের বড়ো, সিয়েনাগায় যখন কলাখামারের ধর্মঘটীদের ওপর গুলি চালিয়ে সামরিক হন্তা নির্বিচার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলো তখন সেপেদা সামুদিও স্কোয়ারের সামনেই একটা বাড়িতে থাকতেন—১৯৫৪-তে তাঁর প্রথম ছোটোগল্পসংগ্রহের সমালোচনা করেছিলেন গার্সিয়া মার্কেস: সেই সমালোচনায় তিনি সেপেদা সামুদিওর এমন বর্ণনা দিয়েছিলেন যাতে তাঁকে দেখে মনে হ'তো সেপেদা সামুদিও বুঝি কোনো ট্রাকড্রাইভার। "সরলা এরেন্দিরা"র যখন অতর্কিতে কাহিনীর মধ্যে গার্সিয়া মার্কেস স্বয়ং এসে উদিত হন, তখন তিনি রিওআচা প্রদেশে বিশ্বকোষ আর ডাক্তারি বই বিক্রি ক'রে বেড়াচ্ছেন, আর সেপেদা সামুদিওও তখন ঐ এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন মরুভূমির খাঁ-খাঁ গরমে বিয়ার ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্রপাতি বেচতে, আর তিনি গার্সিয়া মার্কেসকে ট্রাকে ক'রে মরুভূমির উষর শহরগুলোয় নিয়ে যেতেন যাতে চুটিয়ে আড্ডা দেয়া

স্বপ্নে আর কুহকে মেশা বাস্তব

আমি বলবো, নারী ও পুরুষ দুয়ের ক্ষেত্রেই, 'মাচিসমো' আসলে অন্য-কারু অধিকারকে আত্মসাৎ ক'রে নেবারই বোঝায় শুধু। এমনই সহজ সরল ব্যাপারটা।

…

[কাজে-লাগতে-পারে এমন-সব কৃৎকৌশল কি লেখককে শেখাতে পারে চলচ্চিত্র—এই প্রশ্নের উত্তরে :] আমি সত্যি জানি না পারে কি না। আমার বেলায়, চলচ্চিত্র একই সঙ্গে সহায় আর বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। চলচ্চিত্র আমাকে শিখিয়েছিলো কী ক'রে ছবির পর ছবিতে কিছু ভাবতে হয়। কিন্তু, একই সঙ্গে আবার, এখন আমি দেখতে পাই চরিত্র বা দৃশ্যকে চাক্ষুষ ক'রে তোলবার জন্যে একটা বাড়াবাড়িরকম উৎসাহ এসে গিয়েছিলো, এমনকী কোন কোণ থেকে ক্যামেরা কোন ফ্রেমে ছবি তুলবে তা নিয়ে যেন একটা বাতিকই তৈরি হ'য়ে গিয়েছিলো… [যেমন, 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না'] শৈলীর দিক থেকে এই উপন্যাস প্রায় একটা চিত্রনাট্যেরই মতো। চরিত্ররা এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন ক্যামেরা তাদের পেছন-পেছন চলেছে ; এখন যখন আবার আমি বইটা পড়ি আমি ক্যামেরাকেই দেখতে পাই। এখন [কিন্তু] আমি বিশ্বাস করি সাহিত্যিক কৃৎকৌশল সিনেমার কৃৎকৌশলের চাইতে অনেক আলাদা।

…

পঁচিশ বছর আগে ডোমিনিকার লেখক হুয়ান বশকে কারাকাসে বলতে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন লেখার শিল্পের দিকটা—কৃৎকৌশল, কাঠামো তৈরির উপায়, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গোপন ও লুকোনো তথ্য জুড়ে দেবার কায়দা—সব কেউ ছেলেবেলাতেই শিখে ফ্যালে। আমরা লেখকরা টিয়ের মতো, বুড়ো হ'য়ে গেলে আমরা কেউ আর কথা বলতে শিখি না।

…

নির্বিকার মুখে, দিদিমা আমার সারাক্ষণ আশ্চর্য ও আজগুবি সব গল্প শোনাতেন, অথচ মাথার চুল খাড়া হ'তো না, মনে হ'তো যা বর্ণনা করছেন তা যেন তিনি এইমাত্র দেখতে পেয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর ঐ অবিচল নির্বিকার ভঙ্গি আর তাঁর চিত্রকল্পগুলোর ঐশ্বর্যই তাঁর গল্পগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলতো। আমি 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' লিখেছিলাম আমার দিদিমার [গল্প বলার] কৌশল ব্যবহার ক'রেই।

—'পেয়ারার গন্ধ' (১৯৮৩)তে গার্সিয়া মার্কেস

…

গোলকধাঁধার রাস্তা কোথায় ?

'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' বেরুবার পাঁচ বছর পর, সাতটি গল্প নিয়ে

বেরিয়েছিলো 'সরলা এরেন্দিরা আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী'; তার মধ্যে একটি, "হারানো সময়ের সমুদ্র" (যেটা গার্সিয়া মার্কেস ছোটোদের গল্প হিশেবেই লিখেছিলেন, কেননা তাঁর ইচ্ছে ছিলো ছোটোদের জন্যে একটি ছোটোগল্পের বই বার করবেন—আর এই গল্পটা সেই বইতে যাবে) যদিও লেখা হয়েছিলো ১৯৬১-তে ছাপা হ'য়ে বেরিয়েছিলো কিন্তু ১৯৬২-তে। অন্য গল্পগুলোর ভেতর চারটির রচনাকাল ১৯৬৮, একটির ১৯৭০, আর "সরলা এরেন্দিরা…" (ছোটো উপন্যাস? দীর্ঘ ছোটোগল্প?) লেখা হয়েছিলো ১৯৭২-এ; এই সাতটি গল্পের মধ্যে মাত্র তিনটিই এই গল্পসংগ্রহ বেরুবার আগে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বেরিয়েছিলো। এই গল্পগুলোর পটভূমি মাকোন্দো নয়, অথবা সেই পুয়েব্লো বা জনপদ নয় যা ছিলো 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না', 'অশুভ লগ্ন', 'বড়ো মায়ের অন্ত্যেষ্টি' বা 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি'র পটভূমি—তবে কোনো-কোনো, খুঁটিনাটি রচনাকৌশলের কোনো-কোনো আশ্চর্য বা অপ্রত্যাশিত কায়দা, কোনো-কোনো ঘটনা বা অনুষঙ্গ বা প্রচ্ছন্ন উল্লেখ কিন্তু কালানুক্রম অনুসারে ধারাবাহিকভাবে প'ড়ে গেলে আমাদের চেনা লাগবে—এমনকী ১৯৭২-এর পরেও তাঁর অনেক রচনায় এদের গুপ্ত ও পৌনঃপুনিক উল্লেখ থাকবে, কেউ-কেউ ইচ্ছে করলে তাকে বলতে পারেন *leitmotif*, তবে এই 'লাইটমোটিফ' রচনা থেকে রচনায় বিস্তৃত। গার্সিয়া মার্কেস যখন 'বোগোতাসি'র (দ্র. 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না', কলকাতা, ১৩৯৭) পর বাররানকিয়ায় 'এল উনিভের্সাল' কাগজের জন্যে কাজ করবেন ব'লে চ'লে যান তখন তাঁর সঙ্গে যাদের বন্ধুতা হয়েছিলো তাঁদের একজন আলভারো সেপেদা সামুদিও, বয়েসে গার্সিয়া মার্কেসের চাইতে চার বছরের বড়ো, সিয়েনাগায় যখন কলাবাগানের ধর্মঘটীদের ওপর গুলি চালিয়ে সামরিক হন্তা নির্বিচার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলো তখন সেপেদা সামুদিও স্কোয়ারের সামনেই একটা বাড়িতে থাকতেন—১৯৫৪-তে তাঁর প্রথম ছোটোগল্পসংগ্রহের সমালোচনা করেছিলেন গার্সিয়া মার্কেস: সেই সমালোচনায় তিনি সেপেদা সামুদিওর এমন বর্ণনা দিয়েছিলেন যাতে তাঁকে দেখে মনে হ'তো সেপেদা সামুদিও বুঝি কোনো ট্রাকড্রাইভার। "সরলা এরেন্দিরা"য় যখন অতর্কিতে কাহিনীর মধ্যে গার্সিয়া মার্কেস স্বয়ং এসে উদিত হন, তখন তিনি রিওআচা প্রদেশে বিশ্বকোষ আর ডাক্তারি বই বিক্রি ক'রে বেড়াচ্ছেন, আর সেপেদা সামুদিওও তখন ঐ এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন মরুভূমির খাঁ-খাঁ গরমে বিয়ার ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্রপাতি বেচতে, আর তিনি গার্সিয়া মার্কেসকে ট্রাকে ক'রে মরুভূমির ঊষর শহরগুলোয় নিয়ে যেতেন যাতে চুটিয়ে আড্ডা দেয়া

যায়—যেমন আর বুড়োকে যেন কল্পনার জগতে জীবিত চরিত্রদের এইভাবেই অনু-প্রবেশ ঘটেছিলো। কিংবা, ধরা যাক, রাফায়েল এস্কালোনার কথা : "সরলা এরেন্দিরা"-র আছে : 'আমি হয়তো তাদের [এরেন্দিরা ও তার ঠাকুমার] জীবনের খুঁটিনাটির দিকে তাকাতুমই না যদি-না অনেক বছর পরে রাফায়েল এস্কালোনা একটা গানের মধ্যে এই জীবননাট্যের ভয়াবহ পরিসমাপ্তি উদ্ঘাটন ক'রে দিতেন' ; 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না'-য় আছে : যখন কোনো খাবার নেই, পয়সা নেই, এক বেলাও চলে না কর্নেল আর তাঁর স্ত্রীর, যখন হা ক'রে কর্নেল ব'সে আছেন কখন তাঁর পেনশনের খবর নিয়ে আসে চিঠি, তখন এইরকম একটি দ্বৈতালাপ ঘটেছিলো কর্নেলের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর :

> [স্বামীর দিকে] না-তাকিয়েই স্ত্রী তাঁকে বললেন :
> 'আমরা তো ঘড়িটা বেচে দিতে পারি।'
> এ-কথাটা কর্নেলও ভেবেছিলেন আগে। 'আমি ঠিক জানি আলভারো তোমায় তক্ষুনি চল্লিশ পেসো দিয়ে দেবে,' বললেন মহিলা। 'ভেবে ভাখো কেমন তড়িঘড়ি ও সেলাইকলটা কিনে নিয়েছিলো।'
> আলভারো যে-দরজির দোকানে কাজ করতো, তার কথাই বলছিলেন তিনি।
> 'সকালেই ওর সঙ্গে কথা ব'লে দেখা যায়,' সায় দিলেন কর্নেল।
> 'আর ঐ "সকালে বলা-টলা" নয়,' তিনি গোঁ ধ'রে বললেন। 'ঘড়িটা এক্ষুনি নিয়ে যাও ওর কাছে। সোজা গিয়ে ঘড়িটা কাউন্টারে রেখে ওকে বলো, "আলভারো, তুমি কিনবে ব'লে ঘড়িটা আমি নিয়ে এসেছি।" ও তক্ষুনি ব্যাপারটা বুঝে যাবে।'
> কর্নেল মরমে ম'রে গেলেন।
> 'এ তো গির্জের বেদিটা নিয়ে গিয়ে বেচে দেয়া,' প্রতিবাদ করলেন তিনি। 'ও-রকম একটা দর্শনীয় জিনিস হাতে যদি আমায় কেউ ভাখে তো রাফায়েল এস্কালোনা অমনি আমায় নিয়ে একটা গান বেঁধে ফেলবে।'

এই-যে রাফায়েল এস্কালোনা গার্সিয়া মার্কেসের একাধিক গল্পে এসে হাজির, তিনি কোলোম্বিয়ার একজন অতীব জনপ্রিয় গায়ক, সমকালীন ঘটনা নিয়ে তিনি গান বাঁধেন আর ঘুরে-ঘুরে সে-গান গেয়ে শোনান।

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই গল্পগুলো মাকোন্দো কিংবা ঐ নামহীন পুরের লোকে বাঁধা হয়নি, তবু এটাও মনে রাখা উচিত 'সরলা এরেন্দিরা'র গল্প-গুলো গ'ড়ে উঠেছে কোলোম্বিয়ার বাস্তব পরিবেশ থেকেই। গল্পগুলোর পটভূমি প্রধানত গুয়াহিরা উপদ্বীপ, ভেনেজুয়েলার সীমান্ত ঘেঁষে রুক্ষ ঊষর বন্ধ্যা এক অঞ্চল যেখানে চোরাচালান হচ্ছে অতিসাধারণ কর্মোদ্যোগ। একাধিক গল্পে যে-আরুবা দ্বীপের উল্লেখ আছে সেই দ্বীপ ভেনেজুয়েলার উত্তর-পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে অবস্থিত—

যদিও সমুদ্রের ধারের যে-শহর একাধিক গল্পে বর্ণনা করা হয়েছে তার কোনো নাম দেয়া হয়নি—কিন্তু আরুবা দ্বীপ, ভূত রুক মরুভূমি, গুয়াহিরো ইন্ডিয়ান ইত্যাদি উল্লেখ আমাদের চট ক'রেই বাস্তব পটভূমিটিকে চিনিয়ে দেয়। "ভূতুড়ে জাহাজের শেষ পাড়ি"তে যে-বন্দরশহরের উল্লেখ আছে সেটা সেকলবাঁধা উপসাগর আর কার্তাহেনার ক্রীতদাস বন্দরের কথাই বলে, যার ওপর অনবরত ঘুরে-ঘুরে পড়ে সান্তা মার্তার আলোকস্তম্ভের তীব্র সন্ধানী আলো।

"হারানো সময়ের সমুদ্র" বাদ দিলে (সেটা এই গল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আগে লেখা—প্রকাশকাল 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না' আর 'অশুভ লগ্ন'র সমসাময়িক) বাকি সব গল্পই 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' (১৯৬৭) আর 'কুলপতির হেমন্ত'র (১৯৭৫) মধ্যবর্তী সময়ে লেখা। 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র গার্সিয়া মার্কেসের যে-সব কৃৎকৌশলের ওপর মার্কামারা ছাপ প'ড়ে গিয়েছিলো (লেখকরা অনেক সময়েই নিজের ফাঁদে নিজেরাই পা দেন : নিজের রচনাকৌশলের গোলকধাঁধায় একবার ঢুকে পড়লে আরিয়াদ্‌নের সুতোর কাটিম হাতে না থাকলে পথ খুঁজে-খুঁজে বার হওয়া শক্ত), নতুন উপন্যাসে তাদের বর্জন ক'রে গার্সিয়া মার্কেস একেবারে অন্যভাবে লিখতে চাচ্ছিলেন—চাচ্ছিলেন যে 'কুলপতির হেমন্ত'র রচনা-কৌশল, ভাষা, অনুষঙ্গ, উল্লেখ, দৃষ্টান্ত, গুপ্তসংযোগসূত্র সবকিছুই যেন অন্যরকম হয়। এই গল্পগুলো তাই এক ধরনের লেখার অভ্যাস কাটিয়ে উঠে অন্য ধরনের রূপবন্ধ ও রচনাপদ্ধতি আবিষ্কার করার চেষ্টা। কিন্তু তাই ব'লে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে এই আখ্যায়িকাগুলো নেহাৎই নতুন রূপবন্ধের অনুসন্ধান, নিছক প্রাকরণিক নিরীক্ষার দলিল বা ফসল। এটা তো অনস্বীকার্য যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, উক্তি ও উপলব্ধির অভেদ থেকেই জন্মায় সার্থক সাহিত্য। এখানেও রূপবন্ধগুলো প্রসঙ্গেরই প্রকাশরূপ—অর্থাৎ আভ্যন্তর টানাপোড়েন থেকেই প্রকরণ তৈরি হচ্ছে—তবে তলায়-তলায় যে 'কুলপতির হেমন্ত'র জন্যে নতুন কৌশল, নতুন 'প্রপ্‌স,' আখ্যায়িকা যার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে তার জন্যে নতুন খুঁটি খুঁজে বার করার একটা সচেতন চেষ্টা ছিলো, সেটাও এখানে মনে রাখা জরুরি। শেষ পর্যন্ত 'কুলপতির হেমন্ত' লেখা হয়েছিলো কবিতার মতো, শব্দের পর শব্দ জুড়ে-জুড়ে, এমনকী গোড়ার দিকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটেছিলো মাত্র কয়েকটি বাক্য রচনা করবার চেষ্টায়। ভাষাকে নতুনভাবে ব্যবহার করবার জন্যে এমনকী প্রচলিত অন্বয়রীতিকেও ভেঙে দেয়া হয়েছিলো। ভেঙে দেয়া হয়েছিলো সময়ের ধারাবাহিক সরল রেখার গতি, ভূগোল নিয়ে খেলা করা হয়েছিলো ইচ্ছেমতো, এমনকী কেউ-

কেউ হয়তো বলতে চাইবেন ইতিহাসকেও উলটোপালটা ক'রে নেয়া হয়েছে সেখানে। দীর্ঘ সব অনুচ্ছেদ, তাতে সেমিকোলন বা ফুলস্টপ নেই—একই অনুচ্ছেদে (কখনও-কখনও একই বাক্যবন্ধে) ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বুনে দেয়া হয়েছে। সময় যদি সরল রেখায় ধারাবাহিক এগুতো, তাহ'লে তাকে মনে হ'তো অফুরান—গার্সিয়া মার্কেসের মতে ঐ নতুন সময়ের কাঠামো তাঁকে সাহায্য করেছিলো সবকিছু খাটো ক'রে ফেলতে, যেন একটা ছোট্ট বোতলের মধ্যে কয়েক শতাব্দীকে ধ'রে রাখা হয়েছে, একই সঙ্গে অনেকের গলার স্বরকে বাধা দিয়েছে শনাক্ত করা যায় না এমন কারু-কারু কণ্ঠস্বর। একদিন একসারে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় সকলেই চিড়েতনের গোলামের মতো সেজে আছে, মাথায় লাল মাথাঢাকা, বিক্রি করছে সবকিছু—ইগুয়ানার ডিম, কুমিরের চামড়া, তামাক, চকোলেট—যাতে ঐ লাল বনাৎ কিনে নিতে পারে। একসারে জানলা খুলে তাকিয়ে দ্যাখে ক্রিস্তোবাল কোলোনের (ক্রিস্টোফার কলম্বাসের) তিনটে হালকা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের যুদ্ধজাহাজের পাশে—ইতিহাসের সময়ক্রমকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে। আরুবা দ্বীপ, কুরাসাঁউ, পানামা, পুরোনো লা হাবানা, সান হুয়ান বা লা গুয়াহিরা, বারানকিয়া, কার্তাহেনা—(ইংরেজি-বলা ক্যারিবিয়নের মধ্যে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এস্পানিওল ক্যারিবিয়ন) নানা ভৌগোলিক দ্বীপ-শহর মিশিয়ে দিয়ে তৈরি হয়েছে পটভূমি। "বড়ো মায়ের অন্ত্যেষ্টি" গল্পে গার্সিয়া মার্কেস একদিন পোপকে এক কল্পনাতীত অসম্ভব নৌযাত্রায় ভাটিকান সিটি থেকে সরাসরি এনে হাজির করেছিলেন কোলোম্বিয়ার একটি ছোট্ট গ্রামে। আরো বড়ো পরিসরে সেইরকমভাবেই সম্ভব-অসম্ভব সবকিছুকে জুড়ে দিয়ে তৈরি হয়েছে 'কুলপতির হেমন্ত'র গদ্যকবিতার ভাষা, গানের ছন্দ—ওতপ্রোত তাতে মিশে আছে ক্যারিবিয়নের প্রসঙ্গ, প্রকাশভঙ্গি, গানের টুকরো, কথ্যছন্দ—আর ভাঁজে-ভাঁজে মিশে আছে রুবেন দারিওর কবিতা। এমনকী রুবেন দারিও এই বইতে একটি চরিত্র হিসেবেই দেখা দিয়েছিলেন—আর ইশারা, ইঙ্গিত, উল্লেখ সবকিছু মিলে রুবেন দারিওকে এই উপন্যাসে প্রায় প্রচ্ছন্ন পাঠ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অন্য-একদিক থেকেও এই উপন্যাসের গড়ন লাতিন আমেরিকার গণগানের কথা মনে করিয়ে দেয়। গার্সিয়া মার্কেস নিজেই একবার বলেছিলেন এই উপন্যাস ঠিক একটা বোলেরোর মতো। 'যদি সত্যি-খাঁটি কোনো লাতিন আমেরিকা সংগীত থেকে থাকে তবে তা হ'লো বোলেরো।' এমনিতে তাকে মনে হ'তে পারে ভারি আবেগপ্রবণ, ভাবালুতায় ভরা, কিন্তু তার মধ্যে একটা ইয়ার্কিও

ভঙ্গি আছে, তার যাবতীয় বাড়াবাড়ি বা আতিশয্য রঙ্গকৌতুক পরিহাসে ভরা, আর সবসময় এ-রকম একটা ভঙ্গি থাকে যে 'একে কিন্তু ঠিক আক্ষরিকভাবে নিয়ো না,' যেটা বাকি শুধু লাতিন আমেরিকীয়রাই বুঝতে পারে। গার্সিয়া মার্কেসের বন্ধু কোলোম্বিয়ার ঔপন্যাসিক প্লিনিও আপুলেইয়ো মেনদোসার মতে, 'বোলেরো অনেকটা ঠিক হোর্হে লুইস বোর্হেসের ব্যবহার করা বিশেষণের মতো—তাকে বিশ্বাস করলে শুধু-যে ঠকতে হবে তা-ই নয়, হোর্হে লুইস বোর্হেসকে পুরোপুরি বোঝাও যাবে না।'

গোলকধাঁধায় মিনোটারের মতো লেখকরা নিজেদের মুদ্রাদোষের পাকে-চক্রেই প'ড়ে যান অনেক সময়; সচেতন লেখকই শুধু অনবরত বদলাবার চেষ্টা করেন—এ-কথা এমনকিছু নতুন বা আহামরি আবিষ্কার নয়। 'পাতার ঝড়'-এর সাফল্য সত্ত্বেও সমালোচকেরা যখন গার্সিয়া মার্কেসের রচনায় উইলিয়াম ফকনারের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি (বা অভিঘাত) লক্ষ করছিলেন, গার্সিয়া মার্কেস পরের দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন সম্পূর্ণ অন্যরকম—'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না' আর 'অশুভ লগ্ন'; কিন্তু তাতেও কি পার পাবার জো আছে—তখন সমালোচকেরা রাতারাতি এই দুটো উপন্যাসে আবিষ্কার করেছিলেন আর্নেস্ট হেমিংওয়েকে—যেন উত্তরের বিরাট প্রতিবেশী মার্কিন মুলুক কেবল আর্থ-রাজনৈতিক দিকেই লাতিন আমেরিকাকে কব্জা ক'রে ফ্যালেনি, তার সংস্কৃতিটাও পুরোপুরি হাতসাফাই ক'রে কুক্ষিগত ক'রে ফেলেছে। অথচ এটা তো ভাবা উচিত ছিলো গার্সিয়া মার্কেস এর আগেই লিখেছেন—সাংবাদিক হিশেবে—জাহাজডুবি নাবিকের কাহিনী, সাইকেল চ্যাম্পিয়নের নিঃসঙ্গতার প্রতিবেদন—পরে লিখবেন, আরো অজস্র সংবাদ পরিবেষণের মধ্যে, চিলের রাস্তায় গোপনে ছদ্মবেশে মিগেল লিভিন-এর রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী। অর্থাৎ অনবরত প্রভাব বা অভিঘাতের কথা না-ভেবে আমাদের বরং লক্ষ করা উচিত সাংবাদিক, চিত্রনাট্যকার, চলচ্চিত্র-সমালোচক গার্সিয়া মার্কেস রচনা থেকে রচনায় বই থেকে বইতে কী-রকম সচেতন-ভাবে বারে-বারে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই-জন্যেই শেষ অব্দি 'কুলপতির হেমন্ত' হ'য়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণভাবেই ক্যারিবিয়নের বই—যার অনেককিছু সাধারণ পাঠকের কাছে জটিল ঠেকলেও, গার্সিয়া মার্কেসের মতে, বারানকিয়ার ট্যাক্সিড্রাইভারের কাছে সহজবোধ্য ব'লে মনে হবে। সব-শুদ্ধু, সতেরো বছর লেগেছিলো এ-বই লিখতে, মাঝখানে এই বইয়ের লেখা থামিয়ে শুধু-যে 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'ই লিখেছেন তা নয়, লিখেছেন 'সরলা

এরেন্দিরা'র গল্পগুলোও। তার আগেও একবার 'অশুভ দশা' (যার প্রথম নামকরণ হয়েছিলো 'ভয়ের শহর' অথবা 'শহর? না গোরখানা?') খাটিয়ে দিয়ে তাঁকে লিখতে হয়েছিলো 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না'।

আসলে শেষ অব্দি নিজের লেখার জট নিজেকেই ছাড়াতে হয় লেখককে, যদি তাঁর ইচ্ছে থাকে। অন্য-কারু বই প'ড়ে, পরামর্শ শুনে, সে-জিনিসটা ঠিক হয় না। গার্সিয়া মার্কেসকেই ভাবতে হচ্ছিলো কেমন ক'রে 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র ফাঁদ থেকে বেরিয়ে—সাফল্যও ফাঁদ, বেড়াজাল, গোলকধাঁধা—'কুলপতির হেমন্ত'কে সামলাতে হবে। আর-কিছু না-হোক, কেমন ক'রে একটি ধারা থেকে অন্যধারায় গিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন, তারই চিহ্ন পাওয়া যাবে 'সরলা এরেন্দিরা'র গল্পগুলোয়। তাই গল্পগুলোয় সত্যি-সত্যি কী আছে, একবার লক্ষ করা যাক।

...

জয়-পরাজয়

মানুষ কীভাবে মানুষকে লাঞ্ছিত করে, কীভাবে অন্যকে ব্যবহার ক'রে নিজে ফেঁপে ওঠে, কীভাবে অন্যকে দাবিয়ে রাখে নিজের তর্জন-গর্জন-শাসনে, আর কেমন ক'রে লাঞ্ছিতের প্রতিরোধ রূপ নেয় প্রতিশোধের—এককথায় একেই হয়তো "সরলা এরেন্দিরা"র মূল প্রসঙ্গ ব'লে বর্ণনা করতে কেউ-কেউ প্রলুব্ধ হবেন: এই অভিশপ্তবলয়ের মধ্যেই এরেন্দিরার জীবনকাহিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে। এস্পানিওল ক্রিয়াপদ *rendir* যার সঙ্গে এরেন্দিরা নামটির ধ্বনিসাদৃশ্য ইচ্ছে ক'রেই তৈরি করা হয়েছে, তার মানে 'জয়-করা', *to conquer*। নামটার দিকে আমাদের কৌতূহল উসকে দেয়া হয়েছিলো যখন একবার উলিসেস তার নামটা উলটে দিয়ে তাকে ডেকেছিলো: 'রান্দিরেএ'। কেন ডেকেছিলো? উলিসেস কি চায়নি এরেন্দিরার জয় হোক, পরশাসনের নাগপাশ কেটে সে বেরিয়ে আসুক?

"সরলা এরেন্দিরা" যে প্রথমে চিত্রনাট্য হিশেবে লেখা হয়েছিলো, এ-তথ্যই সম্ভবত বুঝিয়ে দেয় কেন এই রচনা নির্ভর ক'রে আছে প্রত্যক্ষ চিত্রকল্প, ইন্দ্রিয়ময় অভিজ্ঞান আর নাটকীয় দৃশ্যপরম্পরার ওপর: যেন কোনো সজাগ ও অক্লান্ত ক্যামেরা অবিশ্রান্ত ঘুরে চলেছে তার বিষয়গুলোর ওপর, চরিত্র-চিত্রণের জন্যে কথক নির্ভর ক'রে আছেন শারীরিক বর্ণনা, ঘটনাসংঘাত আর সংলাপের ওপর—যদিও যত কথাই বলুক চরিত্রদের মানসজীবন আমাদের অগোচরই থেকে যায় অনেকটা—একবার ঠাকুমার আবোলতাবোল ও আবোলতাবোলের ঘোরে চীৎকার ক'রে-ওঠা প্রলাপে-বিকারে ছেঁড়া-ছেঁড়া আপাত-অসংলগ্নভাবে, পারম্পর্যবিহীন, ফুটে বেরোয় ঠাকুমার

অতীত—টুকরো-টুকরো ঘটনাগুলো ঠাকুমা যখন উল্লেখ করেন, সেখানে কিন্তু কোনো কালক্রম মেনে তারা আসে না, আসে উলটোপালটাভাবে, সবকিছু জুড়ে দিয়ে শেষকালে আমাদের যখন একটা ধারণা তৈরি হয়, তখন দেখা যায় বিকারগুলোর জটপাকানো উচ্চারণে কোনো কালানুক্রমিকতাই ছিলো না।

একদিকে গল্প ছুঁয়ে আছে দুঃসহ ও করুণ বাস্তব, অন্যদিকে প্রায়ই আমরা উড়াল দিচ্ছি ফ্যান্টাসির পাখায়, খেয়ালি কল্পনার জগতে কৌতুক কেটে পড়ছে ফুলঝুরির মতো—অতিশয়োক্তি, আত্মবিরোধী অথচ সত্য কথা, উদ্ভট আর কিম্ভূতের ব্যবহার—সব ঠাণ্ডাভাবে বলা, যেন শাদামাটা বিবরণ বর্ণনা, যেন কথক মাঝখানে গায়ে প'ড়ে কিছুই বলছেন না। 'জানো, তোমার কী আমার ভালো লাগে?' পরিচয় হবার পর উলিসেসকে বলেছিলো এরেন্দিরা, 'কি-রকম গম্ভীর মুখ ক'রে তুমি কত-কী আজগুবি কথা বানিয়ে বলো।' এ শুধু বোর্হেসের উচ্ছ্বাসের আড়ালই নয়, আমাদের মনে প'ড়ে যায় গার্সিয়া মার্কেসের দিদিমাও কেমন গম্ভীর মুখ ক'রে নির্বিকার ভঙ্গিতে যত আশ্চর্য, উদ্ভট, অতিপ্রাকৃতকেও বিশ্বাসযোগ্যভাবে বর্ণনা ক'রে দিতে পারতেন। যে কোনো ভালো লেখাতেই সে-লেখা কীভাবে পড়তে হবে তার চাবিটাও লুকোনো থাকে : এরেন্দিরার এই কথাগুলো তাই তার আক্ষরিক অর্থ ই শুধু জোগায় না, প্রসঙ্গের মধ্যে কথাগুলো অন্য-একটা তাৎপর্যও পেয়ে যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, গার্সিয়া মার্কেস সাধারণত সংলাপ ব্যবহার করার ব্যাপারে চিরকালই অনিচ্ছুক ; শুধু কিছু-কিছু লেখায়, 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না', 'অশুভ লগ্ন', 'বড়ো মায়ের অন্ত্যেষ্টি'র কোনো-কোনো গল্পে, আর এই বইতেও মাত্র তিনটি গল্পে ("সরলা এরেন্দিরা", "মৃত্যুই ধ্রুব…" আর "হারানো সময়ের সমুদ্র"তে) তিনি কিছু-কিছু সংলাপ ব্যবহার করেছেন। তিনি একবার ব'লেও ছিলেন, লাতিন আমেরিকার লোকে যেভাবে কথাবার্তায় এস্পানিওল ভাষাকে ব্যবহার করে, আর যেভাবে রচনার মধ্যে এস্পানিওল ব্যবহার করা হয়, তাতে মনে হ'তে পারে এ বুঝি পুরোপুরি দুটি আলাদা ভাষা। সেজন্যেই পরোক্ষ উক্তির প্রতি তাঁর এত পক্ষপাত : পরোক্ষ উক্তিতে, এটাও বলা বাহুল্য হবে যে, কথকের নিয়ন্ত্রণ থাকে সর্বাঙ্গীণ। ফলে যে-সব লেখায় তিনি সংলাপ ব্যবহার করেছেন তাদের আলাদা একটা তাৎপর্য থাকে, নিছক সামাজিক বাস্তবতার স্মারক হ'য়েই তারা গল্পের মধ্যে জায়গা জুড়ে থাকে না।

কী আছে মার্কেসের এই গল্পে? এরেন্দিরা, সে চোদ্দ বছর বয়সী এক কিশোরী, এক নাম-না-জানা মরুভূমির নিঃসঙ্গতায় তার ঠাকুমার সঙ্গে একটা প্রাসাদে

থাকে। ঠাকুমা, পুতুলো, অতিকায়, প্রবালবাসের চাইতে অনেক বড়ো, যাকে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে 'শাদা তিমি' ব'লে (মেলভিলের 'মবিডিক' মনে প'ড়ে যায় আমাদের—যে-শাদা তিমির সঙ্গে কাপ্তেন এহাবের মরণপণ বৈরথ) তিনি চোরাচালানকারী আমাদিসের বিধবা—(এখানে এস্পানিওল রোমান্সের আমাদিস দে গাউলাকেও প্যারডির অট্টহাসির সঙ্গে আপনার বানিয়ে নেয়া হয়েছে)—গুজব এই যে, আমাদিস নাকি তাঁকে ক্যারিবিয়ানের কোন্‌-এক দ্বীপ থেকে লুঠ ক'রে এনেছিলো। যখন তাঁর স্বামী ও ছেলে (তারও নাম আমাদিস) মারা গেলো, ঠাকুমা সব দাসদাসীকে বরখাস্ত ক'রে বাধ্য ও বশংবদ এরেন্দিরাকে দিয়ে এত-বড়ো বাড়িটার সব কাজকর্ম করাতে লাগলেন—আর দুই আমাদিসের অস্থিপঞ্জর রইলো কফিনের মধ্যে, পরে যাদের মরুভূমির নানা জায়গায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে-যাওয়া হবে। বাড়ির অজস্র কাজ ক'রে-ক'রে ক্লান্ত কিশোরীটি সারাক্ষণ যেন ঘুমের ঘোরেই কাটায়—ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই সব কাজ করে, কথা বলে। এক রাতে অবসাদে ভ'রে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে, আর তার দুর্ভাগ্যের হাওয়া বইতে শুরু করে শোঁ-শোঁ (এই দুর্ভাগ্যের হাওয়ার পৌনঃপুনিক উল্লেখ গল্পের বুনুনির মধ্যে নানা রকম অনুষঙ্গ তৈরি ক'রে লাইটমোটিফের মতো কাজ ক'রে যায়), আর মোমবাতি থেকে জানলার পর্দায় আগুন ধ'রে গিয়ে পুরো বাড়িটা ছাই হ'য়ে যায়। ঠাকুমা তাঁর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে এখন তাঁর একমাত্র 'পার্থিব ও জঙ্গম সম্পত্তি' এরেন্দিরাকে বেশ্যা হিসেবে ভাড়া খাটায়। কচি মেয়েটির রতিবৈভবের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দূরে-দূরান্তরে, ঠাকুমা এবার সদলবলে বেরিয়ে আসেন মরুভূমির রুক্ষ পথে—অনেক ঘুরে শেষকালে পৌঁছুবেন সমুদ্রতীরে—তারপর সাগরপাড়ি দিয়ে ক্যারিবিয়ানের দ্বীপে—এটাই তাঁর ইচ্ছে। সদলবল মানে ইণ্ডিয়ান কুলি, বাজনদারের দল, একজন ফোটোগ্রাফার—এবং এরেন্দিরা।

মরুভূমির ছোট্ট দুর্গম নিঃসঙ্গ জায়গা থেকে বেরুবামাত্র যা ঘটতে থাকে, তা খুশি করতো মিখাইল বাখ্‌তিনকে: রাব্‌লের পরে এমন ক'রে কার্নিভালকে ব্যবহার করতে খুব কম লোকই পেরেছেন। "ভূতুড়ে জাহাজের শেষ পাড়ি" ছাড়া এ-বইয়ের সব গল্পেই চমকপ্রদভাবে কার্নিভালের পরিবেশ তৈরি হ'য়ে যায়—এমনকী খাঁচায় বন্দী বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়োর চারপাশেও মেলা ব'সে যায়—আমোদ ফুর্তি, সার্কাস, হাটবাজার, জুয়োর টেবিল, কিছুই বাদ যায় না। এই মেলার ব্যাপারটা পরে বোধহয় আরো-একটু বিশদ করা উচিত—যাতে দেখতে পাবো এই গল্পগুলোর মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে গোপন সংযোগ তৈরি হ'য়ে যাচ্ছে।

এই মরুভূমির রাস্তাতেই এরেন্দিরার সঙ্গে দেখা হয় সতেরো বছরের উলিসেস-এর, আমাদিগেরই মতোই সে গ্রীক পুরাণের ধূর্ত বীরের এক প্যারডি। উলিসেসের বাবা এক আমেরিকান, কফলার মধ্যে হিরে 'কলান' তিনি, তারপর চোরাচালান ক'রে দেন সে-সব সীমান্ত পেরিয়ে। মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্যে এস্পানিয়ার চার্চের লোকরা এরেন্দিরাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে যায় তাদের আশ্রয়ে, যতক্ষণ-না কেন তাকে মুক্ত ক'রে আনেন ঠাকুমা। হরণ, মুক্তি—এ-সব কথার পুরোনো প্রচলিত অর্থ পুরোপুরি উলটে যায় এই উলটপুরাণে, যার নামটাই পুরোনো এপিককে ঠাট্টা ক'রে তৈরি করা হয়েছিলো : "সরলা এরেন্দিরা আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী"। পরক্ষণেই এই গল্পের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ে আরেকটি গল্প : "মৃত্যুই ধ্রুব প্রণয়ের পরপারে"। ঠাকুমা পুরোপুরি দুর্নীতিগ্রস্ত এক রাজনৈতিক নেতা সংসদসদস্য (সেনাদোর) ওনেসিমো সানচেসের কাছ থেকে শংসাপত্র বার ক'রে নেন, যেটা আসলে অভয়পত্রও—যাতে ঠাকুমার নৈতিক চরিত্রের বিস্তর তারিফ করা হয়েছে। এদিকে উলিসেস এরেন্দিরার প্রেমে প'ড়ে গিয়েছে : সে ঠিক করে এরেন্দিরাকে সে রূপকথার ড্র্যাগন বা গল্পের শাদা তিমি তার ঠাকুমার কাছ থেকে উদ্ধার ক'রে আনবে। কিন্তু এটা তো উলটো রূপকথাও—ফলে যখন সে এরেন্দিরাকে নিয়ে তার বাবার ট্রাকে ক'রে পালিয়ে যায়, তখন হুড়মুড় রুদ্ধশ্বাস পালাদৌড়ের পর পুলিশ দুজনকে পাকড়ে তাদের যার-যার অভিভাবকের হাতে তুলে দেয়।

এরপর থেকে যেখানেই যাক, এরেন্দিরা বাঁধা থাকে তার খাটুলির পায়ার সঙ্গে। ঠাকুমা তাঁর ধনদৌলত বদ্‌লে নেন চাক-চাক সোনায়, যেটা তিনি তাঁর গায়ের অন্তর্বাসে বুনে নিয়েছেন। আর আমরা এসে পৌঁছুই খাঁ-খাঁ রুক্ষ মরুভূমি থেকে সমুদ্রতীরের খোলা হাওয়ায়—মরুভূমি আর সমুদ্রের প্রতিতুলনায় বন্ধন ও মুক্তির আরো-একটা আলাদা তাৎপর্য তৈরি হ'য়ে যায়। প্রহসন আর আতঙ্কের কিম্ভূত মিশ্রণে এর পর রূপকথার নায়ক উলিসেসের পর-পর পণ্ড চেষ্টা চলে ঠাকুমাকে হত্যা করবার ; শেষটায় বিষ, টাইমবোমা কিছুই যখন সফল হয় না, তখন হত্যার অন্তরঙ্গ রূপ—শিকার ও শিকারির আলিঙ্গন—ভয়াবহ আকার নেয়, ছোরার ঘায়ে ঠাকুমার গা থেকে গলগল ক'রে বেরিয়ে আসে রক্ত, 'তেলতেলে, উজ্জ্বল, সবুজ'। উলিসেস যে তিন বারের চেষ্টায় খুন করতে পারে ঠাকুমাকে সেটাও প্রচলিত রূপকথার চিহ্ন তৈরি করে, এবং পরক্ষণেই তা ভেঙে দেয়। কিংবদন্তির নায়ক হত্যা করছে ভয়ংকর রাক্ষুসী বা ড্র্যাগন—তারপর সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করার প্রত্যাশা!

জেগে-ওঠা উচিত ছিলো রূপকথার মতো। কিন্তু গল্প সে-ভাবে শেষ হয় না—বরং সে-ভাবে শেষ হয় তা থেকে আমরা বুঝতে পারি কেনো *rendir* থেকে তৈরি হয়েছিলো এরেন্দিরা নাম—আর উলিসেস যখন নামটা উলটে দিয়ে 'আরিদনেরে' ব'লে তাকে ডেকেছিলো, তাতে রূপকথার সম্পর্কের তাৎপর্যও আমাদের কাছে পরিষ্কার হ'য়ে আসে। উলিসেস যখন ব'সে আছে ঠাকুমার অতিকায় তিমিশরীরের পাশে, খুন ক'রে ক্লান্ত, মুখটা চটচটে সবুজ ব্যাঙ রক্তে মাখামাখি, হঠাৎ তখন সে দেখতে পেলো এরেন্দিরা সোনার পেটিটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে :

> সে চেঁচিয়ে ডাকলো এরেন্দিরাকে, কিন্তু কোনো সাড়া পেলো না। সে নিজেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলো তাঁবুর মুখে, আর দেখতে পেলো এরেন্দিরা শহর থেকে দূরে সমুদ্রতীর ধ'রে ছুটতে শুরু ক'রে দিয়েছে। তখন সে একটা শেষ চেষ্টা করলো তার পেছনে ধাওয়া ক'রে যাবার, বারেবারে চেঁচিয়ে ডাকলো তাকে ব্যথাতুর এক গলায় যেটা এখন আর কোনো প্রেমিকের গলা নয়, বরং যেন কোনো ছেলের গলা, কারো সাহায্য ছাড়াই কোনো স্ত্রীলোককে খুন ক'রে সে যেন একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে। ঠাকুমার ইন্ডিয়ানরা যখন তার নাগাল পেলো সে তখন বেলাভূমিতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে, আর হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে আতঙ্কে আর নিঃসঙ্গতায়।
>
> এরেন্দিরা তাকে শুনতেই পায়নি। সে ছুটে যাচ্ছে হাওয়ায়, কোনো হরিণের চেয়েও ক্ষিপ্র, আর জগতের কোনো কণ্ঠস্বরই তাকে থামাতে পারতো না। একবারও মাথা না-ঘুরিয়েই সে পেরিয়ে গেলো সোরার খনি, খড়ির গাদের আলাম্বিক, ঝুপড়ি আটচালাগুলোর জঞ্জাল, যতক্ষণ-না শেষ হ'লো সমুদ্রের প্রকৃতিবিজ্ঞান আর শুরু হ'লো মরুভূমি। তবু কিন্তু সে ছুটেই চললো সোনার পেটিটা নিয়ে উষর হাওয়ার পরপারে, আর কখনও-শেষ-না-হওয়া সূর্যাস্তগুলো পেরিয়ে। তার কথা আর-কোনোদিনই শোনা যায়নি অথবা পাওয়া যায়নি তার দুর্ভাগ্যের সামান্যতম চিহ্নও।

কেনো গল্প শেষ হ'লো না, যেমন হওয়া উচিত ছিলো পিতৃতান্ত্রিক জগতের রূপকথার শান্তি- ও স্বস্তি- ভঙ্গের বিশৃঙ্খলার পর 'পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলায়'। এরেন্দিরা যখন কুকুর-বাঁধার শেকল দিয়ে ঠাকুমার পাশে বাঁধা তখন একদিন নিজের অজান্তেই ঠাকুমা ফস ক'রে ব'লে ফেলেছিলেন :

> 'যখন তোর জন্যে আর আমি থাকবো না,...তোকে আর তখন পুরুষের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে কাটাতে হবে না, কারণ তখন কোনো সেরার শহরে তোর নিজের বাড়ি থাকবে। তুই থাকবি স্বাধীন, সুখী।...মস্তো এক মহিলা হ'য়ে উঠবি তুই।...সেবিকারা, অশেষ ভোগের আধার, তোর অধীনে তোর কাছে যারা থাকবে তারা সম্ভ্রমে শ্রদ্ধা করবে তোকে, আর কর্তৃপক্ষের একেবারে ওপরমহলের লোক তোকে সম্মান করবে, খাতির করবে। জাহাজের কাপ্তেনরা তোকে জগতের সব বন্দর থেকে ছবি-ছাপা পোস্টকার্ড পাঠাবে।...তোর বাড়ির নামডাক মুখে-

ফুল উড়ে বেড়াবে, আভিইয়েদের বন্দরের বাজার মতো বাঁশগুলো থেকে অনাবাদ দেশের সীমা অবধি।...আর তোর বাড়ি রাষ্ট্রপতিভবনের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠবে, কারণ সরকারের সব নীতি-টিতি ওখানেই আলোচনা হবে, আর ওখানেই নির্ধারিত হবে দেশের ভবিতব্য।'

ঠাকুমার এই ভবিষ্যৎবাণী আগেই খুলে দেখিয়ে দিয়েছিলো গল্পের শেষ—বৃত্তের অন্ত কোনখানে, কীভাবে, পুরো গোল হ'য়ে রেখা মিলে গিয়ে সম্পূর্ণ ক'রে দেবে বৃত্ত, যেখানে এরেন্দিরারও অধীনে, তাঁবে লোক থাকবে, সেও তখন অন্য লোকদের জীবনের ওপর কর্তৃত্ব ফলাবে, আর মাচিস্‌মোকে পিতৃতান্ত্রিকতার জগৎটাকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে সেইজন্যেই এখন তার চাই ঠাকুমাকে হত্যা ক'রে তাঁর সোনার গেঞ্জি—অঢেল ধন-সম্পদ ছাড়া এই কর্তৃত্ব এই অধিকার হাতে-পাওয়া সম্ভব নয়। ভূমিকা উলটে যাবে তাই শেষকালে, শিকার নিজেই হ'য়ে উঠবে শিকারি, সমুদ্রের মুক্তি থেকে তাই আবার ছুটে এসে তাকে ঢুকতে হবে মরুভূমির ঊষর হাওয়ায়। কোনো নতুন জন্মের প্রতিশ্রুতি বা স্বপ্ন নয়, পিতৃতান্ত্রিকতার ঊষর রুক্ষ বন্ধ্যা মরুভূমির ঘূর্ণিহাওয়ায় আর-কারু দুর্ভাগ্যের সূচনা হবে এবার। পরে, অনেকদিন ধ'রে মাচিস্‌মো ও হত্যাকাণ্ডের যে-কাহিনী তাঁর লেখার ইচ্ছে ছিলো, সেটা যে তিনি সরাসরি লিখবেন, ১৯৮১-তে, নোবেল পুরস্কার পাবার আগের বছর, সেটা বিচিত্র নয়। তিরিশ বছরেরও ওপর অপেক্ষা করেছেন গার্সিয়া মার্কেস সে-বই লিখবার জন্যে, কিন্তু তাঁর মা তাঁকে লিখতে অনুমতি দেননি, কেননা যে-সত্যি ঘটনা নিয়ে তাঁর এ-বই লেখা হবে, তার পাত্রপাত্রীরা ছিলো তাঁদের চেনা, অতিপরিচিত।

...

একটি হত্যার পূর্বঘোষণা

সান্তিয়াগো নাসারকে আগে কেউ বলেনি যে সে খুন হ'য়ে যাবে।

অথচ এমন বিপুলভাবে আর-কোনো খুনের কথাই বোধহয় আগে কখনও ঘোষণা করা হয়নি। খুনের দিন সকালবেলায় বাজারে যখন ভিকারিও যমজেরা সবাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে নিজেদের মধ্যে খুনের কথাটা আলোচনা করেছিলো, তখন অন্তত বাইশজন লোক কথাটা শুনেছিলো: তারা সান্তিয়াগো নাসারকে খুন করবে। যেন তারা চাচ্ছিলো, কেউ এসে বাধা দিক, খুনটা থামাক। গ্রামটা *ছোটো, কোলোম্বিয়ার ক্যারিবিয়ানের উপকূলে একটা ছোট্ট পুরোনো, সবাই* সবাইকে চেনে। এখানে বাইরের লোক বলতে একজনই আছে, বাইয়ার্দো সান্‌

রোমান, কাল রাতে তার বিয়ে হ'য়ে গেছে—আন্‌হেলা ভিকারিওর সঙ্গে; তার বিয়েতে গাঁয়ের সকলের মতোই কাল সারা রাত ধ'রে সান্তিয়াগো নাসারও বিয়ে-বাড়িতে হুল্লোড় করেছে: বিয়ের উৎসবে নাকি অতিথিদের আপ্যায়ন করার জন্যে চল্লিশটা তুর্কিমোরগ আর এগারোটা শুওর কেটে ঝলসানো হয়েছিলো, দুশো পাঁচ ধামা চোলাই মদ আর প্রায় দু-হাজার বোতল আখের মদ খেয়েছে সবাই, গাঁয়ের ধনী-গরিব কেউই বাদ যায়নি, সবাই কোনো-না-কোনোভাবে হুল্লোড়ে অংশ নিয়েছে। সান্তিয়াগো নাসারকে খুন করার মাত্র পাঁচ ঘন্টা আগে ভিকারিও যমজেরা তার সঙ্গে ব'সে মাল টেনেছে, গলা ছেড়ে সুর মিলিয়ে গান গেয়েছে, নাচ-গান চলেছে প্রায় শেষ রাত অব্দি। কিন্তু তবু বিশপের নৌকো যতক্ষণে এসে পৌঁছেছে, গাঁয়ের খুব কম লোকেরই অজানা ছিলো যে দিলখোলা ধনীর দুলাল সান্তিয়াগো নাসারই হচ্ছে ভিকারিও যমজদের ঘোষণা-করা বলি, আর এও সবাই জেনে গিয়েছিলো কেন তারা তাকে মারতে চায়। অথচ সাতাশ বছর পরে, গল্পের 'আমি' অর্থাৎ উত্তম পুরুষ, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, সাংবাদিক, যখন কালপঞ্জিটা সাজাবার চেষ্টা করছে, সাক্ষীরা কেউ বলতে পারেনি কেন তারা কেউ সান্তিয়াগো নাসারকে হুঁশিয়ার ক'রে দেয়নি—অথচ কেউ জানতেও চায়নি সত্যি আদৌ তার কোনো দোষ আছে কি না।

বাইয়ার্দো সান্ রোমান গ্রামে নবাগত বটে, তবে গোড়া থেকেই সে গ্রামে সকলের আলোচনার লক্ষ্য ছিলো। সে-যে খুব ধনী তা-ই নয়, তার বাবা রক্ষণশীল-দের এক জেনারেল, 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'য় এই জেনারেলই হুকুম দিয়েছিলো কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কোম্পানিয়েরো ও বন্ধু হেরিনেল্‌দো মার্কেসকে পেছন থেকে গুলি ক'রে মারতে—মাকোন্দোর আশপাশে সবাই সে-কথা জানে। বিয়ের আগে বাইয়ার্দো সান্ রোমানের মা আর বোন এমন ফ্যাশান ক'রে সেজে এসেছিলো যে গাঁয়ে সেটা বেজায় ছাপ ফেলে গিয়েছিলো। বাইয়ার্দো সান্ রোমান গাঁয়ে এসেছিলো আগস্ট মাসে, আর ছ-মাস পরেই এই বিয়ের হুল্লোড়। গল্পের 'আমি'কে তার মা আগস্টের শেষেই চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন: 'ভারি একটা অদ্ভুত লোক এসেছে গ্রামে।' 'অদ্ভুত লোকটার নাম বাইয়ার্দো সান্ রোমান, সবাই বলছে সে নাকি মুগ্ধ করার মতো মানুষ, তবে আমি তাকে এখনও চোখে দেখিনি।' বাইয়ার্দো লোকটা যে অদ্ভুত, সেটা অবশ্য কনেও ভেবেছিলো। আন্‌হেলাকে সে স্রেফ-একবার দূর থেকে চোখে দেখেই বিয়ে করবে ব'লে ঠিক করেছিলো—আন্‌হেলা তখন স্কোয়ার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো। একে ঠিক দেখা হওয়াও

বলে না। সেপ্টেম্বরের শেষে একদিন বেলা দুটো নাগাদ আরামকেদারায় হেলান দিয়ে ব'সে বাইয়ার্দো যখন ঢুলছিলো, আনৃহেলা ভিকারিও তখন তার মায়ের সঙ্গে দু-দুটি র ঙ ন ছাতা নিয়ে স্কোয়ারটা পেরিয়ে যাচ্ছিলো। বাইয়ার্দো সান্ রোমান সত্ত জেগেছে তার তন্দ্রা থেকে, তাকিয়ে দেখেছে কালো পোশাক-পরা ঐ দুজনকে —মা ও মেয়েকে, বাড়িউলিকে জিগেশ করেছে তরুণীটি কে। বাড়িউলি জানিয়েছিলো তার নাম আনৃহেলা ভিকারিও, সঙ্গের ঐ মহিলার সে ছোটো মেয়ে, আর বাইয়ার্দো সান্ রোমান দৃষ্টি দিয়ে তাদের অনুসরণ করেছিলো স্কোয়ারের অন্ত প্রান্ত অব্দি। 'নামটা খুব মানিয়েছে মেয়েটিকে,' সে মন্তব্য করেছিলো। তারপর আবার দোলকেদারার গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে সে চোখ বুজেছিলো। বলেছিলো, 'জেগে উঠলে আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো যে আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।' আনৃহেলার প্রেমে পড়ার চেষ্টা করেনি সে, তাকে তার প্রেমে পড়াবারও না, শুধু তার বাড়ির লোকদের সে মোহিত ক'রে ফেলেছিলো। সে নিজে যদি তাদের মুগ্ধ করতে নাও পারতো, তার টাকা পারতো নিশ্চয়ই—কেননা টাকার তার কোনো অভাব ছিলো না। যাকে সে ভালোবাসে না তাকে বিয়ে করা ছাড়াও আরেকটা ভুল করেছিলো আনৃহেলা—সে কোনোকিছুর তোয়াক্কা না-ক'রে শাদা ওড়নায় তার মুখ ঢেকে রেখেছিলো আর হাতে নিয়েছিলো কমলার মুকুল—যার মানে হ'লো সে বলতে চাচ্ছে যে সে নাকি কুমারী, অক্ষতযোনি।

কাকে বলে নীতি আর ইজ্জৎবোধ, তা এই ছোট্ট বদ্ধ গ্রামসমাজকে কীভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে সাপের মতো পেঁচিয়ে শ্বাস রোধ ক'রে দিয়েছিলো, 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' তারই একটি চমকপ্রদ প্রতিরূপ, যেখানে নানান গোপন চক্রান্ত, গুজব, কানাকানি, পরচর্চা আর দমআটকানো পরিবেশ সব হুল্লোড়ের আড়ালে হিংসাহিংস্রতায় থমথম করছিলো, আর নিষ্পাপ ও সরলতা ধরেছিলো অপ্রত্যাশিত যত কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি। ঘটনাটা ঘ'টে যাবার সাতাশ বছর পর একটু-একটু ক'রে খুঁটিনাটিগুলো জড়ো ক'রে 'গল্পের আমি' অর্থাৎ উত্তম পুরুষ অর্থাৎ কথক বুঝতে চাচ্ছিলো, অত লোকে জানতো সান্তিয়াগো নাসারকে খুন করা হবে, অথচ কেউ তাকে খবরটা দিয়ে সাবধান ক'রে দেয়নি কেন।

উপন্যাসের সূচনা / হত্যার আগে

ওরা যেদিন তাকে মারবে, সান্তিয়াগো নাসার সেদিন ভোর সাড়ে-পাঁচটায় ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলো, বিশপ যে-নৌকোয় ক'রে আসবেন, তার জন্যে

অপেক্ষা করবে ব'লে। সে স্বপ্ন দেখেছিলো যে সে এক সেডার গাছের বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে হালকা, মিহি, কিন্তু ঘুম ভাঙতেই তার মনে হ'লো তার সারা গায়ে যেন পাখির গু মাখামাখি হ'য়ে গেছে। 'ও সবসময়েই গাছপালার স্বপ্ন দেখতো,' প্লাসিদা লিনেরো, তার মা, সেই বিশ্রী সোমবারটার খুঁটিনাটি মনে করার সময় সাতাশ বছর পরে আমাকে বলেছিলেন। 'আগের হপ্তায় ও স্বপ্ন দেখেছিলো ও যেন একটা রাংতার উড়োজাহাজে ব'সে আছে, একা, আখরোট বনের মধ্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ও, অথচ কোনো গাছের গায়ে একবারও ধাক্কা লাগছে না,' তিনি আমাকে বলেছিলেন। অন্য লোকের স্বপ্নের সঠিক মানে ক'রে দিতে পারেন ব'লে তাঁর মস্ত খ্যাতি ছিলো, অবশ্য যদি কিছু খাবার আগে তাঁকে স্বপ্নের কথা বলা হয়। কিন্তু ছেলের এই দুটো স্বপ্নের মধ্যে কোনো ভয়ংকর অমঙ্গলের লক্ষণই তিনি ভাবেননি—অথবা মৃত্যুর আগে আরো যে-সব স্বপ্নের কথা সে তাঁকে বলেছিলো, তাতেও নয়।

সান্তিয়াগো নাসার নিজেও অলক্ষণটা বুঝতে পারেনি। সে-রাতে সে খুব কমই ঘুমিয়েছিলো, ঘুমটাও ভালো হয়নি, জামাকাপড় না-ছেড়েই সে শুয়ে পড়েছিলো বিছানায়, ঘুম থেকে উঠেছিলো মাথা-ব্যথা নিয়ে, আর জিভের ওপর যেন ছড়িয়ে ছিলো একরাশ তামার গুঁড়ো, আর তাকে সে ব্যাখ্যা করেছিলো বিয়ের হুল্লোড়ের স্বাভাবিক বিপত্তি ব'লে, আর হুল্লোড় তো চলেছিলো মাঝরাত গড়িয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ। তারপর ছ-টা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় বাড়ি থেকে বেরুবার পর থেকে শুরু ক'রে একঘণ্টা পরে শুওরের মতো কেটে-যাওয়া অব্দি যত লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলো, সকলেরই তাকে দেখে মনে হয়েছিলো একটু ঘুম-ঘুম ভাব ছিলো তার মধ্যে, তবে তার মেজাজ খুব ভালো ছিলো, আর তাদের সকলেরই কাছে সে হালকাভাবে মন্তব্য করেছিলো যে দিনটা ভারি সুন্দর। কেউ ঠিক বোঝেনি যে সে আবহাওয়া সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছে কি না। কারণ অনেকেই পরে মনে ক'রে বলেছিলো যে সকালটা ছিলো ঝকঝকে, কলাবাগানের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের মৃদু হাওয়া ভেসে আসছিলো, তখনকার চমৎকার একটা ফেব্রুয়ারির সকালে সেটা প্রত্যাশিতই ছিলো। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই এ-বিষয়ে একমত ছিলো যে আবহাওয়া ছিলো মৃত্যুর মতো, আকাশ ছিলো ঘোলা, নিচু, আর নিস্তল জলের কেমন-একটা ভারি ঝিম-ধরা গন্ধ ছিলো

হাওয়ায়, আর সান্তিয়াগো নাসার তার ঘরে যে-হালকা মিহি বৃষ্টি দেখেছিলো, অঘটনটার সময় ঠিক তেমনি বৃষ্টি পড়ছিলো। আমি তখন বিয়ের হুল্লোড় থেকে কোনোমতে সেরে উঠেছিলুম মারিয়া আলেহান্দ্রিনা সের্ভান্তেসের ভাগবৎ কোলে, আমি শুধু জেগে উঠেছিলুম পাগলা ঘন্টির ঝনঝনা শুনে, ভেবেছিলুম ঘন্টাগুলো অমনিভাবে বাজানো হচ্ছে বুঝি বিশপেরই সম্মানে।...

উপন্যাসের সমাপ্তি / হত্যার পরে

শোবার ঘরে তাকে খুঁজে, চেঁচিয়ে ডেকে, প্লাসিদা লিনেরো গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্কোয়ারের দিকটার জানলায়—তাঁর কানে পৌঁছুচ্ছিলো অত-সব হাঁকডাক, কিন্তু তার নয়—কোত্থেকে আসছে তাও জানা নেই—আর জানলা থেকে দেখেছিলেন ভিকারিও যমজেরা চার্চের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের তাড়া ক'রে হন্যে হ'য়ে ছুটেছে আমিল শাইয়ুম, তার আওয়াজ-মারা বন্দুক হাতে, সঙ্গে আরো-কিছু নিরস্ত্র আরব, আর প্লাসিদা লিনেরো ভেবেছিলেন বিপদটা বুঝি কেটেই গেছে। তারপর তিনি শোবার ঘরের অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আর তখনই দেখতে পেয়েছিলেন সান্তিয়াগো নাসারকে, দরজার সামনে, ধুলোর মধ্যে হুমড়ি খেয়ে-পড়া, নিজের রক্তের ধারার মধ্য থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। উঠে দাঁড়িয়েছিলো সে, একপাশে একটু হেলে-যাওয়া, টলছে, আর যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরের মধ্য দিয়ে চলেছে এমনিভাবে সে হাঁটতে শুরু করেছিলো, তার হাতে ধ'রে রেখেছিলো পেট ফেঁসে বেরিয়ে-আসা ঝুলে-পড়া নাড়িভুঁড়ি।

একশো গজেরও বেশি হেঁটেছিলো সে, বাড়িটার চারপাশে ঘুরেছিলো পুরো, আর ভেতরে এসেছিলো রান্নাঘরের দরজা দিয়ে। রাস্তা দিয়ে হাঁটা চলবে না, সেটাই দূরপথ, একটা প্রাঞ্জলতা তার ছিলো তখনও, সে ভেতরে এসেছিলো পাশের বাড়ির মধ্য দিয়ে। পোন্সো লানাও, তার স্ত্রী আর তাদের পাঁচ ছেলেমেয়ে তখনও জানে না তাদের বাড়ির দরজার কুড়ি পা দূরে এইমাত্র কী ঘ'টে গিয়েছে। 'চীৎকার চ্যাচামেচি আমরাও শুনেছি,' লানাও-র স্ত্রী বলেছিলো আমায়, 'কিন্তু আমরা ভেবেছিলুম ও-সব বুঝি বিশপের উৎসবেরই অঙ্গ।' তারা সবে তখন ছোটোহাজরিতে বসেছে, এমন সময় দেখতে পেলে সান্তিয়াগো নাসার ঢুকলো, রক্তে মাখামাখি, দু-হাতে ধ'রে আছে তার পেটের নাড়িভুঁড়ি। পোন্সো লানাও আমায় বলেছিলো, 'যেটা আমি কক্ষনো ভুলবো না সেটা ঐ জঘন্য গুয়ের গন্ধ।' কিন্তু আর্হেনিদা লানাও,

বড়ো মেয়ে, বলেছিলো, সান্তিয়াগো নাসার হাঁটছিলো তার স্বাভাবিক আভিজাত্যের সঙ্গে, মেপে-মেপে পা ফেলছিলো, আর তার সারাসান মুখ আর কোঁকড়া চুলের রাশ আগের চেয়েও আরো সুন্দর দেখাচ্ছিলো। টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসেছিলো সে, তারপর শোবার ঘরের মধ্য দিয়ে পেছনের দরজায় চ'লে গিয়েছিলো। 'আমরা ভয়ে হিম হয়ে গিয়েছিলাম,' আরহেনিদা লানাও বলেছিলো আমাকে। আমার পিশি ভেনেফ্রিদা মার্কেস তাঁর উঠোনে, নদীর ওপারে, একটা স্নাড মাছের আঁশ ছাড়াচ্ছিলো, সেখান থেকে দেখেছিলো সান্তিয়াগো পুরোনো জেটিটার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে, দৃঢ় পায়ে খুঁজছে তার বাড়ি যাবার রাস্তা।

'সান্তিয়াগো, বাছা,' পিশি চেঁচিয়ে বলেছিলো, 'তোর হয়েছে কী?'

'ওরা আমাকে মেরে ফেলেছে, ভেনে-পিশি,' সে বলেছিলো।

সিঁড়ির শেষ ধাপে সে টাল খেলে, কিন্তু তক্ষুনি উঠে পড়লো। 'তার তখনও এতটা হুঁশ ছিলো যে নাড়িভুঁড়ি থেকে সে ধুলোবালি ঝাড়ছিলো,' ভেনে-পিশি বলেছিলো আমাকে। তারপর সে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছিলো তার বাড়িতে—সকাল ছ-টা থেকে দরজাটা খোলাই ছিলো, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো রান্নাঘরের মেঝেয়।

...

এই দুই অংশের মাঝখানে ছড়িয়ে আছে ১২০ পাতা জোড়া সেই রচনাভঙ্গি যাতে বাস্তব আর কুহক পরস্পরের সঙ্গে মাখামাখি ক'রে আছে, যেখানে প্রতিদিনকার বাস্তবের মাঝখানে ঢুকে পড়েছে আশ্চর্য আর পরাবাস্তব, আর ফুটিয়ে তুলেছে লাতিন আমেরিকার কড়চার জগৎকে—একদিকে আন্দেযাসের উত্তুঙ্গ শিখর আর অন্যদিকে ক্যারিবিয়নের চঞ্চল দুরন্ত জল, এর মাঝখানে বন্দী এক পরিবর্তনবিমুখ দেশ ও কাল। গার্সিয়া মার্কেস একবার বলেছিলেন: 'এ-কথা আমি চিরকাল ব'লে এসেছি যে কুহকী বাস্তবতা হ'লো বাস্তবের দিকে সরল চোখে তাকানো—সোজাসুজি তাকানো—সরল আর নিষ্পাপ চোখে - আগে থেকেই কোনো দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণা তৈরি ক'রে তাকানো নয়।' ব্যাখ্যা ক'রে আরো জানিয়েছিলেন (কথাগুলো এই বইয়ের পটভূমি বুঝতে সাহায্য করবে নিশ্চয়ই):

আমার সব বইয়েরই প্রধানভূমি বাস্তব—আমি শুধু পাঠককে একটি আ ত শ কা চ দিই, যাতে তারা বাস্তবকে আরো ভালো ক'রে বুঝতে পারে।...

তাছাড়া, লাতিন আমেরিকার পুরো পরিবেশটাই অলৌকিকে আক্রান্ত—বিশেষ ক'রে ক্যারিবিয়ন অঞ্চল। আমি এসেছি ক্যারিবিয়ন অঞ্চল থেকে, সে-জায়গাটা যেন বাস্তবের পরপারেই দাঁড়িয়ে আছে। আন্দেয়ান অঞ্চল থেকে এ-জায়গাটা একেবারেই আলাদা। কোলোম্বিয়ার ইতিহাসে যাকে বলে ঔপনিবেশিক কাল, সেই সময় যারা নিজেদের বাস্তগণ্য ও সম্রান্ত ব'লে ভাবতো, তারা সবাই দেশের ভেতরে চ'লে গিয়েছিলো, বোগোতায়,—উপকূলে যারা পড়েছিলো তারা সব একেকজন ডাকাত, ভালো অর্থে ডাকাত, আর ছিলো যারা নাচগান জানতো, হৈ-হুল্লোড় ভালোবাসতো, যারা অ্যাডভেনচারের খোঁজে বেরিয়েছে। উপকূলের লোকেরা সবাই বোম্বেটে জলদস্যু আর স্মাগলারদের বংশধর—আর সেই সঙ্গে ছিলো ক্রীতদাসদের সংস্কৃতি, আফ্রিকা-থেকে-আনা-কালো-লোকদের মিশোল। এমন পরিবেশে বড়ো হ'য়ে-ওঠা মানেই সাত রাজার ধন হাতে-পাওয়া, কবিতার ঐশ্বর্য হাতে-পাওয়া। তাছাড়া, ক্যারিবিয়নে আমরা সবকিছুই বিশ্বাস করতে পারি, কেননা একদিকে ছিলো অতগুলো সংস্কৃতির প্রভাব, অন্যদিকে তার সঙ্গে মিশেছিলো রোমান ক্যাথলিক আচারব্যবহার রীতিনীতি ও আঞ্চলিক কিছু ধ্যানধারণা কিংবদন্তি। এই পরিবেশ আপাত-বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে তাকাবার মতো খোলা মন খোলা চোখ দেয় ব'লেই আমার বিশ্বাস।

...

'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি,' এক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে, "সরলা এরেন্দিরা"র মতোই ফাঁদে-পড়া লোকের কাহিনী। সান্তিয়াগো নাসার জানে না যে তাকে মারা হবে, এরেন্দিরা জানে না কেন অত লোকের সঙ্গে শুয়ে-শুয়ে ঠাকুমার টাকা শোধ করতে হবে, কেন তাকে পণ্যের মতো ব্যবহার করবে কেউ, সান্তিয়াগো নাসারকে যে মারা হবে সেটা গাঁ শুদ্ধ লোক জানে। কারা খুন করবে, তাও জানে। কেন খুন করবে, তাও জানে। তাদের ধারণা, সান্তিয়াগো নাসারই ভিকারিওদের বোন আনহেলিতার কৌমার্য হরণ করেছে। সান্তিয়াগো সত্যি-সত্যি তা করেছে কিনা, সে-প্রশ্নটাই অবান্তর। কিন্তু সবাই সবকিছু জানা সত্ত্বেও একজনও গিয়ে তাকে সাবধান ক'রে দেয়নি কেন, এ-প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। কেউ কেন তাকে গিয়ে বললো না যে পাবলো আর পেদ্রো ভিকারিও সশস্ত্র হ'য়ে তার জন্যে ওৎ পেতে আছে রাস্তার মোড়ে? কোনো স্পষ্ট উত্তর দেয়া নেই উপন্যাসে, যদি-না প্রচ্ছন্ন থাকে উত্তরটা প্রতি পাতাতেই। ঘটনাটা ঘ'টে যাবার এত বছর

পরেও সময়ের পরম্পরাকে সাজাতে গিয়ে কেমন যেন খটকা থেকেই যায়, সবটাই ধাঁধার মতো মনে হয়। কিন্তু কতগুলো ছোটোখাটো খুঁটিনাটি আস্তে-আস্তে মিলে-মিশে তৈরি ক'রে দেয় পরিবেশ, মানসিক আবহাওয়া, সমস্ত সমাজটাকে : আমরা আবিষ্কার করি সান্তিয়াগো নাসার ইব্রাহিম নাসারের ছেলে—ইব্রাহিম ছিলো আরব। আরবদের সঙ্গে চাপা একটা বিরোধ থেকেই গেছে অনেকদিন ধ'রে : যারা ইস্পানি রক্ত বা কোন্‌কিস্তাদোরদের রক্তের বড়াই করে, তারা কখনও পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি আরব অভিবাসীদের, তাদের চোখ টাটায় আরবদের সমৃদ্ধি দেখে। আবার বাড়ির রাঁধুনি ভিক্তোরিয়া গুসমান হত্যার পরিকল্পনাটার কথা জেনেও তাকে বলে না কিছুই—কেননা সে জানে, ইব্রাহিম নাসার তাকে ধর্ষণ করেছিলো, সান্তিয়াগো নাসারও ভিক্তোরিয়ার মেয়ের শরীরের যেখানে-সেখানে হাত দেয়, ভিক্তোরিয়া জানে তার মেয়েও এই বড়োলোক ছেলেটির কাছেই ধর্ষিত হবে একদিন। আস্তে-আস্তে এইভাবে আমরা টের পেতে থাকি এই ছোট্ট গ্রামটার মধ্যকার বর্ণবৈষম্যকে, শ্রেণীসংঘাতকে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যকার টানাপোড়েনগুলোকে, আড়ালে লুকোনো, কিন্তু তবু এর জের হয় মারাত্মক। সবাই ধ'রে নিয়েছে মেয়েদের পরম সম্পদ তাদের অক্ষত যোনি, কৌমার্য—সেটাই ইজ্জৎ আর ভেদ্‌রেখার পরিকল্প তৈরি ক'রে দেয়—আবার এটাও সবাই জানে যে-কোনো পুরুষই যে-কোনো মেয়েকে জোর ক'রে ভোগ করতে পারে। আর এটা এমন-একটা গ্রাম যেখানে কিছুই চাপা থাকে না—এমনকী কেউ বাড়ি থেকে না-বেরুলেও মুহূর্তে সাতসকালেই জেনে যায় কে কাকে ছোটোহাজরিতে নেমন্তন্ন করেছে। কিছুই চাপা থাকে না—কিন্তু সান্তিয়াগো নাসারকে যে খুন করা হবে, সেটা ঘুণাক্ষরেও কেউ তাকে জানায় না। যখন সে জানতে পায় ততক্ষণে পেদ্রো আর পাবলো তার পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সান্তিয়াগো নাসারের এই হত্যাকাহিনী তো শুধু একজন ব্যক্তিবিশেষের খুন হবার গল্প নয়—একটা পুরো জনপদকে কাঠগড়ায় চাপাবার বৃত্তান্ত—তার মিথ্যা ইজ্জতের ধারণা আর ছদ্মমর্যাদার তাড়না নিয়ে যে-পুরো শহরের লোক জেনেশুনেও সান্তিয়াগো নাসারকে ঘুণাক্ষরেও জানালো না যে আজ সকালে তাকে খুন করা হবে। কাহিনীর মধ্যে ওতপ্রোত জড়ানো মাচিস্‌মো, যা থেকে একদিন কোলোম্বিয়ায় জন্ম হয়েছিলো লা ভিও-লেন্সিয়ার—হিংসাহিংস্রতার। মাচিস্‌মো মানে কেবল মেয়েদের ওপর পুরুষের দখল নয়, পুরুষের প্রতি পুরুষের অত্যাচার, মেয়েদের প্রতি মেয়েদের ব্যবহারও পিতৃতান্ত্রিকতার এই জলজ্যান্ত চিহ্ন ও ধারক। সেই জন্যেই এই কালপঞ্জিতে

আষ্টেপৃষ্ঠে মিশে আছে সেই লোকদেরই ব্যাখ্যাধারণা ও বিশ্বাস যারা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে গেলো সকলের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে কেমন ক'রে একজনের পেট ফাঁসিয়ে দিলো দুটি যুবক, যারা কয়েক ঘণ্টা আগেই বলির সঙ্গে ব'সে হুল্লোড় করেছে বিয়েবাড়িতে। হয়তো খুনীরাও দোষী নয়, যেমন আমরা জানি না (সান্তিয়াগোর সঙ্গে আন্‌হেলিতার যৌন সম্পর্ক ঘ'টে থাকলেই বা কী এসে যায়) বলির সত্যি কোনো দোষ ছিলো কি না—আসল দোষী এই অচলায়তন, এই সমাজ। অছিলা যা-ই হোক না কেন, ইজ্জৎ বা অন্য যা-খুশি, এই সমাজে রক্তারক্তি ছাড়া আর-কিছু ঘটতেই পারতো না। আর এটাই আমরা দেখতে পাবো 'সরলা এরেন্দিরা' বইয়ের প্রায় সব গল্পেই।

. . .

বন্দী, জেগে আছো ?

'সরলা এরেন্দিরা'র সঙ্গীসাথী শত্রুমিত্র সবাই বন্দী। যেমন "সরলা এরেন্দিরা" গল্পেই, ঠাকুমা বন্দী তাঁর ক্যারিবিয়নের জীবনের স্মৃতির কাফনে, আবোতত্রার বন্দীদশা উগ্র হয়ে বেরোয় যখন বিকারের ঘোরে হারানো দিনগুলো কয়েকটা ঘটনায় কয়েকটা মুহূর্তে তাঁকে বারে-বারে আছড়ায়, আর এরেন্দিরা বন্দী জগৎ সম্পর্কে তার আতঙ্কে—সে তার ঠাকুমার বন্দী, লোকের যৌনলালসার শিকার, চার্চের লোকেরা উদ্ধারের অছিলায় তাকে যখন ক্রীতদাসের মতো খাটায় তখনও তার বন্দিত্ব কাটে না—কেননা চার্চ তাকে একই পিতৃতান্ত্রিকতার নিগড়ে বেঁধে রেখেছে—ঠাকুমার কাছ থেকে বেরিয়ে গিয়ে চার্চে পড়া, এ যেন ফুটন্ত তেলের কড়া থেকে জ্বলন্ত তাওয়ায় এক আছাড়। এস্পানিয়ার চার্চের ভূমিকা—যখনকার কথা গার্সিয়া মার্কেস লিখছেন তখনও লিবারেশন থিওলজির নামগন্ধও ছিলো না লাতিন আমেরিকায়—প্রায় ত্রাসজনক ছিলো লাতিন আমেরিকায়, সবসময়েই তারা স্বৈরাচারী একনায়কদের সঙ্গে বা সামরিক হুন্তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে—সমাজসংস্কারের নাম ক'রে চাপিয়ে দিয়েছে নানারকম বজ্র আঁটুনি এবং তার গেরোগুলো মোটেই ফস্কা ছিলো না। যেমন "সরলা এরেন্দিরা"র যখন চার্চের লোক ইন্ডিয়ান পুয়েব্‌লোগুলোয় গিয়ে গর্ভবতী সব উপপত্নীদের ধ'রে-ধ'রে বৈধ বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছিলো, উপপত্নীরা প্রথমে সে-প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি জানায়। স্বামীরা সবাই অলস, সারাক্ষণ হাত-ঠ্যাং ছড়িয়ে দোলখাটিয়ায় ঘুম লাগায়, কাজেকর্মে অষ্টরম্ভা; বাচিস্‌নোর এই অতিপরবশদের মধ্যে বিয়ে ব্যাপারটা তাই পুণ্যের পথ সুগম করলেও এই মর্ত্যের রাজত্বে মেয়েদের অবস্থা আরো কাহিল ক'রে

পড়ে—ধর্মপত্নীর ওপর স্বামীর অত্যাচারের ফরমান পেয়ে যায় মরদরা, শত অত্যাচারেও তখন বিয়ে-করা বৌ ব'লে তারা কোনো মৃদু আপত্তিও করতে পারে না, বরং আরো হাড়ভাঙা খাটুনিতে ইহকালটা বরবাদ হ'য়ে যায়। উপপত্নীদের ওপর অন্তত অতটা অত্যাচার চালানো যায় না, এ তো আর রোমান ক্যাথলিক বিয়ে নয় যে *till death do us part* ব'লে ফাঁদে প'ড়ে ছটফট করতে হবে, বেশি ট্যাঁ ফোঁ করলে সম্পর্ক ভেঙে দিতেই পারে কোনো উপপত্নী। চার্চ অবশ্য তাদের মন ভোলাবার জন্যে ঝকঝকে কাচের ফুল, পুঁতির মালা, সস্তা কাপড় এ-সব দিয়ে ছলেকৌশলে তাদের চার্চের আওতায় আনছিলো। কার না মনে প'ড়ে যাবে ইওরোপের অনাহূত অতিথিরা যখন দরজা ভেঙে জোর ক'রে নূতন জগতে ঢুকে পড়েছিলো তখন খুনজখম লুঠপাট রাহাজানি ছাড়াও কী-রকম সস্তা গয়নাগাটি দিয়ে মন ভুলিয়েছিলো ইন্ডিয়ানদের। বোঝাই যায় যে সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাবসার ধরন আর চার্চের আধ্যাত্মিক ব্যাবসার ধরনে কোনো-একটা তফাৎ ছিলো না—এ তো সাম্রাজ্যবাদীদের চার্চ, না কী!

"বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো" যখন ডানা থুবড়ে পড়েছিলো অজানা-অচেনা বিভুঁ'য়ে সে তো চাক্ষুষ স্পর্শসহ খাঁচাতেই বন্দী ছিলো। "অলৌকিকের ফিরিওলা সাধু ব্লাকামান" যদি-বা স্কিৎসোফ্রেনিয়ার শিকার না-হয়, অথবা ডোপেল-গ্যাঙ্গার বা ডাব্‌ল-এর (দ্বৈত সত্তার) গল্প না-হয়, তাহ'লে সাধু ও অসাধু ব্লাকামান পরস্পরের সঙ্গে শিকার ও শিকারীর অনড় সম্পর্কে বন্দী—ভূমিকা পালটে যায়, এক-বার এ বন্দী হয় তো আরেকবার ও, আর শেষ অব্দি আমরা তো জানি সাধু ব্লাকামান যতদিন বেঁচে থাকবে অসাধু ব্লাকামান তার কফিনে বন্দী হ'য়ে গড়াগড়ি যাবে অবিরাম,'অর্থাৎ অনন্তকাল'। "ভুতুড়ে জাহাজের শেষ পাড়ি"তে জাহাজ তীরে আছড়ে পড়ার মুহূর্তটাই বিস্ফারিত হ'য়ে গিয়ে প্রতিশোধে-উৎসুক তরুণকে সেই ভয়ংকর মুহূর্তেই সবসময় আটকে রাখে—আটকে রাখে একটাই নাছোড় বাক্যে, যার বিস্তারের মধ্য থেকে তার আর রেহাই নেই। "জগতের সবচেয়ে-সুন্দর জলেডোবা পুরুষ" তার মৃত্যুর মধ্যে আটক প'ড়ে থাকে—আর সেখানে সে হ'য়ে ওঠে এস্তেবান—তা না-হ'য়ে তার কোনো উপায় নেই আর, কারণ সে তো ম'রেই গিয়েছে, সে প্রতিবাদ করবে কী ক'রে। "মৃত্যুই ধ্রুব প্রণয়ের পরপারে" গল্পে রাজনৈতিক ছুঁচিবি সেনাদোর ওনেসিমো সান্‌চেস তার ছ-মাস এগারো দিনের বেরাটোপে বন্দী, সবেমাত্র সে পা দিয়েছে বিয়াল্লিশে, কিন্তু চিকিৎসকদের রায় বেরিয়ে গিয়েছে, আর মাত্র ছ-মাস এগারো দিন, আর এই ধ্রুব সত্যটির ধারণায় ফাঁদে-পড়া অন্তর

মতো ছটফট করে নিঃসঙ্গ ওনেসিমো সান্‌চেস, সতীত্বের বর্ম পরা (চেস্টিটি বেল্ট পরেছে সে) সন্তা কারিনার আলিঙ্গনও তাকে বাঁচাতে পারে না—প্রণয় আর মৃত্যুর অসম যুদ্ধে প্রণয় হেরে যায়। "হারানো সময়ের সমুদ্র"তে সমুদ্রের ধারের ঐ ঊষর বন্ধ্যা পুয়েব্‌লোতে অর্থ ও খাদ্যাভাবে আটকে আছে যারা শহর ছেড়ে চ'লে যায়নি তারা সবাই, সবাই অপেক্ষা করছে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর—যেখানে রুক্ষ পাথুরে মাটিতে ফুলপাতা দিয়ে তাদের কবর দেয়া হবে না—বরং ম'রে যাবার পর ছুঁড়ে ফেলা হবে সমুদ্রে। গোলাপের গন্ধ সত্যি কি মিথ্যে কেউ জানে না, কিন্তু সেই ঊষর ধু-ধু উদ্ভিদবিহীন শূন্যতায় গোলাপের গন্ধ ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নই হোক অথবা কোনো অবাস্তব কুহকই হোক, তার গুজব ছড়িয়ে পড়বামাত্র এসে হাজির গ্রিঙ্গো মিস্টার হার্বার্ট, মার্কিন ধনকুবের, তার এত টাকা যে তার কখনও মৃত্যু হবে না, আর মার্কিন অনুদান বা *aid* সম্বন্ধে ছোটোখাটো একটা সন্দর্ভই হ'য়ে ওঠে গল্পটা তারপর, ('একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'য় জন ব্রাউনের আবির্ভাবের পর তাৎক্ষণিক সমৃদ্ধি ও তারপর কলাবাগানের ধর্মঘটের পর মাকোন্দোর যা-দশার একটা ইঙ্গিত এই গল্পেও), সবাইকে টাকাকড়ি দিয়ে সে খুশি ক'রে দিতে চায়, তবে একটাই শর্ত—যে যা পারে সবাইকে তা অন্তত সুষ্ঠু সুঠাম সম্পন্ন করতে হবে, আর তার কাছ থেকে টাকা নিতে গিয়ে ফতুরই শুধু হয় না বুড়ো হাকোব, সে হারিয়ে ফ্যালে তার বাড়িঘর, অন্যরা তাদের জমিজমা : *aid* দিতে এসে, টাকা ছড়াতে গিয়ে, আস্ত শহরটারই মালিক হ'য়ে ওঠে মিস্টার হার্বার্ট—এমনকী ফ্যানটাসিরও। এখন আর গোলাপের গন্ধ পাবে না তোবিয়াস, তার সংস্কৃতি এখন অপহৃত, মার্কিন দূরদর্শনের কৌটোভর্তি স্বপ্নই সে দেখবে এখন, যখন তাকে মিস্টার হার্বার্ট নিয়ে গেলো সাত সমুদ্রের তলায় এক আশ্চর্য সফরে, এখন গোলাপের বদলে তোবিয়াস সারাক্ষণ অন্যকথা ভাবে, এমনকী তার স্ত্রী ক্লোতিল্‌দের সঙ্গে প্রেম করার সময়ও তার মন প'ড়ে থাকে এই নতুন ফ্যানটাসিতে, আর প্রেম করার সময় সব কেমন জট পাকিয়ে যায়, আমোদ হয় না।

'গাধার মতো ভান করছো তুমি,' ঠোঁট ফুলিয়ে বললে ক্লোতিল্‌দে। 'অন্যকিছু ভাবার চেষ্টা করো।'

'আমি অন্যকিছুর কথাই ভাবছি।'

ক্লোতিল্‌দে জানতে চাইলো সেই অন্যকিছুটা কী, আর তোবিয়াস ঠিক করলে তাকে সে বলবে, তবে একটা শর্তে—সে আর-কাউকে সে-কথা বলবে না। ক্লোতিল্‌দে কথা দিলে। 'সমুদ্রের তলায় না একটা গ্রাম আছে—ছোটো-ছোটো সাদা-সাদা বাড়ি, অলিন্দে-পাতিলে লক্ষ-লক্ষ ফুল।'

জোভিনাম দু-হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরলো।

'ওহ্, জোভিনাম,' সে যেন আর্তনাদ ক'রেই উঠলো, 'ওহ্, জোভিনাম, ভগবানের দোহাই আমার ঐ গণ্ডগোল পাকিয়ে বোসো না।'

মার্কিন সাম্রাজ্যের আশপাশে বন্দী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর এটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয় যে কমরাজ্যের খপ্পরে বুঁদ হ'য়ে দু-হাত পেতে ধন নিতে-নিতে শেষটায় আমরা কীভাবে আবিষ্কার করি যে এই সাম্রাজ্যের খেসারৎ দিতে দিতে আমাদের স্থাবর-অস্থাবর যা ছিলো সব তো গেছেই, সেই সঙ্গে গেছে ধর্ম ও সংস্কৃতি—আগে যতটা খারাপ অবস্থায় ছিলাম তার চেয়েও অনেক নিচে নেমে এসেছি, একেবারে অধঃপাতের শেষ ধাপে। গোলাপের গন্ধ আর-কখনও জোভিনামের দিনরাতকে সুরভিত ক'রে রাখবে না—সারা রাত ধ'রে আরো বিশ্রী-ভাবে কাঁকড়ার সঙ্গে লড়াই ক'রে কাটাতে হবে এখন। বন্দীশালা ক্রমেই আঁটো ক'রে চেপে ধরে আমাদের, চোখ থেকে ঘুম ছুটে যায়, বন্দী জেগেই থাকে, কিন্তু জেলখানায় বিবর্ণ জাগরণেই বা তার কী লাভ?

. . .

এ-গল্পে সে-গল্পে মাখামাখি

"সরলা এরেন্দিরা আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী" সাতটি গল্পের একটি সংকলন। কিন্তু সত্যি কি তাই? সবগুলো গল্প মিলেই কি একটা গল্প হ'তে পারে না? না-হ'লে কেন এ-গল্পের খুঁটিনাটি ঢুকে পড়ে অন্য গল্পে, এ-গল্পে যা উল্লেখ মাত্র অন্য গল্পে তা বিশদ হয়? "এরেন্দিরা" নামে যখন চলচ্চিত্র প্রযোজিত হয়েছিলো ১৯৮৪-তে, তখন তার চিত্রনাট্যে গার্সিয়া মার্কেস "মৃত্যুই ধ্রুব প্রণয়ের পরপারে" গল্পটি পুরোপুরি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। "বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো" যখন চলচ্চিত্রে রূপায়িত হ'লো তখন অন্য-আরো গল্পের চরিত্র এসে হানা দিয়েছিলো তাতে, মেলা ব'সে গিয়েছিলো খোলামেলায়, কত ভিড়, কত লোক, কত ঘটনা। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুটো আলাদা মাধ্যম, সুতরাং চলচ্চিত্রের ভিত্তিতে সাহিত্যের আলোচনা সংগত হবে না—কেউ-কেউ হয়তো বলতে চাইবেন। কিন্তু এমন-কোনো নাছোড় পাঠকও থাকতে পারেন যিনি এইসব গল্পের খুঁটিনাটি ঠিক আলাদাভাবে দেখতে চাইবেন না। একে নিছক এক গল্পের অনুপুঙ্খের সঙ্গে জড়ানো ভিন্ন গল্পের অনুপুঙ্খ অর্থাৎ 'ক্রস-রেফারেন্স' ব'লে বর্ণনা করলেও ভুল হবে। মিস্টার হার্বার্ট যখন সবাইকে সাহায্যের জন্যে অকাতরে টাকা বিলোচ্ছেন, ('কোনো যুক্তিযুক্তির বালাই না-রেখে শুধু-শুধু টাকা ছড়ালেই কি

হ'লো ? সে-যে শুধু বে-আইনি কাজই হবে তা-ই নয়, তার কোনো মাথামুণ্ডু মানে থাকবে না।…সম্পদের সমবন্টন কী ক'রে সম্ভব তার একটা ব্যাখ্যা চাই তো …সেইজন্যে টাকা পেতে হ'লে করতে হবে এমন-কিছু যা তুমি সবচেয়ে ভালো-ভাবে করতে পারো।') তখন কাতারিনোর আখড়ায় একটি মেয়ে এসে তাকে বলেছিলো তার পাঁচশো পেসো চাই। সেটা সে কী ক'রে উপার্জন করবে এটা জানতে চাইলে মেয়েটি বলেছিলো সে প্রতি দফা পাঁচ পেসো হারে একশোজন পুরুষের সঙ্গে শোবে : 'যদি সব টাকাটা তুলতে পারি তবে এরাই আমার জীবনের শেষ একশোজন মরদ হবে।' তারপর মেয়েটি যখন তার ঘরে পর-পর পুরুষদের পরিচর্যা করছে, তখন তোবিয়াসও ভেতরে গেলো।

মেয়েটি তাকে দেখে চিনতে পারলে—তাকে তার ঘরে দেখে সে ভারি অবাক হ'য়ে গেলো।

'তুমিও !'

'ওরা আমাকে বললে ভেতরে আসতে,' তোবিয়াস বললে। 'ওরা আমাকে পাঁচটা পেসো দিয়ে বললে বেশি সময় যেন না-নিই।'

মেয়েটি ভেজা চাদরটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে তোবিয়াসকে বললে অন্যধারটা ধরতে। একেবারে কেম্বিস কাপড়ের মতো ভারি হ'য়ে আছে চাদরটা। তারা দুটো কিনার ধ'রে সেটাকে পাকিয়ে নিংড়ে অবশেষে সেটার স্বাভাবিক ওজন ফিরিয়ে নিয়ে এলো। তারা তাজিমটাকে উলটে দিলে, আর তাজিম ফুঁড়ে এ-পাশটাতেও ঘাম বেরিয়ে এলো।

এ-দৃশ্যটার প্রথম ব্যবহার এটাই, ১৯৬১-তে। ১৯৬৭-তে 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'য় এরেন্দিরার নাম না-ক'রেও এরেন্দিরা আর তার ঠাকুমার আবির্ভাব হ'লো এক রাতের জন্যে—"সরলা এরেন্দিরা" কখনও লেখা হবে কি না গার্সিয়া মার্কেস নিজেই তা তখনও জানেন না। কাতারিনোর আখড়ায় ফ্রানসিসকো, সে মানুষ, এসেছে শুনে তার কাছ থেকে খবর শুনতে গিয়েছিলো আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, সে যখন বাড়ি ফিরে আসবে ব'লে পা বাড়িয়েছে তখন একটা ঘরের দরজার সামনে বসা এক পৃথুলা তাকে হাত নেড়ে ইশারায় ডাক দিলে।

'তুমিও ভেতরে যাও,' পৃথুলা তাকে বললে। 'মাত্র কুড়ি সেন্ট দর্শনী।'
পৃথুলার কোলে একটা চোঙার মতো বাটি, তাতে পয়সা ফেলে আউরেলিয়ানো ঘরে গিয়ে ঢুকলো, যদিও জানে না কেন। কিশোরী মুলাটো, কোনো

সুপুরীর মতো ছোটো-ছোটো ছুঁচি তার, বিছানায় ল্যাপ্টো হ'য়ে আছে। আউরেলিয়ানোর আগে তেত্রিশ জন সে-পথ দিয়ে গেছে। অনবরত ব্যবহারের ফলে, পাশে আর দৈর্ঘ্যে ডলাই-বলাই হ'য়ে, ঘরের হাওয়া কাদা হ'য়ে যেতে বসেছিলো। মেয়েটি চাদর তুলে নিলে আর আউরেলিয়ানোকে বললে একটা পাশ ধরতে। চাদরটা যেন কেম্বিসকাপড়ের মতো ভারি। দুজনে দু-পাশ ধ'রে মুচড়ে-মুচড়ে সেটাকে নিংড়ে নিলে যতক্ষণ-না চাদরটার স্বাভাবিক ওজন আবার ফিরে এলো।

পাঁচ বছর পর "সরলা এরেন্দিরা"র আবার দৃশ্যটা এইভাবে এলো :

এরেন্দিরা তার [উলিসেসের] দিকে তাকিয়ে এমনভাবে মুচকি হাসলে যাতে একটু দুষ্টুমি মেশানো—অবশ্য একটু স্নেহও মেশানো ছিলো তাতে। জাজিম থেকে সে নোংরা চাদরটা তুলে নিলে।

'এসো,' সে বললে, 'চাদরটা পাল্টাতে আমায় সাহায্য করো।'

তখন উলিসেস বিছানার পেছন থেকে বেরিয়ে এলো, এসে চাদরের একটা কোনা ধরলো। চাদরটা যেহেতু জাজিমটার চাইতে বড়ো, ওদের সেটাকে কয়েক দফা ভাঁজ করতে হ'লো। প্রতিবার ভাঁজ করার সঙ্গে-সঙ্গে উলিসেস এরেন্দিরার কাছে আরো-কাছে এসে পৌঁছুলো।…

এরেন্দিরা নোংরা চাদরটা সরিয়ে আরেকটা চাদর পাতলো জাজিমে—এ-চাদরটা ধবধবে পরিষ্কার, ইস্ত্রি-করা।

বই থেকে বইতে এ-রকম প'ড়ে-প'ড়ে বই পড়ার পুরোনো অভ্যাসবশে কেউ হয়তো ভাবতে পারেন এটা আসলে গার্শিয়া মার্কেসের উদ্ভাবনীনৈপুণ্যের অভাবই বোঝায়। কিন্তু ব্যাপারটাকে অন্যদিক থেকে দেখাই বোধ করি সংগত। গার্শিয়া মার্কেস যে-বাস্তবতার রূপায়ণ করতে চাচ্ছেন, তার মধ্যেই এমন একটা ভাব আছে যে একই জিনিশ যেন বারে-বারে ঘ'টে চলেছে, একই আবর্তে পাক খাচ্ছে সবকিছু, যেন এক অনড় অপরিবর্তনীয় স্থাণু পাথরপ্রতিম সমাজ। 'যেন'—পুরোপুরি নয়, কারণ এক লেখা থেকে আরেক লেখায় কিন্তু ছোটোখাটো খুঁটিনাটির বদল হ'য়েই যাচ্ছে অনবরত। পেরুর ঔপন্যাসিক মারিও ভার্গাস য়োসা সম্পূর্ণ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতা হ'য়ে যাবার আগে গার্শিয়া মার্কেস সম্বন্ধে যে-বই লিখেছিলেন, তাতে গার্শিয়া মার্কেসের রচনার গতি ও ছন্দকে বর্ণনা করেছিলেন শঙ্কুল ব'লে—স্পাইরাল, বৃত্তের মতো নয়; একই জিনিশ বারে-বারে ফিরে-ফিরে দেখায়, মুহূর্ত বা

মরীচিকা মনে হয়, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখার উলটোভাবে, মরীচিকা কেবলই পেছিয়ে-পেছিয়ে যায়, হুবহু অবিকল পুনরাবৃত্তি একেবারেই অসম্ভব—যদি-বা দ্বিতীয়বার তা ঘটে ট্রাজেডি হ'য়ে ওঠে প্রহসন, আর তৃতীয় বারে কিম্ভূতকিমাকার—মার্ক্সকে টেনে বাড়িয়ে যেমন বলেছিলেন ইয়ান কোট। শুধু-তো এই অনুপুঙ্খটিই নয়, বারে-বারে গার্সিয়া মার্কেস আমাদের নিয়ে যান ছোটোবেলায়, কার্নিভালের পরিবেশে। 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র সে-ছোটোবেলায় হাওয়া এনেছিলো যাযাবর বেদেদের দল। এরেন্দিরার শরীরের বাজার যখন রমরমা, তখন মরুভূমিতে তার তাঁবুকে ঘিরে বসেছিলো জুয়োর আখড়া, নাচগানের আসর, এসেছিলো সাধু ব্লাকামান তার জড়িবুটি নিয়ে, এসেছিলো যে-মেয়ে মাকড়শা হ'য়ে গিয়েছে, এসেছিলো অগুনতি লোক তাদের হরেক পশরা নিয়ে দৈনন্দিন বদ্ধ জীবনের খোপ থেকে বেরিয়ে। সাধু ব্লাকামান পরে একটা আস্ত স্বতন্ত্র গল্প হ'য়ে ওঠে ; মেয়ে-মাকড়শা তারানতুলার বিশদ বিবরণ জানি আমরা "বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো"য় ; "জগতের সবচেয়ে সুন্দর জলে-ডোবা পুরুষ"কে ঘিরে মেয়েদের মধ্যে সাড়া প'ড়ে যায়—দীর্ঘশ্বাস ফেলতে-ফেলতে তারা তাকে সাজায়, কল্পনায় তাকে নিয়ে উড়াল দেয় তাদের দৈনন্দিন জগৎ থেকে—এই জলে ডোবা পুরুষ আসার পর সারা জায়গাটাই পালটে যায়, বাড়িঘর তৈরি হয় নতুনভাবে, এস্তেবানের অন্ত্যেষ্টির মধ্য দিয়ে সারা পুয়েব্‌লোই পরস্পরের আত্মীয় হ'য়ে ওঠে, এবার ফুল লাগানো হবে পাথর কাটিয়ে যার গন্ধে ঝিম ধ'রে যাবে সমুদ্রের জাহাজগুলো আর চোস্তটা ভাষায় কাপ্তেনরা ব'লে উঠবে—'এ যে এস্তেবানের গ্রাম'। এস্তেবান ম'রে গিয়েও উপহার এনে দেয়—সৌন্দর্য, আশা, সংহতির বোধ। ধাপ্পাবাজ ব্লাকামানের কাহিনী আর "ভুতুড়ে জাহাজের শেষ পাড়ি"ই হয়তো গানের পরিভাষায় যাকে প্রতিবিন্দু বলে (কাউন্টারপয়েন্ট) তাই এনে দেয় এই বইতে। টোটকা, জড়ি-বুটির ধাপ্পা—লোকঠকানো সব সালসা আর মলম—ভবিষ্যৎ গুণে দেবার ছলনায় উলটোপালটা বলা—এ-সবকিছু আমাদেরও চেনা লাগবে, চড়কের মেলা বা গাজনের সং যদি আমাদের মনে থাকে। কিন্তু গার্সিয়া মার্কেসের দমফাটা হাসি আর ঠাট্টা সবসময়েই থাকে। যেমন দেখা যাক "বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো"র বন্দী দশাকে ঘিরে কী-রকম ভিড় জ'মে উঠেছিলো :

> কৌতূহলীরা এলো দূর-দূরান্তর থেকে। এক ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দলও এসে পৌঁছুলো, এলো এক উড়ন্ত দড়বাজিকর, সে বার-কয় ভিড়ের ওপর ভোঁ-ভোঁও করলে কিন্তু কেউ তার দিকে কোনো পাত্তাই দিলো না—কারণ তার ডানাগুলো

মোটেই দেবদূতের মতো ছিলো না — বরং সে-লোককে দেখাচ্ছিলো কোনো নাকাল মানুষের মতো। জগতের সবচেয়ে দুর্ভাগা ও অসুস্থরা এলো স্বাস্থ্যের সন্ধানে: এলো এক বেচারি মেয়ে জন্ম থেকেই সে গুনে যাচ্ছিলো তার বুকের ধুকপুক, গুনতে-গুনতে সে এখন সব সংখ্যাই শেষ ক'রে ফেলেছে; এলো এক পোর্তুগিজ কিছুতেই যে কখনও ঘুমোতে পারে না, কারণ তারাদের কোলাহল তার ঘুম কেবলই চটিয়ে দেয়; এলো এক ঘুমে-হাঁটা লোক, যে দিনে জেগে-থাকা অবস্থায় যা-যা করছে সব রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে উঠে গুবলেট ক'রে দেয়; এ ছাড়াও কত-কত জন, তাদের অবশ্য অত ভয়াবহ-সব অসুখ নেই।

এখানেই শেষ নয়; যাকে তারা দেবদূত ব'লে ভেবেছে তার অলৌকিক কীর্তি-কাণ্ডের কয়েকটা নমুনাও পেশ করেন গার্সিয়া মার্কেস:

দেবদূতের নামে যে-ক-টা অলৌকিক অঘটনের দায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো তা শুধু এক ধরনের মানসিক বিশৃঙ্খলাই বোঝাচ্ছিলো। যেমন: এক অন্ধ আতুর, সে তার দৃষ্টি ফিরে পায়নি বটে, তবে তার তিনটে নতুন দাঁত গজিয়ে গিয়েছিলো; কিংবা এক পঙ্গু বেচারি যে হেঁটে হেঁটে গিরিলঙ্ঘন করতে পারেনি বটে তবে একটা লটারি প্রায় জিতেই যাচ্ছিলো; কিংবা এক কুষ্ঠরোগী যার ঘাগুলো থেকে গজিয়েছিলো সূর্যমুখী ফুল। কোনো সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো এ-সব অলৌকিক কাণ্ড প্রায় বিসদৃশ সব মশকরা বা কৌতুকের মতোই — আর এ-সবের ফলেই দেবদূতের মানসম্ভ্রমখ্যাতি ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিলো।

উদ্ভাবনীনৈপুণ্যের অভাব? সান্ আন্তোনিওর গোলাপের এভাবে রূপান্তর হওয়া সত্ত্বেও? কুষ্ঠরোগীর ঘা থেকে ফুটে উঠছে সূর্যমুখী ফুল? চার্চের সম্বন্ধে এই চাপা ঠাট্টা তো গূঢ়লেখ ভেদ ক'রে জট খুললেই খুঁজে পাওয়া যায়।

বদল তো হচ্ছিলো আগাগোড়া; 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র জের কাটিয়ে 'কুলপতির হেমন্ত'র পৌঁছুবার জন্যে মস্ত বদল হচ্ছিলো একটা। সস্তা সরল ব্যাবসাদারি লেখায় ছোটো-ছোটো বাক্যে অনুচ্ছেদ গ'ড়ে ওঠে, সংলাপের অছিলায় ঘুরে-ঘুরে অনুচ্ছেদ তৈরি হয়, গদ্য এগোয় ধারাবাহিক সরল রেখায়, বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদ ভিন্ন-ভিন্ন কালকে না-বুঝিয়ে একই ধরতাই অনুসরণ ক'রে চলে। 'পাতার ঝড়'-এ তিনটে ভিন্ন-ভিন্ন একোক্তির মধ্যে — সংলাপের বদলে — দীর্ঘ অনুচ্ছেদ আগেই তৈরি করেছিলেন গার্সিয়া মার্কেস, তবে হয়তো উইলিয়াম ফকনারের প্রভাবও পুরো কাটিয়ে ওঠা যায়নি সেখানে। 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'য় কথাবার্তা খুবই

কম, বড়ো-বড়ো অনুচ্ছেদ, কিন্তু সবের মধ্যে একটা গতি আছে। "অলৌকিকের ফিরিওলা সাধু ব্লাকামান"-এ বড়ো-বড়ো ঘননিবদ্ধ অনুচ্ছেদ, পাতার পর পাতা জুড়ে চলে, ভেতরে এর-তার-ওর কথা মিশে যায়। কিন্তু "ভুতুড়ে জাহাজের শেষ পাড়ি" বিভিন্ন লোকের কথাবার্তা মনে ক'রেও পুরো গল্পটাই একটাই বাক্য। হুয়ান রুলফোর "মাকারিও" গল্প ছিলো একটাই অনুপ্রাণ অনুচ্ছেদ। কিন্তু গার্সিয়া মার্কেসের এই গল্প ছিলো একটাই বাক্য, যেন প্রস্তুতি চলছিলো তাঁর সবচেয়ে 'কথ্য' লেখা (অন্তত তাঁর মতে) 'কুলপতির হেমন্ত'র রচনাভঙ্গির—যেন মকশো করা হচ্ছে, হাতে-কলমে চেখে দেখা হচ্ছে 'কুলপতির হেমন্ত'র পাতার পর পাতা জোড়া বাক্যগুলোকে সামাল দেয়া যায় কি না। রচনাভঙ্গির, কৃৎকৌশলের এই নিরীক্ষাগুলো জরুরি ছিলো। কালানুক্রমিকভাবে এই বই পড়লে "হারানো সময়ের সমুদ্র"র ছোটো-ছোটো বাক্য, ছোটো-ছোটো অনুচ্ছেদ বা সংলাপ পেরিয়ে আমরা তুঙ্গ মুহূর্তে পৌঁছুই "ভুতুড়ে জাহাজের শেষ পাড়ি"তে—যার বিষয় স্মাগলারদের জাহাজের ভরাডুবি, ক্রীতদাসদের জাহাজের শতাব্দী পেরিয়েও এক ভৌতিক মুহূর্তে আবির্ভাব। মেলার মধ্যে যে নিচের তলার লোকেরা এসে হাজির হয়, তাদের মানসজগৎও জরুরি ছিলো—নইলে কী ক'রে ভাবা যেতো নিচের তলা থেকে উঠে-আসা এক স্বৈরাচারী একনায়কের কথা, যে-আড়াইশো বছর ধ'রে রাজত্ব করেছে; প্রতাপ যখন তুঙ্গে, কোষাগার যখন উপচে পড়ছে, তখন মায় খালি মদের বোতলগুলো বিক্রি করতে নিয়ে যায় সেকেণ্ড হ্যাণ্ড জিনিশের দোকানে, যার চাক্ষুষ ছবিটা এই রকম: প্রাসাদ ভর্তি গোরুমোষের মধ্যে এক থুরথুরে-বুড়ো, অভাবনীয়-বুড়ো একনায়ক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। লাতিন আমেরিকার ইতিহাসে একনায়কেরা যা করেছে, তা সত্যিই ভাষা বা কল্পনারও বাইরে: হেইতির 'পাপা ডক' ডক্টর দুভালিয়ে দেশের সব কালো কুকুরকে খুন করবার হুকুম দিয়েছিলো, কারণ তার কোন-এক শত্রু নাকি নিজেকে কুকুরে বদলে ফেলেছে, কালো কুকুরে। হামের প্রকোপ এড়াবে ব'লে এল সালভাদোরের মাক্সিমিলিয়ানো এরনান্দেস্ মার্তিনেস দেশের রাস্তাঘাটের সব বাতি লাল কাগজে মুড়ে দিয়েছিলো। এই একনায়ক বা ডিক্টেটরদের গল্প লিখবে কী ক'রে কেউ যদি-না আবিষ্কার করতে পারে নতুন ভাষা, নতুন কৃৎকৌশল, বাস্তবের দিকে তাকাবার খোলামেলা একটা ভঙ্গি যেখানে সত্যি-মিথ্যে অদ্ভুত-উদ্ভট কুসংস্কার আর কুহক সব মিলে-মিশে জট পাকিয়ে না-যায়। স্বপ্নে আর কুহকে মেশা বাস্তবকে ধরবার জন্যে 'ম্যাজিক রিয়ালিসম্' ছাড়া উপায়ই বা আর কী ছিলো?

আর এই গল্পগুলোর হাৎড়ে-হাৎড়ে বার করা হয়েছিলো কুহকের বাস্তব আর বাস্তবের কুহককে ভাষায় ধ'রে রাখবার একটা দুর্বর উপায়।

...

মরদদের চাহনিতে পলক পড়ে?

এই বইয়ের গল্পগুলো থেকে অন্তত দুটি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে : 'এরেন্দিরা' আর 'বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো'। অন্তত তিনটে গল্প ভাবা হয়েছিলো ছোটোদের গল্প হিশেবে : "হারানো সময়ের সমুদ্র", "জগতের সবচেয়ে সুন্দর জলে-ডোবা পুরুষ" আর "বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো"—শেষের দুটো ছোটোদের গল্প হিশেবেই বেরোয়। কিন্তু সবগুলো গল্পের মধ্যেই ছিলো নাশকতামূলক অন্তর্ঘাত—গল্পের উপরিতলে যা-ই থাকুক-না কেন ভেতর থেকে সব কাটিয়ে দেয়া হচ্ছিলো, যাকে বলা যায় 'ইমপ্লোশন'। সবগুলো গল্পই মাচিস্‌মো, তেন্‌দেস্তা, খাঁচা ও খাঁচা ভাঙা, দৈনন্দিন সময়ক্রম থেকে আচমকা খেলাবেলায় পৌঁছুবার কাহিনি ফেঁদেছিলো—গুরুত্বের তারতম্য ভিন্ন হ'তেই পারে। এরেন্দিরার কাহিনীর প্রথম আভাস ছিলো 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'তেই : একটি কিশোরী, দৈবাৎ যে অঘটন ঘটায়, পুড়িয়ে ফ্যালে তার ঠাকুমার বাড়ি, তারপর দেনা শোধ করবার জন্যে জোর ক'রে যাকে দাসত্ব ও বেশ্যাবৃত্তির খাঁচায় আটকে রাখা হয়। শহর থেকে শহরে তাকে ধ'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে ঠাকুমা, কুড়ি-কুড়ি সেন্ট মাশুল নিয়ে তাকে যথেচ্ছ শোয়াচ্ছে বিছানায় যাতে পুড়ে-যাওয়া বাড়িটার দাম এইভাবেই উশুল হ'য়ে যায়। 'মেয়েটির হিশেব অনুযায়ী, তাকে প্রতি রাতে সত্তরজন লোকের সঙ্গে শুয়ে আরো দশ বছর কাটাতে হবে, কেননা তাকেই জোগাতে হয় সফরের খরচ—দুজনের খাওয়া-দাওয়ার খরচ, আর ঢোলকবাদকরা ব'য়ে বেড়ায় যে-ইন্ডিয়ানরা তাদেরও মাইনে তাকে দিতে হয়,' আউরেলিয়ানোর সঙ্গে চকিতে একঝলক দেখা হবার সময় এইসব তথ্যই জেনেছিলো আউরেলিয়ানো, আমরা জেনেছিলাম পরোক্ষ উক্তি মারফৎ। পরে এই কিশোরী মুলাটাকে নিয়ে গার্সিয়া মার্কেস যে ছোটো উপন্যাসটি লিখেছিলেন, সে-কথাটা আগেই বলেছি—আগে তার নামও ছিলো না, এখন তার নাম হয়েছে এরেন্দিরা, তাও জেনেছি। ১৯৮৪-তে গার্সিয়া মার্কেসেরই চিত্রনাট্য অনুসরণ ক'রে 'এরেন্দিরা' ছবি তৈরি হয়েছিলো। গ্রীক অভিনেত্রী ইরেনে পাপাস দুর্ধর্ষ অভিনয় করেছিলেন ঠাকুমার ভূমিকায়। চমকপ্রদ সেই চলচ্চিত্রে একটা খটকা তবু তৈরি হয়েছিলো : লরা মালভে 'ভিজুয়াল অ্যাণ্ড আদার প্লেজার্স' বইতে যাকে উল্লেখ করেছেন 'মেল গেজ' বা মরদদের চাহনি বা মাচোদের দৃষ্টি ব'লে, ছবিতে যেন

তাকেই ইন্ধন জোগানো হয়েছিলো—অন্তর্ঘাত বা প্রতিবাদের বদলে যেন তাতিয়ে দেয়া হচ্ছিলো, উসকে দেয়া হচ্ছিলো পুরুষদের দৃষ্টিসুখ। চমকপ্রদ রূপসী ছিলো এরেন্দিরার ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিলো সেই মুলাটো মেয়েটি। সারাক্ষণ পর্দা জুড়ে থেকেছে তার রঙিন নগ্ন অস্তিত্ব, নানা কোণ থেকে, নানাভাবে উলটে-পালটে, সামনে থেকে, পেছন থেকে তাকে দেখেছে ক্যামেরা, আর ধ'রে রেখেছে সেলুলয়েডের ফিতের অক্ষয়। আর দর্শকরা তাকে দেখেছে ক্যামেরা তাকে যত রকমভাবে দেখিয়েছে। আর, মরদদের চাহনিতে কি পলক পড়ে—এমন কিশোরী মুলাটোকে দেখে? মাচো-প্রবৃত্তি এমনই জিনিশ যে ম'রেও মরে না। আর মাচোত্ব কাকে বলে নিজেই তো তার সংজ্ঞার্থ দিয়েছিলেন গার্সিয়া মার্কেস: 'নারী বা পুরুষ—সে যে-ই হোক না কেন, তার মাচিস্মো থাকার মানেই হচ্ছে অন্য লোকের অধিকার দখল ক'রে দেয়া, কেড়ে নেয়া।' কেউ বলতে পারেন, কেড়ে নেয়া হ'লো কোথায়, অভিনেত্রীটি তো তার জন্যে সাম্মানিক দক্ষিণা পেয়েছে—জোর ক'রে তাকে দিয়ে এ-কাজ কেউ করায়নি। তাছাড়া, ছবির শেষে যখন এরেন্দিরা সমুদ্রতীর ধ'রে ছুটতে-ছুটতে, উলিসেসের ডাকে কোনো সাড়া না-দিয়ে, দিগন্তে মিলিয়ে যায়, তখন তো বলবার কথাটা স্পষ্টই পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তবু…

…

ক্যামেরা কি পুরুষ নয়?

তবু খটকাটা কাটে না। উদ্দেশ্য যা-ই হোক-না কেন, ক্যামেরাকে তোয়াজ করবার জন্যে, খুশি করবার জন্যে, কোনো মেয়ের শরীরকে নিয়ে এমনভাবে ছানবার অধিকার কি কারু আছে? এ যেন ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ধর্ষণটাকেই বিস্ফারিত ক'রে গতি কমিয়ে মন্থরভাবে দেখানো হ'লো! 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' যখন রাতারাতি গার্সিয়া মার্কেসকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিলে, আর পরে ১৯৮২-তে সেই বই তাঁকে জুটিয়ে দিলে সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার, সেই থেকেই হলিউড তাঁর পেছনে লেগে আছে 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' নিয়ে একটা ব্লকবাস্টার বানাবে ব'লে—ডলারের অঙ্ক যত আকাশ ছুঁয়েছে গার্সিয়া মার্কেস ততই খাঁৎকে পেছিয়ে এসেছেন, চলচ্চিত্র সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও। হলিউড! সে তো খুন ক'রে ফেলবে বাস্তবতার কুহকে ভরা তাঁর বই। এখন গার্সিয়া মার্কেস প্রধানত তাঁর টাকাতেই কুবার লা হাবানায় একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট গ'ড়ে তুলেছেন—'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' নিয়ে তো তাঁরা নিজেরাই একটা ছবি-করার কথা ভাবছেন।

সত্যি-যে চলচ্চিত্রে বাস্তবতার কুহক অভিনবভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিলো 'এরেন্দিরা'-তে, কিন্তু পুরুষদের কিংবা ক্যামেরার ঢুলঢুলে অপলক দৃষ্টি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছিলো 'এরেন্দিরা'র ওপর : সাহিত্যে অন্তর্ঘাত যতই তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, চলচ্চিত্রে কিন্তু সেই অন্তর্ঘাত ঘটেছে কি না সন্দেহ—আর এই সন্দেহ থাকলেই উদ্দেশ্যটাই মাঠে মারা যাবে, সদভিপ্রায় ব্যর্থ হবে। কেমন ক'রে সেটা কাটানো যায় সেটা আমাদের বোধহয় গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে—তবে এই বইয়ের পাঠকদের সুবিধে এটাই যে তাঁর লেখার মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাচিস্‌মোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—যেটা মার্কিন সাহায্য, নয়া ঔপনিবেশিকবাদ, পুরোনো সাম্রাজ্যবাদ সবকিছুর বিরুদ্ধেই সশস্ত্র দাঁড়িয়েছে। তাঁর সাহিত্যে অন্তত নারী'র শরীরে সাম্রাজ্য গড়া যায়নি, বলা যায়নি কোনো মেয়েকে লক্ষ ক'রে : তুমিই আমার আমেরিকা, আমার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড!